কপিশা

প্রাপ্তিস্থান :

ও রি য়ে ণ্ট বু ক কো ম্পা নি

৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ঃ
এপ্রিল, ১৯৬২

প্রকাশিকা ঃ
মালবিকা দেবী
১৯।১এ, পঞ্চাননতলা লেন,
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদপট ঃ
শ্রীকিষণলাল ঘোষ

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস
২০ গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা ৬

দাম ঃ ছয় টাকা মাত্র

উৎসর্গ

দেশের ভবিষ্যৎ আশা-ভরসাস্থল

আদর্শবাদী তরুণদের দিলাম—

নিবেদন

এই কাহিনীর পটভূমিকায় বিগত সত্তর বৎসরের অর্থাৎ ইংরেজ আমলের শেষ দিকের এবং স্বাধীনতার যুগের বাংলা দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতির আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে। এর প্রতিটি চরিত্রই কাল্পনিক। যদি কোন চরিত্রের সঙ্গে কোন বাস্তব চরিত্রের সাদৃশ্য থাকে, তবে তা নিতান্তই আকস্মিক।

—লেখক

So may the outward shows be least themselves :
The world is still deceived with ornament.
In law, what plea so tainted and corrupt
But, being season'd with a gracious voice,
Obscures the show of evil ? In religion,
What damned error, but some sober brow
Will bless it and approve it with a text,
Hiding the grossness with fair ornament ?

—W. Shakespeare

Kapisha
(a fiction)
By
Upagupta

Price : Rs. 6·00

এই লেখকের অন্যান্য বই :

বিশ্ব সভ্যতার ধারা
বিশ্ব মানবের কাহিনী
চীনের ইতিহাস
শেক্সপীয়র
পৃথিবীর ইতিহাস
এক জাতি এক প্রাণ
ইত্যাদি

॥ এক ॥

মেদিনীপুর জেলার লাল মাটির বুক চিরে বয়ে চলেছে ছোট নদী কংসাবতী। আঁকাবাঁকা প্রবাহ। চঞ্চল আকুলতার জীবন। কখন আদিগন্ত জনশূন্য শুষ্ক প্রান্তরের ভিতর দিয়ে, কখন শস্য-শ্যামল পল্লীর প্রান্ত ছুঁয়ে চলেছে দয়িতের সন্ধানে। শত শত মাইল ভ্রমণের পর হলদী নাম নিয়ে সাগরের কোলে লুটিয়ে পড়ে শেষ করেছে তার অভিসার।

গ্রীষ্ম ও শীতে নদীর শীর্ণ স্রোত গড়িয়ে চলে মৃদুমন্দ বেগে সোনালী রঙের বালুরাশির উপর। তটলগ্ন গ্রামের কত মানুষ এর গভীর দ-এর কালো ঝিম জলে ডুব দেয়, স্নান করে, সাঁতার কাটে, কলসী ভরে।

ও অঞ্চলের লোক একে গঙ্গা বলত। 'কলৌ কংসাবতী গঙ্গা'। কংসাবতীর জলে স্নান করলে নাকি গঙ্গাস্নানের পুণ্য হত। নদীর খাত থেকে একটু দূরে বন্যারোধী উঁচু বাঁধ। নদী ও বাঁধের মাঝখানে পলি-পড়া বিস্তৃত উর্বর চর। তাতে ফলে অজস্র ফসল—তরমুজ, কাঁকুড়, ফুটি, উচ্ছে, কুমড়ো, আর পটোল।

বর্ষায় স্ফীতবক্ষা পাহাড়ী নদী পাহাড়িয়া যুবতীর মতো উদ্দাম। কলকল গেয়ে, খলখল হেসে, নেচে চলে তালে তালে—প্রাণের বিপুল উচ্ছ্বাসে। বন্যার গৈরিক জলের উপর ভাসে মুক্তার মতো সাদা ফেনার মালা। স্রোতের বেগ ধারণ করতে না পেরে বাঁধ থরথর কাঁপে। মাটির বাঁধন যায় টুটে। স্থানে স্থানে হানা পড়ে। অসংখ্য গ্রাম, পুকুর, ডোবা লাল জলে থৈ থৈ করে। গৃহস্থের খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর, দুঃখীর কুটীর কোথায় যায় ভেসে নিশ্চিহ্ন হয়ে। আর্ত নরনারী আশ্রয় নেয় বাঁধের উপর। ঘোড়ায় চড়ে আসে লালমুখো সাহেব ইঞ্জিনিয়ার। তার মাথায় সাদা টুপি, হাতে চাবুক। উলঙ্গ হাড় জির-জিরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো দৌড়ে পালায় ভয়ে। সেলাম

করে পথ ছেড়ে দাঁড়ায় নিরাশ্রয় লোকজন। সরতে একটু দেরি হলে মারে চাবুক সপাৎ-সপাৎ। হানার জল শুকিয়ে গেলে আসে কন্ট্রাক্টর, ঠিকাদার কুলির দল নিয়ে। তাদের হাতে ঝোড়া আর কোদাল, মাথায় চটের থলের গাঁট। দু-দশটা ভেজা-মাটি-ভর্তি বস্তা ফেলে হানার মুখে। তারপর চলে যায় থলের গাঁট মাথায় নিয়ে। রিপোর্ট দেয়, হানা বাঁধা হয়ে গেছে। বানে-ভাসা লোকগুলো বাস করতে থাকে বাঁধের উপর হোগলার ছাউনিতে। তারপর ফিরে যায় যে-যার শূন্য ভিটায়।

বছরের পর বছর উইয়ে-কাটা ঘোগ-পড়া জীর্ণ বাঁধ এখানে-ওখানে হামেশা ভাঙে। লোকের দুঃখ-দুর্দশার সীমা থাকে না। জেলার ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট নির্বিকার। দেশের লোক উদাসীন। কেউ কারোর খোঁজ খবর রাখে না। সকলের যেন 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' ভাব।

ফসল না হলেও জমিদার খাজনা আদায় করে কড়ায় গণ্ডায়। টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলে শহরে গিয়ে। খাল কাটা, বাঁধ বাঁধা, জল নিকাশ, রাস্তাঘাট মেরামত হয় না। ম্যালেরিয়া কলেরা বসন্তে গ্রাম উজাড় হয়ে যায়। জমিদার বিলাসী। প্রতিকারহীন অত্যাচার মানুষকে কাপুরুষ দৈব-নির্ভর করে তুলেছে। দুঃখ-কষ্টকে তারা ভগবানের বিধান বলে মেনে নিতে শিখেছে। বক্রগামিনী নদীর বন্যারোধী বাঁধের নীচে পূর্ব-পশ্চিমে প্রায় এক মাইল দীর্ঘ চাঁপাগ্রাম। চারদিকে বেত ও শিঁয়াকুলের দুর্ভেদ্য ঝোপ! বন তুলসী, রাংচিতা, ভেরাণ্ডার অন্তহীন জঙ্গল। আম-কাঁঠাল, তাল-তেঁতুল, অর্জুন-নিম, দেবদারু আকাশে মাথা তুলে সূর্যকিরণ প্রবেশের পথ রুদ্ধ করে রেখেছে। গ্রামের মাটি স্যাঁতসেঁতে। চলার পথ সর্পিল ও সংকীর্ণ। বর্ষাকালে কাদায় প্যাচপেচে। সরু পথের উপর দু পাশের গাছের ডালপালা ঝুলে পড়েছে। দিনের পর দিন পথচারী মাথা নুইয়ে পথ চলে। অসংখ্য পানা-ভর্তি পুকুর। পচা ডোবা। পোড়ো উঁচু ভিটের উপর ঘেঁটু গাছ, ধুতরা ঝোপ। বন-কচু, বুনো ওল, মনসা, আসশেওড়া গাছের প্রাচুর্য। এখানে ওখানে দু-চারটা কুরচি কাঠমল্লিকা ফুটে রয়েছে। পুকুর-পাড়ে ঘরের পিছনে বাঁশ-ঝাড়। কোথাও কাঁটা বাঁশ-ঝাড়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীর। মশার অসহ্য দৌরাত্ম্য।

গ্রামের মাঝখানে কুড়ি-পঁচিশ ঘর বামুনের বাস। বাঁড়ুয্যেরা উত্তর ও দক্ষিণ পাড়ায় এবং চক্রবর্তীরা দু পাড়ার মাঝখানে বাস করে। তিন শ বছর

আগে তাদের বংশের আদি পুরুষরা নাকি রাঢ় ও নবদ্বীপ থেকে এসে এখানে প্রথম বাস করেছিলেন। পরগনার ক্ষত্রিয় রাজা তাঁদের দেড় শ বিঘা লাখেরাজ জমি দান করেন। গ্রামের পশ্চিম দিকে মাঠের ধারে পঁচিশ-তিরিশ ঘর চাষী কৈবর্তের বাস। তারা বামুনদের জমি চাষ করে। নিজেদের ডাঙ্গায় এবং কংসাবতীর চরে নানা রকমের ফসল উৎপাদন করে। গ্রামের পূর্ব প্রান্তে দু-চার ঘর কামার কুমোর তেলীর বাস।

আগে গ্রামে কুড়ি-পঁচিশটি টোল ছিল। অনেক বিদেশী ছাত্র গুরুগৃহে বাস করে টোলে অধ্যয়ন করত। যজন-যাজন ছিল বামুনদের পেশা। পনরো-কুড়িটি দুর্গা প্রতিমার পূজা হত। চাষীরা এক টাকায় আট দশটা মুনিষ খাটত। তখন গ্রামে কেউ বড়লোক ছিল না। সকলের অবস্থা প্রায় সমান ছিল।

এখন থেকে প্রায় এক শ বছর আগে গ্রামে প্রথম ম্যালেরিয়া রাক্ষসী প্রবেশ করে। ডাক্তার ছিল না। দু-একজন কবিরাজ ও হাকিম ছিল। তারা নতুন রোগের চিকিৎসা জানত না। বছর কয়েকের ভিতর গ্রামখানি উজাড় হয়ে গেল। মানুষ কুকুর-শেয়ালের মতো মরতে লাগল। এক-একটি পরিবারের কেউ জীবিত ছিল না। দেড় শ দু শ ব্রাহ্মণ পরিবারের ভিতর মাত্র পঁচিশ-তিরিশটা পরিবারের লোক সসেমিরা হয়ে কোন রকমে জীবন ধারণ করেছিল। যারা বেঁচেছিল, তারাও বছরের ভিতর ছ মাস ম্যালেরিয়ায় ভুগত। পনরো কুড়ি বছরের ভিতর মাটির ঘরগুলি ভূমিসাৎ হয়ে গেল। উঁচু ভিটা জঙ্গলে পরিণত হল। যাদের সাধ্য ছিল, তারা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে বেঁচেছিল।

যাদের কোন উপায় ছিল না, তারা মাটিতে মুখ গুঁজে পড়ে রইল; ম্যালেরিয়ায় ভুগে তাদের হাত-পা কাঠি আর পেট পিলেতে ভর্তি হয়ে গেল। কাঁপুনি দিয়ে জর আসত। জর ছেড়ে গেলে দু-চারটি কুইনাইনের বড়ি খেয়ে পান্তাভাত পথ্য করত।

দু-চার বিঘা জমির ভাগ-ধান এবং ফলারের দক্ষিণা বামুনদের একমাত্র সম্বল ছিল। তাদের পাণ্ডিত্য ছিল না, কিন্তু পূর্ব পুরুষের গর্বে তারা ফেটে পড়ত। নাম মাত্র টোলে পড়ে তারা মনগড়া উপাধি নিয়ে মিথ্যা 'ভাষ' (ব্যবস্থা) দিয়ে দু-চার আনা পয়সা উপার্জন করত।

ম্যালেরিয়ার ভয়ে এবং কার্যোপলক্ষে যাঁরা গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয়

নিয়েছিলেন, তাঁদের ভিতর প্রধান ছিলেন রাজকুমার বাঁড়ুয্যে। মহকুমা শহরে ওকালতি করতেন। প্রচুর আয় ছিল তাঁর। দেশে পাকা বাড়ি, বিস্তর জমিজমা, প্রজা গোমস্তা। তাঁর বিরাট পরিবারের লোকজন শহরেই থাকত। রাজকুমারবাবু মাঝে মাঝে দেশে আসতেন। ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সকলেই তাঁর কথা শুনত। গ্রাম্য জীবনের নানা জটিল সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান করতেন। কোন্ যুবক কার বাড়ি ঘন ঘন যাতায়াত করে, কে কার কলারের দক্ষিণা মেরে দিয়েছে, কোন্ বাড়ির বউ কোন্ পুরুষের দিকে চেয়ে হেসেছে, কে জমি বিক্রি করে মা-বাপের শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন করায় নি, কে কার জমির আল কেটেছে, ভাগ-ধান দেয় নি ইত্যাদি মামলার বিচার করতেন রাজকুমারবাবু সমবেত বামুন-শূদ্রের বৈঠকে। তাঁর রায় সকলকে মাথা পেতে মেনে নিতে হত। নইলে দুর্ভোগের সীমা ছিল না। অপরাধীকে জরিমানা করা হত। জরিমানার টাকা গ্রামের শিব অথবা কালীর প্রাপ্য ছিল। জরিমানা না দিলে তাকে একঘরে করা হত। কেউ তার বাড়ি যেত না। তার ধোপা নাপিত বন্ধ হয়ে যেত। তার বাড়ির কেউ মরলে সেও এই কড়া গ্রাম্য শাসন থেকে অব্যাহতি পেত না। শব-দাহের জন্য কাঠ চেরা হত না, শ্মশানে শব নিয়ে যাওয়া হত না। এই ধরণের কঠোর শাসনকে অগ্রাহ্য করার দুঃসাহস কারো ছিল না।

কুলীন বাঁড়ুয্যে বংশের সেরা পণ্ডিত ছিলেন শিরোমণিমশাই। এ তল্লাটে, এমন কি জেলার পণ্ডিত সমাজে তাঁর প্রধান স্থান ছিল। শ্রাদ্ধ-বাসরে পণ্ডিতদের সভায় তাঁর গলায় ফুলের মালা, আর কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে সভাপতি বরণ করা হত। অশীতিপর বৃদ্ধ শিরোমণিমশাই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর পঞ্চমুখে প্রশংসা করতেন। ছোট বউ নাকি তিন চার মাস আগে পচানো বাঁশের খাদি শোবার ঘরের পেছনের দাবায় তুলে রেখেছিলেন। একদিন দুপুর রাত্রে ঘাঁটালে নিমন্ত্রণ বাড়ি যাওয়ার পথে সাত আট জন ব্রাহ্মণ তাঁর বাড়িতে অতিথি হন। ছোট বউ কোমর বেঁধে জালানির জন্য বাঁশের খাদিগুলো নিজেই কুড়ুল দিয়ে চিরে ফেললেন। অমনি তার ভিতর থেকে খলখল করে সাত আটটা বড় বড় কইমাছ বেরিয়ে পড়ল। গরম ভাত আর কইমাছের ঝোল খেয়ে পণ্ডিতরা পরিতৃপ্ত হলেন। ঘরের গাইটি তিন পোয়া দুধ দিত। দুধ তো নয় যেন বটের আঁঠা। শিরোমণিমশাই আফিং-খোর মানুষ। দুধ না হলে তাঁর চলে না। ছোট বউ বাকি দুধটা

দই বসাতেন। দই থেকে মাখন তুলে ঘি করতেন, চাষী-বাড়ির মেয়েরা ঘটি ঘটি ঘোল নিয়ে যেত। পতিপরায়ণা রমণী-রত্নের গুণপনা শুনে শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যেত।

তিনি গ্রামের কালীপূজা করতেন। 'করাল বদনাং ঘোরাং কৃষ্ণবর্ণাং চতুর্ভুজাং' মন্ত্রটি এমন সুন্দরভাবে পাঠ করতেন যে, তা শুনলে অতি বড় পাষণ্ডেরও হৃদয় ভক্তিরসে পূর্ণ হয়ে উঠত। অনেক দিন আগে তাঁরই এক তান্ত্রিক পূর্বপুরুষকে কালী স্বপ্নে বলেছিলেন, আমি তোর কুল-দেবতা। আমাকে নিয়ে চল। পরদিন তিনি যখন কংসাবতীর জলে স্নান করে সূর্যকে আঁচলা আঁচলা জল তুলে অর্ঘ দিচ্ছিলেন, তখন একটি কালো পাথরের কালী মুণ্ড তাঁর হাতে উঠে আসে। তিনি ভক্তি-সহকারে দেবীকে স্বগৃহে আনেন। দেবীর মুণ্ডটিকে একটি পিতলের কলসীর মুখের উপর রেকাবিতে বসিয়ে ধুমধামের সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন। সেই অবধি তান্ত্রিক পণ্ডিতের বংশধররা কালীর পূজা করে আসছেন। অনেক দিন পরে নিজের পাকা বাড়ি নির্মাণ করার আগে রাজকুমারবাবু দেবীর জন্য একটি পাকা মন্দির নির্মাণ করে দেন। সেই সময় থেকে কালী বাঁড়ুয্যে-বংশের দেবতা হিসাবে পূজা পেয়ে আসছেন।

মানুষের ভাগ্যের মতো দেবতাদের ভাগ্যেরও উত্থান-পতন আছে। ক্ষুদ্র জনবহুল গ্রামখানি ম্যালেরিয়ার করাল গ্রাসে বিধ্বস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালীর আর সে জলুস ছিল না। কালীপূজার সে ধুমধাম ছিল না। আগে এখানকার মানুষের সুখ ছিল, আনন্দ ছিল, স্বাস্থ্য ছিল, পাণ্ডিত্য ছিল এবং সম্পদ না থাকলেও দারিদ্র্য ছিল না। অন্ন সংস্থানের জন্য কেউ গ্রামের বাইরে যেত না। যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না। তখন গ্রামখানি ছিল স্বয়ং-সম্পূর্ণ। দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য গ্রামেই উৎপাদিত হত।

কামার কুমোর তেলী মুচি চাষী জাত ব্যবসায়ে নিযুক্ত থাকত। হস্ত-সম্পাদ্য কুটীর-শিল্প তাদের অভাব মিটাত। তখনও ইংরেজি শিক্ষার ও পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুপ্রবেশে সুদূর পল্লীর শান্ত সুস্থ জীবন উদ্বেল হয়ে ওঠেনি। কৃত্রিম অভাব পল্লী-জীবনকে দুঃখময় করে তোলেনি। ইংল্যাণ্ডে শিল্প-বিপ্লবের ফলে প্রয়োজনাতিরিক্ত দ্রব্য উৎপাদন এবং সুলভ বিলাতী পণ্যের আমদানি তখনও এ দেশের কুটীর-শিল্পের সমাধি রচনা করেনি। ক্রমে কুটীর-শিল্পী বেকার হয়ে গেল। দারিদ্র্য দেখা দিল। নতুন ব্যাধি ম্যালেরিয়া

এবং দারিদ্র্যের সহচর নানা রকম রোগের আক্রমণ গ্রামগুলির সর্বনাশ করে দিল।

চাঁপাগ্রাম এখন আর এক শ বছর আগের চাঁপাগ্রাম ছিল না। এখন বিদ্যাচর্চা শাস্ত্রালোচনা সৎভাব সৎচিন্তার নাম গন্ধ রইল না। এখন ছিল শুধু পাণ্ডিত্য-শূন্য অহংকার; পূর্বপুরুষের মহিমা কীর্তন, কৌলিন্যের গর্ব, নিম্ন শ্রেণীর লোকের প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞা, হিংসা-দ্বেষ, গুণীর অবমাননা, শূন্য-গর্ভ আস্ফালন। জীবনের দুঃখ-কষ্ট ভুলে থাকার জন্য লোক তাড়ি মদ গাঁজা প্রভৃতি নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল। সুস্থ গ্রাম্য পরিবেশটি কলুষিত হয়ে গেল।

বাঁড়ুয্যে বংশের অকাল-কুষ্মাণ্ডরা তাদের পুরোহিত বংশের প্রতি অহেতুক ঈর্ষায় জ্বলে উঠেছিল। চক্রবর্তী বংশের তর্কবাগীশমশাই বিদ্বান গুণী ব্যক্তি ছিলেন। তারা তাঁর টোল ঘর পুড়িয়ে দিল। চক্রবর্তী বামুন বাঁড়ুয্যে পাড়ায় টোল করবে তা তাদের সহ্য হল না। টোলের বিদেশী ছাত্রদের মারপিট করে তাড়িয়ে দিল। অগত্যা তর্কবাগীশমশাই বড় ছেলে রামজয়কে সঙ্গে নিয়ে গ্রাম থেকে প্রায় ষোল মাইল দূরে এক কায়স্থ জমিদারের বাড়িতে টোল খুলে বসলেন। চোদ্দ বছর বয়সের রামজয়কে তিনি গ্রামের দূষিত পরিবেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলেন। তর্কবাগীশমশাই ভেবেছিলেন, ছেলেকে নিজের কাছে রেখে লেখাপড়া শিখিয়ে পণ্ডিত করবেন। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক। পড়াশুনা করা ছাড়া রামজয় আর সব কাজ করতে ভালবাসতেন। বাবার কাছে পাঠ নেওয়ার জন্য তিনি অপর ছাত্রদের সঙ্গে বসতেন। হাতে লেখা মুগ্ধবোধ ব্যাকরণের অতিকায় লম্বা পুঁথিখানা দেখলে তাঁর হৃৎকম্প উপস্থিত হত। তিনি ভাবতেন, এদেশের লোকগুলোর খেয়েদেয়ে কি কিছু কাজ ছিল না? তাঁর বাবা বলতেন, সে কালের পণ্ডিতরা এক মুঠো ভাত আর তেঁতুল পাতার ঝোল খেয়ে বড় বড় কাব্য লিখেছেন, বেদ বেদান্তের জটিল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, শব্দ বিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্বের-কঠিন প্রশ্নগুলির সমাধান করেছেন। পিতৃদেবের এই সকল কথা রামজয়ের এক কান দিয়ে ঢুকত, আর এক কান দিয়ে বেরিয়ে যেত। তিনি বাবার চোখে ধুলো দিয়ে জমিদারবাড়ির অন্দরে আশ্রয় নিতেন। টুকিটাকি কাজ করে দিয়ে মেয়েদের মন যোগাতেন। দুপুরে পাড়ার ছেলেদের নিয়ে সরকারদের বাগানে ঘুরে বেড়াতেন। গাছে উঠে ফল পেড়ে বা শালিকের

বাচ্চা ধরে তাদের দিতেন। তর্কবাগীশ হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন। বলতেন, ভাগ্যে না থাকলে মানুষের বিদ্যা ও ধন অর্জন হয় না। পূর্ব-জন্মার্জিতা বিদ্যা পূর্ব-জন্মার্জিতং ধনং অগ্রে ধাবতি ধাবতি।

তর্কবাগীশমশাই যেমন অগাধ পণ্ডিত, তেমনি বড় তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। এক অমাবস্যার নিশুতি রাতে দেশের শ্মশানে তিনি শব সাধনা করছিলেন। আসন করে বসার পর এক জ্ঞাতির আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁর অশৌচ স্পর্শ হয়। এই দোষে মহাকাল ভৈরব নাকি তাঁর গায়ের রক্ত শুষে নিয়েছিলেন। শ্মশানেই তিনি অজ্ঞান হয়ে যান। তাঁর দেহ নীল হয়ে গেল। পরদিন সকালে রামজয় লোকজন নিয়ে ধরাধরি করে তাঁকে বাড়িতে নিয়ে আসেন। দেহ অসাড় ও বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হলেও তিনি অনবরত 'কালী কালী' বলছিলেন। ইসলামপুর থেকে হাকিম সাহেব এলেন। তর্কবাগীশ মশাইকে ঘটি ঘটি আমানি খাওয়ানো হল। কলসী কলসী পানা পুকুরের ঠাণ্ডা জল তাঁর মাথায় ঢালা হল। তাঁর হুঁস ছিল না। কালী নামের নামাবলী দিয়ে তাঁর সর্বাংগ ঢেকে দেওয়া হল। শেষ নিঃশ্বাসটুকু বেরিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি 'কালী' 'কালী' বলছিলেন।

মাত্র চুয়াল্লিশ বছর বয়সে তর্কবাগীশমশাই-এর আকস্মিক অকাল মৃত্যু তাঁর ছোট দরিদ্র পরিবারটির উপর যেন বিনা মেঘে অশনি নিপাতের মতো অনন্ত দুঃখের সূচনা করেছিল। বিধবা মা ও দুটি ভাইকে নিয়ে রামজয় অকূল পাথারে ভাসলেন। আড়াই বিঘা ধান জমি ও দশ কাঠা ডাঙ্গার উপর দুখানি ছোট মাটির ঘর তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন।

ভাগ্য-দেবতার নিষ্ঠুর আঘাতে আঠারো বছরের তরুণ যুবকের চোখে পৃথিবী অন্ধকার মনে হয়েছিল। এমন সময় হঠাৎ উপস্থিত হলেন তর্কবাগীশমশাই-এর ছোট ভাই রমানাথ। পরণে গৈরিক আলখাল্লা, হাতে তানপুরা, পায়ে খড়ম, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে দীর্ঘ সিঁদুরের তিলক। সঙ্গীত-পাগল এই লোকটির গৃহ সর্বত্র। তিনি কোথায় যেতেন, কোথায় থাকতেন কেউ জানত না। চিরকুমার সংসার-ত্যাগী রমানাথের পৃথিবীতে একমাত্র সম্বল তাঁর প্রিয় তানপুরাটি। কখন নদীর ধারে, কখন গাছের তলায় বসে রাগ রাগিণী আলাপ করতেন। কালাকাল পাত্রাপাত্র স্থান-অস্থান বিচার ছিল না। কখন রাজা জমিদারদের মজলিসে, কখন বড় বড় ওস্তাদদের বৈঠকে, কখন বা গরীব চাষীর দাবায় বসে আপন মনে গান গাইতেন।

দাদার মৃত্যুর কথা শুনে তিনি নিস্পৃহ ভাবে বলেছিলেন, রামজয় ভাবনা চিন্তা করিস না। ভরসা রাখিস,—জীব সৃষ্টি করেছেন যিনি, আহার যোগাবেন তিনি। ক্ষুদ্র-বুদ্ধি মানুষ কেবল ভেবে মরে। ইচ্ছা করলেই কিছু করা যায় না। ওরে মাকড়সা কি ইচ্ছা করে জাল বোনে? মানুষের ইচ্ছায় কি তার নখ চুল গজায়? যা হবার তা হয়। তুই উপেন কবরেজের কাছে যাস্। দাদার বন্ধু সে। তোকে একটা পথ বাতলে দেবে। আমি এখন চল্লুম।

এই বলে তিনি খট খট করে চলে গেলেন। ঝড়ের মতো এলেন, ঝড়ের মতো কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন। রামজয়কে কিছু বলার ফুরসত দিলেন না। এর পর থেকে তিন চার বছর তিনি প্রতি মাসে কিছু কিছু টাকা পাঠাতেন বউদির কাছে। রামজয় অকূলে কূল পেলেন। কোন রকমে সংসার চলতে লাগল।

রমানাথের উপদেশ অনুসারে রামজয় গেলেন পিতৃবন্ধু উপেন কবিরাজের কাছে। কবিরাজি চিকিৎসা শেখার জন্য রামজয় এসেছেন শুনে তিনি বললেন, আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পড়তে চাও, ভালো। এ বড় কঠিন শাস্ত্র। নিদানের দু-একটা শ্লোক আওড়ালে বা গাছগাছড়া থেকে দু-চারটা ওষুধ তৈরি করতে শিখলে কবরেজ হওয়া যায় না। তাতে কিছু পয়সা রোজগার হতে পারে। কিন্তু নাড়ী-জ্ঞান না থাকলে আয়ুর্বেদীয় মতে চিকিৎসা করা যায় না। বৃদ্ধ কবিরাজ-মশাই বলতে লাগলেন, রোগ হলে জানবে নাড়ী রোগ-দুষ্ট হয়েছে, আর রোগ অনুসারে ওষুধ দিতে হবে। নাড়ী-জ্ঞান সাধনা সাপেক্ষ। সাংখ্য বলেন, সত্ত্ব রজ ও তম, এই তিনগুণ নিয়ে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি। পুরাণের ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন গুণের প্রতীক। আয়ুর্বেদ শাস্ত্র বলে, মানুষের নাড়ীতে এই তিনটি গুণ বায়ু পিত্ত ও কফ হয়ে দেখা দেয়। এর কোন একটি বা সবগুলি কুপিত হয়ে রক্তের ভিতর কাজ করে। নাড়ীতে তার বেগ কত তা ধরতে হয়। তারপর ঠিক ওষুধ দিতে পারলে রোগ সারে। কালকে আশ্রয় করে রোগ এলে তা সারে না।

রামজয় বৃদ্ধ কবিরাজের কথা ধীর ভাবে শুনলেন। পরদিন থেকে এক মনে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র পড়তে লাগলেন। বছর দুই পরে মা'র মৃত্যুর পর তাঁর পড়া বন্ধ হয়ে গেল। রমানাথও টাকা পাঠানো বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তাঁর কোন খোঁজখবর ছিল না, সম্ভবতঃ তিনি বেঁচে ছিলেন না।

সেকালে পণ্ডিতের মূর্খ ছেলেকেও মেয়ে দেওয়ার জন্য লোক সাধাসাধি করত। গোপালপুরের শ্রীধর মিশ্র মশাই তাঁর নিজের একমাত্র কন্যা ভবতারিণীকে রামজয়ের হাতে তুলে দিয়ে কৃতার্থ হয়েছিলেন। ভবতারিণীর বয়স তেরো চোদ্দ বছর। ঐটুকু মেয়ের উপর সংসারের ভার পড়ল। তার উপর আবার অভাবের সংসার। হরিভক্ত মিশ্রমশাই-এর অবস্থা ভাল ছিল। মেয়ে জামাই-এর জন্য তিনি প্রতি মাসে দু মণ আলো চাল, কিছু খেঁসারির ডাল্, তালগুড় আর বাগানের শাক-সব্জী পাঠাতেন। রামজয়ের ক্ষুদ্র সংসারটি ভালভাবেই চলতে লাগল।

সচ্ছল বাপের একমাত্র মেয়ে ভবতারিণী সংসারের সকল কাজ করতেন। ভোরে বিছানা থেকে উঠে চারদিকে গোবর জল ছড়াতেন, ন্যাতা দিতেন, জালানি কুড়াতেন, বাসন-কোসন মাজতেন, ও পাড়ার বাঁড়ুয্যেদের বড় পুকুর থেকে জল আনতেন, রাঁধতেন, সকলকে খাইয়ে-দাইয়ে শেষে নিজে খেতেন। রামজয় গরুর খড় কুঁচিয়ে দিতেন, গরু বাঁধতেন, জাব দিতেন, গোয়াল পরিষ্কার করতেন।

নিজের গ্রামে টোল করার অপরাধে তাঁর বাবাকে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয়েছিল ভেবে রামজয় কংসাবতীর ওপারে এক সম্পন্ন চাষী গৃহস্থের বৈঠকখানায় ডিস্পেনসারি খুলে বসলেন। কয়েক বছরের ভিতর তাঁর পসার বেশ জমে উঠল। সেখানে তিনি ডাক্তারবাবু নামে পরিচিত ছিলেন। গাছ-গাছড়া থেকে প্রস্তুত লাল সাদা মেটে রঙের বড়ি, হাওয়ার্ডসের কুইনাইন ক্ষেত্র অনুসারে ব্যবহৃত হত। তাঁর হাত যশ এত বেড়ে গিয়েছিল যে ডাক্তারবাবু আসছেন শুনলে মুমূর্ষু রোগীও উঠে বসত। মাসে কুড়ি পঁচিশ টাকা রোজগার হতে লাগল। গরীব বাগদীদের ভিতর এক পয়সা সুদে তিনি টাকা খাটাতেন। হাতে বেশ দু পয়সা জমে গেল। তাঁর অবস্থা সচ্ছল হয়ে উঠল।

অনেক দিন কেটে গেছে। প্রথম তিনটি মেয়ের পর দুটি ছেলে হয়েছে রামজয়ের। মেয়েগুলির বিয়ে হয়ে গেছে। তাঁর চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সের প্রথম ছেলে শিবনাথ বড় আদরের। তার একটু গা গরম হলে, সে একবার হাঁচলে, কাসলে তিনি দিগ্বিদিক জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়তেন। ভবতারিণীর উপর উৎকট চিকিৎসা চলত। ছেলে মায়ের দুধ খায় আর মায়ের দুধের ভিতর দিয়ে যত রোগ ছেলেকে আক্রমণ করে। সুতরাং ছেলের চেয়ে তার মা'র চিকিৎসা বেশী দরকার।

বিদেশে ডাক্তারী ছেড়ে ছেলেকে দেখাশুনার জন্য রামজয় ঘরে বসলেন। তখন তাঁর হাজার দুই টাকার তেজারতী চলেছে। একদিন ভবতারিণী বললেন, তুমি এখনি কাজকর্ম ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে হাত পা গুটিয়ে ঘরে বসলে কেন? কত টাকার তেজারতী করছ যে সুদের টাকায় সংসারের খরচ চলবে? কলসীর জল গড়াতে গড়াতে তো শেষ হয়ে যাবে। তখন কি হবে? জমি জায়গা কিছু কিনে রাখ। অন্ততঃ খোরাকি ধানটা তো ঘরে থাকা চাই।

রামজয় বললেন, সুদের আয় থেকে রোজ আট আনা খরচ করলে রাজার হালে সংসার চলে যাবে। জমি নিয়ে করবে কি? চাষ করবে কে? বেশী টাকার দরকার কি? তিন মেয়ে তো শ্বশুরবাড়িতে। ছোট ভাই শ্বশুরের সম্পত্তি পেয়ে চলে গেছে। আমাদের চলবে না কেন?

—তুমি কি ভেবেছ ছেলেদের লেখা-পড়া শেখাতে হবে না? বিয়ে দিতে হবে না? সংসার বাড়বে না? খাবার ধান ঘরে থাকলে সাহসে বুক বাঁধা থাকে। বাবার দশ বিঘা জমি আমার হবে জানি। কিন্তু তাতো এখন নয়।

শেষ পর্যন্ত ভবতারিণীর জেদে রামজয় অনিচ্ছাসত্ত্বেও পাঁচ বিঘা জমি কিনেছিলেন। তখন এক বিঘা জমির দাম পনরো টাকা।

॥ দুই ॥

রামজয় নিশ্চেষ্ট বসে থাকার লোক ছিলেন না। নিজে মাটি কোপাতেন। বাগানে বেগুন লাউ কুমড়ো, এমন কি, ধনে লঙ্কা হলুদ পেঁয়াজ আদা ইত্যাদির চাষ করতেন।

তিনি বললেন, বাজারে দু টাকায় একমণ চাল, দেড় টাকায় একমণ কালিমুগ, তিন আনায় এক সের ঘানির সর্ষের তেল, দু পয়সায় এক সের খাঁটি দুধ, আর এক টাকায় এক সের গাওয়া-ঘি পাওয়া যায়।

বুদ্ধিমতী ভবতারিণী বললেন, চিরকাল তো এতো সস্তায় জিনিষপত্র বিক্রি হবে না। কে জানে ভবিষ্যতে কি হবে? কিছু জমি কিনে রাখ। আখেরে কাজ দেবে। শুধু কি খাওয়াদাওয়ার খরচ? বাড়তি খরচ তো আছে?

—আমাদের বাড়তি খরচ বা বাজে খরচ তো কিছু নেই। বারো মাস চুল ছাঁটা, দাড়ি কামানোর জন্য গোবিন্দ পরামাণিককে পূজোর সময় একখানা

নতুন কাপড় আর নগদ একটা টাকা দিতে হয়। লাটিম মার্কা একখানা কাপড়ের দাম তো দশ গণ্ডা পয়সা। সারা বছর সাজো কাপড় কাচার জন্য ধোপাকে দিতে হয় বারো গণ্ডা পয়সা। নিজেদের পরণের কাপড় বাজার থেকে কিনতে হয় না। গৃহস্থালীর কাজকর্ম সেরে তুমি চরকায় সুতো কাটো। তাঁতি কাপড় বুনে দেয়। মজুরি দু আনা। বাগিচায় প্রচুর কার্পাস তুলোর গাছ জন্মায়। তোমাকে অত ভাবনা করতে হবে না। সংসার ঠিক চলে যাবে।

—তোমরা পুরুষ মানুষ। তোমাদের ভাবনা কম। আমরা মেয়েছেলে। আমাদের সব দিক ভাবতে হয়। জমি জায়গা না থাকলে আমরা কোথায় দাঁড়াব? দু-একখানা গয়নাও তো দরকার।

—কেন, তোমার তো রূপার চন্দ্রহার, বাউটি, চুড়ি ও আঙ্গট আছে।

—রাজকুমারবাবুর মেয়েরা কেমন সোনার হার চুড়ি পরে পূজার সময় আসে। আমায় এক ছড়া সোনার হার গড়িয়ে দাও না। এক ভরি গিনি সোনার দাম তো কুড়ি টাকা আর এক ভরি চাঁদি রূপোর দাম আট আনা। এক ছড়া সোনার হারের দাম আর কত পড়বে?

—আমরা কি রাজকুমারবাবুদের মতো জমিদার, না বড়লোক? ওদের সব সাজে। গলায় একছড়া সোনার হার পরবে, আর হাতে রূপোর চুড়ি থাকবে। লোকে হাসবে যে। স্থট মিলিয়ে গয়না পরতে হয়।

ভবতারিণী চুপ করে গেলেন।

রামজয় তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, আমার বাবা তো ডাকসাইটে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁর এমন কিছু জমি ছিল না। সুখে সংসার চলে যেত। যখন বাবার বিয়ে হয়েছিল তখন মায়ের বয়স তো আড়াই বছর। সেই থেকে সারা জীবনটা তো তিনি কাটিয়ে দিলেন দু একখান রূপোর গয়না আর গোছা গোছা নোয়া ও শাঁখা পরে। মা'কে সোনার গয়না দিতে পারেন নি বলে কি পণ্ডিত সমাজে বাবার মান সম্ভ্রম কম ছিল? তুমি যতই সোনার গহনা পর না কেন, তোমার স্বামী রামজয় চক্রবর্তী মুখ্খুই থেকে যাবে। নিজের ওজন বুঝে চললে কেউ হাসে না, বরং ভালবাসে। দ্যাখো, কোমরে শিল ঝুলিয়ে ভারি হওয়া যায় না, আর নেংচে বড় হওয়া চলে না।

তারপর স্ত্রীকে সন্তুষ্ট করার জন্য বললেন, শিবু বেঁচে থাকুক, বড় হোক, লেখাপড়া শিখুক, উপায় করুক। সেই তোমাকে সোনার গয়না গড়িয়ে দেবে। তুমি রত্নগর্ভা। আমাদের দুঃখ কষ্ট ঘুচে যাবে।

ভবতারিণী আর কোনদিন গয়নার কথা রামজয়কে বলেননি। একটু চুপ করে থেকে বললেন, মা ষষ্ঠীর কৃপায় শিবু তো ছ বছরে পা দিল। ওকে এবার পাঠাশালায় ভর্তি করে দাও।

—কালই ওকে ইসলামপুরের গুরুমশাই-এর পাঠশালায় ভর্তি করে দেব। কিন্তু পাঠশালা তো এখান থেকে এক মাইল দূর। রোজ দু বেলা এত রাস্তা হাঁটতে পারবে কি? তাছাড়া কংসাবতীর ধার দিয়ে রাস্তা। কি জানি, ছেলে মানুষ কখন কি করে বসে।

—ওই বয়সের অনেক ছেলে তো পাঠশালায় যাচ্ছে। ভয় কিসের? পাঠশালার পড়া শেষ হলে ওকে টোলে ভর্তি করে দিলে হবে। শিবু আমার তেমন ছেলে নয়। ওর কোষ্ঠীতে আছে ও বিদ্বান হবে। আমার শ্বশুরের মতো ডাকসাইটে পণ্ডিত হবে।

—তা তো হবে। কিন্তু এ গ্রামে টোল কোথায়? টোলে পড়াতে গেলেও তো ঐ টুকু ছেলেকে বিদেশে পাঠাতে হবে। আগে আমাদের গ্রামেই কুড়ি-পঁচিশটি টোল ছিল। এখন তো একটিও নেই! তবে, থাকলেও আমি শিবুকে টুলো পণ্ডিত করতে চাই না।

—সে কি কথা? বামুনের ছেলে সংস্কৃত পড়বে না?

—টোলের সেকেলে বিদ্যায় আমার আস্থা নেই। আমার বাবা তো অত বড় পণ্ডিত ছিলেন। দেশ দেশান্তর থেকে তাঁর নিমন্ত্রণ আসত। কিন্তু ঘাটের জল আর হাটের চাল খেয়েই তো সারা জীবনটা কাটিয়ে গেলেন।

রামজয়কে চুপ করে থাকতে দেখে ভবতারিণী বললেন, তা পরে যা হয় করা যাবে। এখন তো তুমি শিবুকে পাঠশালে ভর্তি করে দাও।

—তা দেব। তবে আমি ছেলেকে ইংরিজি পড়িয়ে মানুষ করতে চাই।

—আগে তো পাঠশালার বিদ্যে শেষ হোক। তারপর ইংরিজি স্কুলে পড়া হবে।

—তা ঠিক।

—ইংরিজি স্কুল এ অঞ্চলে আছে কি?

—এ অঞ্চলে নেই। মহকুমা শহরে বড় ইংরিজি স্কুল আছে। মাইল দুই দূরে একটা এম. ই. স্কুল আছে।

—তাহলে তো ভালো। শশী মহকুমা শহরে থাকে। শিবু এখন দেশের

পাঠশালায় আর ছোট ইংরিজি স্কুলে পড়ুক। একটু বড় হলে ওকে শশীর কাছে রাখলে চলবে। এত ছোট ছেলেকে তো কাছ ছাড়া করা যায় না।

—সেই ভালো। এখন ওকে পাঠশালায় ভর্তি করে দিই।

পরদিন শিবনাথকে সঙ্গে নিয়ে রামজয় উপস্থিত হলেন ইস্‌লামপুরের খোঁড়া গুরুমশাই-এর পাঠশালায়। যাওয়ার সময় ভবতারিণী বেঁধে দিয়েছিলেন লক্ষ্মীজনার্দনের প্রসাদী তুলসী শিবনাথের কাপড়ের খুঁটে আর কপালে দিয়েছিলেন চন্দনের ফোঁটা।

গ্রামের মাঝখানে একটি উঁচু খোলা জায়গার এক প্রান্তে পাঠশালা ঘর, ঠিক ঘর নয়, দু দিকে ছিটে বেড়া দিয়ে ঘেরা একটা চালা। পিছনে একটি বড় পুকুর। তার জলে অসংখ্য সাদা ও লাল শালুক ফোটে। আর এক প্রান্তে একটি শিবমন্দির। চুন-বালি-খসা ইটের দেওয়াল। ফুটো ছাদ মেরামত করা দুঃসাধ্য দেখে গাঁয়ের হিন্দু চাষীরা বাঁশ খড় যোগাড় করে মন্দিরটি ছেয়ে দিয়েছিল। এইভাবে রোদ বৃষ্টি জল থেকে মাথা বাঁচিয়ে ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভোলানাথ বহু নরনারীর পূজা গ্রহণ করতেন। নিকষ কালো পাথরের শিবলিঙ্গ। লোকে বলতো স্বয়ম্ভূ। শনি ও মঙ্গলবার দু-দশ জন যাত্রী আসে। বাবার মাথার উপর রাশি রাশি বেলপাতা চাপায়। ঘটি ঘটি দুধ ঢালে। দু-একটা পয়সা দক্ষিণা দেয়। সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করে। মানত করে। তারপর চলে যায়। বৈশাখ মাসে বাবার গাজন হয়। ধূনাসেবা হয়। সন্ন্যাসীরা নিচের দিকে মাথা আর ওপর দিকে পা রেখে দোল খায়। মেলা বসে। সঙ দেখানো হয়। কবিগান ও তরজা শুনতে লোক জমে যায়। গাজন শেষ হলে সারা বছর কেউ বাবার কোন খোঁজ খবর রাখে না।

চালা ঘরের ভিতরে বারো চোদ্দটি ছেলে চেটাই-এর উপর বসে দুলতে দুলতে পাঠ মুখস্থ করছে। সামনে খোলা প্রাঙ্গণের এক অংশে একটা ছোট ছেলে একখানা ইট ঘাড়ে নিয়ে একটা ঠ্যাং এর ওপর ভর করে সামনের দিকে ঝুঁকে আছে। আর একটি ছেলেকে কুমড়ো গড়ানো হচ্ছে। আর একটি ছেলেকে কান ধরে ওঠ-বস্ করানো হচ্ছে। অন্য একটি ছেলেকে খুঁটিতে বেঁধে জল বিছুটি দেওয়া হচ্ছে। রামজয় জানতেন এই ধরণের শাস্তিদানের বিধি পাঠশালার শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান অঙ্গ। এতে আশ্চর্য ও বিচলিত হওয়ার কিছুই ছিল না। কিন্তু ছ বছরের দুধের ছেলে শিবনাথের

পক্ষে শিশু-মেধের ভয়াবহ দৃশ্য সহ্য করা সহজ হয়নি। এতগুলি সমবয়সী শিশুর কাতরানি দেখে ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গিয়েছিল।

গুরুমশাই একখানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসে থেলো হুঁকোয় ভুড় ভুড় শব্দে দা-কাটা তামাক টানছিলেন। পাশে একখানা লম্বা লিকলিকে বেত পড়েছিল। রামজয়বাবুকে আসতে দেখে তিনি বললেন, আসুন ঠাকুরমশাই, বসুন। কোথায় রে রাম, কল্কিটা পালটে দে তো, বাবা। একটু কলাপাতা আনিস। রাম কল্কিটা নিয়ে তামাক সাজতে গেল।

রামের বয়স তেরো চোদ্দ বছর। পাঠশালে পড়ুয়া ছাত্র বলে মনে হয় না। কালো কুচকুচে রঙ। বেশ হৃষ্ট পুষ্ট চেহারা। চাষীর ছেলে। স্বাস্থ্যবান। গুরুমশাই-এর ডান হাত। আধা গুরুমশাই। সে ছোট ছোট ছেলেদের পড়া নিত আর নতুন পড়া দিত। ঘুরে ঘুরে ছেলেদের শাস্তির তত্ত্বাবধান করত। গুরুমশাই-এর হুকুম তামিল করত। তামাক সাজত। আড়ালে তামাক ধরিয়ে কল্কিটা তাঁর হুঁকোর মাথায় বসিয়ে দিত। পাঠশালা-পালানো ছেলেকে চ্যাং-দোলা করে আনত।

তামাক টানতে টানতে গুরুমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, এ ছেলেটি কে?

—আমার ছেলে।

—খোকা, তোমার নাম কি হে?

শিবনাথ নবমীর পাঁঠার মতো ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বলল, শিবনাথ চক্রবর্তী।

রামজয় বললেন, ওকে আপনার পাঠশালায় ভর্তি করে নিন। তারপর শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বললেন, শিবু, গুরুমশাইকে পেন্নাম করিস নি?

শিবনাথ প্রণাম করতে গেল।

—আঃ ছি ছি। আপনি কি বলছেন? বামুনের ছেলে আমাকে পেন্নাম করবে?

—তা হোক। আপনি ওর শিক্ষাগুরু। গুরুর কাছে কি জাতের বাছ-বিচার আছে? ও ছেলে মানুষ। এখনও পইতে হয়নি।

—তা না হোক্। বামুনের ছেলে তো! খরিস্ বাচ্চা। তুলসী পাতার কি ছোট বড় আছে?

গুরুমশাই কল্কিটা রামজয়বাবুর হাতে দিলেন। রামচন্দ্র কলাপাতার নল পাকিয়ে দিয়েছিল।

রামজয় বললেন, এ তল্লাটে আপনার মতো গুরুমশাই আমাদের চোখে পড়ে না। শুনেছি, ছেলেরা আপনাকে যমের মতো ভয় করে। গুরুমশাইকে ভয় না করলে কি ছেলের লেখাপড়া হয়? পাঠশালার পড়া শেষ হলে শিবুকে ইংরিজি স্কুলে ভর্তি করে দেব। কি বলেন আপনি? আজকাল ইংরিজি না শিখলে চলে না।

—বেশ, বেশ! খুব ভালো। তবে বিদেশী ভাষা শেখার আগে মাতৃভাষায় পোক্ত হতে হবে।

—তা বটে। আচ্ছা, ওর মাইনে কত হবে?

—এমন কিছু নয়। মাসে দু আনা।

—আর কিছু লাগবে কি?

—প্রতি বৃহস্পতিবার এক পোয়া চাল, আর প্রতিদিন বিকেলে এক ছিলিম তামাক আনতে হবে। আর এক খিলি পান আনতে পারে তো ভালো। তবে একটা গোটা পান আনলে আরও ভালো হয়।

—তা হোক্। আমি শিবুর চার আনা মাইনে দেব। ওকে মারধোর করবেন না। এখন কি পড়ানো হবে?

—প্রথমে রামখড়ি দিয়ে মাটির ওপর বাংলা অক্ষর লিখতে শেখানো হবে, তারপর তালপাতায় এবং শেষে কাগজে লিখতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর মশাই-এর বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ ও ধারাপাত, তারপর নামতা, দ্বিতীয় ভাগ, কথামালা, শুভঙ্করের আর্যা, যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ইত্যাদি অঙ্ক শিখতে অন্ততঃ তিন বছর লাগবে বই কি।

—তবে শিবু খুব বুদ্ধিমান ছেলে। দু বছরে পাঠশালায় পড়া শেষ করতে পারবে।

—গোড়াপত্তন ভালো হওয়া চাই। বনেদ কাঁচা থাকলে ঘর পড়ে যায় জানবেন।

—তা তো বটেই। আজ থেকে শিবনাথকে আপনার হাতে তুলে দিলাম। আজ উঠি। কাল থেকে ওকে পাঠিয়ে দেব।

চরকায় কাটা সুতায় বোনা একখানি নতুন কাপড় ও একটি টাকা গুরু-দক্ষিণা দিয়ে শিবনাথ প্রণাম করল। তারপর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে রামজয় বাড়ি ফিরলেন। পরদিন থেকে শিবনাথ পাঠশালায় আসতে লাগল।

পাঠশালায় ভর্তি হওয়ায় মাস তিন পরে মিশ্রমশাই-এর শরীর ভালো নয়

সংবাদ পেয়ে ছেলেপুলেদের নিয়ে রামজয় শ্বশুরবাড়ি চলে গেলেন। গোপালপুর একেবারে অজ পাড়াগাঁ। ম্যালেরিয়ার প্রকোপে গ্রামের অবস্থা শোচনীয়। গ্রামের শেষ প্রান্তে একটা বিস্তীর্ণ মাঠের ধারে মিশ্রমশাই-এর বাড়ি। মাটির দোতলা। উপর নিচে চারখানি ঘর। উঠন খড়ের ছাউনিযুক্ত মাটির উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। দুটি প্রাণীর নিরানন্দময় সংসার। তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিল না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই নিরামিষভোজী। জমিদারবাড়ির বরাদ্দ ঠাকুরসেবায় প্রত্যহ আড়াই সের আলোচাল এবং সন্ধ্যায় ঠাকুর শীতলের গাওয়া ঘির লুচি ও আধসের দুধ মিশ্রমশাই-এর প্রাপ্য ছিল। দোতলার একখানি বড় ঘরে রাধাকৃষ্ণের পিতলের যুগলমূর্তির অঙ্গসেবা এবং পূজা সেরে মিশ্রমশাই যেতেন জমিদার বাড়ি শালগ্রাম শিলার পূজা করতে। আবার সন্ধ্যায় ঠাকুরের শীতল দিতে যেতেন। অনেক দিন পরে মেয়ে-জামাই ও নাতি-নাতনীর আগমনে মিশ্র দম্পতির শুষ্ক জীবনে আনন্দের প্রবাহ দেখা দিল। এখানে আসা অবধি ভবতারিণী মাকে রাঁধতে দিতেন না। রামজয়বাবু ঠাকুর-পূজার ভার নিলেন। বৈষ্ণব-গ্রন্থ পাঠে, রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের পূজায় এবং নাম কীর্তনে মিশ্রমশাই-এর সময় সুখে কাটতে লাগল। সন্ধ্যার পর আহ্নিক সেরে মিশ্র-গৃহিণী নাতি-নাতনীদের নিয়ে গল্পগুজবে সময় কাটাতেন।

শিবনাথকে ওখানকার জমিদারদের ছাত্রবৃত্তি স্কুলের সকলের নিচের শ্রেণীতে ভর্তি করে দেওয়া হল। মাটির দেওয়ালের জীর্ণ স্কুল বাড়ি। দেওয়ালে অসংখ্য ইঁদুর গর্ত। ঘরের চালে খড় ছিল না বললেই হয়। স্কুলে সর্বশুদ্ধ তিরিশ চল্লিশটি ছাত্র। উচ্চতম শ্রেণীতে মাত্র তিনটি। দু একটা ক্লাশ পড়ার পর ছাত্ররা স্কুল ছেড়ে দিত। বেশী পড়াশুনার দরকার কি? রামায়ণ মহাভারত পড়তে পারলে আর কাজচলা গোছের হিসেবপত্র রাখতে পারলে তাদের বিদ্যা শেষ হয়ে যেত। তাদের বাপ-মা'রা বলত, বেশী পড়ে কি হবে? চাষীর ছেলে চাষ করে ভাত খাবে। ইংরিজি জানা লোক এ অঞ্চলে ছিল না। পাঁচ সাত মাইলের ভিতর পাশের গ্রামের ভট্টাচার্যিদের একটি ছেলে মহকুমা স্কুল থেকে সে বছর এনট্রান্স পাশ করেছিল। কত লোক তাকে দেখতে এসেছিল।

স্কুলের পাশেই হাট। প্রতি সপ্তাহে শনি ও মঙ্গলবার হাট বসত। একটি মাত্র মুদী দোকান। সপ্তাহের সকল দিন দোকানটি খোলা থাকত।

মিশ্রমশাই-এর বাড়ির সামনে দক্ষিণ দিকে আদিগন্ত বিরাট মাঠ। তার

মাঝখানে একটি বৃহৎ মজা দীঘি। নাম 'দরখোলা পুকুর'। প্রথম পুকুর কাটার সময় হু হু করে জল উঠে পড়ার দরুন পুকুরটি সম্পূর্ণ কাটা হয়নি। বর্ষাকাল ছাড়া তাতে প্রায় জল থাকত না। পাড় সমেত পুকুরটি প্রায় বিশ বিঘা। চার ধারের পাড়ে বিস্তর বড় বড় অশ্বত্থ বট গাছ, বাঁশ ঝাড়। চার পাঁচখানি গ্রামের লোক সেখানে মড়া পোড়াত। মহাশ্মশান। শবদাহ করার সময় ছাড়া কেউ সেখানে যেত না। দিনের বেলা গেলেও গা ছম ছম করত। লোকে বলত সেখানকার গাছগুলোর ডালে নাকি ভূত ঝুলে থাকে।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর নাতিনাতনীদের নিয়ে দিদিমা সামনের দলিজে বসে বেঙ্গমা-বেঙ্গমী, রাক্ষস-খোক্ষস, রামায়ণ-মহাভারতের গল্প, রাজপুত্র কোটালপুত্র প্রভৃতির রূপকথা নানা সুরে নানা ভঙ্গীতে বলতেন। কখনো তারা ভয়ে তাঁকে আঁকড়ে ধরত, কখনো তারা বুড়ীর রকমসকম দেখে হেসে লুটে পড়ত। বুড়ী ছিলেন গল্পের ঝুড়ি। সমানে দু তিন ঘণ্টা বলে চলতেন। গল্পের শেষ ছিল না। কথা ফুরোত না। নতুন গল্প বানাবার অপূর্ব ক্ষমতা ছিল তাঁর।

বর্ষাকাল। সন্ধ্যার আগে বেশ ভারি এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। সাঁঝের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। ঝিঁ-ঝিঁ পোকার ডাক শোনা যাচ্ছে। পুকুর পাড়ের নিম গাছটার পাতার ভিতর অসংখ্য জোনাকি ঝিকমিক জ্বলছে। দিদিমা রাক্ষসের একটা মজার গল্প ফেঁদে বসেছেন, এমন সময় দূরে শ্মশানে দু-চারটা আলো দপ্ দপ্ জ্বলে উঠল। বুড়ী বললেন, ঐ দ্যাখ আগুনখাকীকে। ছেলেরা চমকে উঠে তাঁর মুখের দিকে তাকাল। তিনি গম্ভীর হয়ে বললেন, আগুনখাকী কে জানিস্? এক রকমের ভূত, পোয়াতী মেয়ে মরে গেলে সে আগুনখাকী হয়ে শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়। হাঁ করলে তার মুখে আগুন জ্বলে। তারা ভয়ে তাঁকে জড়িয়ে ধরল। তিনি হেসে বললেন, একরকম ভূতের কথা শুনে ভয় পাচ্ছিস্? ভয় কিসের? ওরা এদিকে আসে না। আরও অনেক জাতের ভূত আছে, এই যেমন—বেম্ভদৈত্যি, মাম্‌দো, কন্দকাটা, গোমুয়া, পেত্নী, শাঁকচুন্নী আর নিশি।

তারা সাগ্রহে তাকিয়ে রইল। তিনি বলতে লাগলেন, সৎ স্বভাবের বামুনের আইবুড়ো ছেলে মরলে বেম্ভদৈত্যি হয়। সে শ্মশানে অন্য

ভূতের সঙ্গে থাকে না। তার আস্তানা বেল কিম্বা নিম গাছে। বড় ভদ্র ভূত এই বেম্ভদৈত্যি। কারোর অনিষ্ট করে না। গভীর রাত্রে খড়ম পায়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে করতে ঘুরে বেড়ায়। মুসলমান ভূতের নাম মামদো। বেম্ভদৈত্যি যেমন ভদ্র, মামদো তেমনি অসভ্য ও পাজী। তার মতো জেদী একগুঁয়ে ভূত আর নেই। কন্দকাটাও কম যায় না। তার মুণ্ডু নেই। সামনের দিকে লম্বা হাত দুটো নাড়তে নাড়তে অন্ধকার রাত্রে ঘুরে বেড়ায়। হাত দিয়ে মানুষকে জাপ্টে ধরে পিষে মারে পোয়াতী গরু মরলে সে গোমুয়া হয়। গরুর মাথাটা গাঁক-গাঁক শব্দ করতে করতে এদিক ওদিক ছোটে। যার দু পায়ের ফাঁক দিয়ে সে গড়িয়ে যায় তার আর রক্ষে নেই। গোমুয়ার হাত থেকে বাঁচতে হলে পুরুষ মানুষকে সামনের কোঁচাটা ঝুলিয়ে দিয়ে হাঁটতে হয়। মেয়েদের পা পর্যন্ত কাপড়ে ঢাকা থাকে। এজন্য সে তাদের অনিষ্ট করতে পারে না। পেত্নী আর শাঁকচুন্নী অনিষ্ট করে না। দুষ্টুমি করে আর ভয় দেখায়। সাতগেড়ে পুকুরের ধারে বাঁশঝাড়ে একটা পেত্নী আছে। লোককে আসতে দেখলে সে পথের ওপর একখানা বাঁশ নুইয়ে ধরে। পথ চলার সময় কোন আনাড়ী পথিক যখন বাঁশখানা ডিঙিয়ে যায় তখন সেটা সোঁ করে ওপরে উঠে যায়। লোকটা ওপর থেকে ধপাস করে মাটিতে পড়ে, আর হাড়গোড় ভাঙে। শাঁকচুন্নীগুলো খিড়কি ঘাটের ধারে গাছে বা ঝোপে চুপচাপ বসে থাকে। সন্ধ্যের পর মাছের চুপড়ি নিয়ে ঘাটে গেলে তারা ভয় দেখিয়ে মাছ কেড়ে খায়। নিশি বড় মজার ভূত। গভীর রাত্রে সে বাড়ির দরজায় মানুষের নাম ধরে ডাকে। ঘুমন্ত লোক যদি তার ডাক শুনে বিছানা থেকে ধড়মড়িয়ে উঠে দরজা খোলে, তবে তার নিস্তার নেই। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সে নিশির পিছনে চলে, আর পুকুরের জলে ডুবে মরে। নিশি তিনবার ডেকে চলে যায়। এজন্য বেশী রাত্রে একবার দুবার ডাক শুনে দরজা খুলতে নেই। দুষ্টু বদমাইশ লোক মরলে ভূত হয়ে গাছে বসে থাকে। ঠিক দুপুর বেলা যদি কোন যুবতী মেয়ে সাজগোজ করে তার পাশ দিয়ে যায় তবে সে তাকে ধরে। যুবতী মেয়ের দিকে তার টান বেশী।

নানা প্রকারের নানা জাতের ভূতের কথা শুনে ভয়ে হেমাঙ্গিনীর জিভ শুকিয়ে গেছে। আশ্চর্য হয়ে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করে, হাঁ দিদিমা,

দেশে কি এত ভূত আছে? দিদিমা বললেন, এক সময় দেশে অনেক ভূত ছিল। এখন কমে গেছে।

—কেন, তারা কি এখন মরে গেছে?

—সে কি রে? মানুষ মরে ভূত হয়। মরার পর তারা কিছুকাল এই পৃথিবীতে ঘুরে বেড়ায়। তখন আমরা তাদের ভূত বলি। ভূত মরে না।

—তারা কি বরাবর ভূত হয়ে থাকে?

—তা থাকবে কেন? তাদের ছেলেরা গয়ায় পিণ্ডি দিলে তাদের উদ্ধার হয়। তখন তাদের ভিতর কেউ যায় স্বর্গে। আবার কেউ নরকে পচে মরে। আজকাল অনেক ভূত উদ্ধার হয়ে গেছে। আগে রেলগাড়ি ছিল না, পায়ে হেঁটে গয়ায় যেতে হত। যাতায়াতে ছ মাস সময় লাগত। অনেকে যেতেই পারত না। এখন গয়ায় গিয়ে শ্রাদ্ধ করা সহজ হয়ে গেছে। নক্ষত্রগুলো সৎ লোকের আত্মা। তারা নক্ষত্র হয়ে আকাশে ঝিকমিক করে জ্বলছে। যে দুষ্টু লোকগুলো জীবনে শুধু পাপ কাজ করে, মিথ্যা বলে, লোকের অনিষ্ট করে, চুরিডাকাতি ও খুনজখম করে, গয়ায় শ্রাদ্ধ করলেও তারা স্বর্গে যায় না। কিছুকাল নরক যন্ত্রণা ভোগ করার পর তারা জন্তু জানোয়ার হয়ে জন্মায়। কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করতে হয়।

বুড়ীর মুখ থেকে পরলোক তত্ত্ব শুনে শিবনাথ অবাক হয়ে চুপ করে থাকে। হেমাঙ্গিনীর বুক দুর্ দুর্ করে। বুড়ী বললেন, এই মন্ত্রটা মনে মনে তিনবার আওড়াবি। ভূত তোদের কিছুই করতে পারবে না।—

ভূত আমার পুত শাঁকচুন্নী আমার ঝি,
রাম-লক্ষ্মণ বুকে আছেন, করবে আমার কি?

দিদিমার শেখানো ভূতের মন্ত্রটা মনে মনে তিনবার আওড়ানোর পর নিজেকে ভূতের হাত থেকে নিরাপদ ভেবে হেমাঙ্গিনী জিজ্ঞাসা করল, তুমি এখুনি বললে দুষ্টু ভূত মেয়েদের ধরে। আমি তো মেয়েছেলে। আমাকেও তা হলে ধরবে?

দিদিমা হেসে বললেন, তুই তো এখন ছেলে মানুষ। বাইরের দুষ্টু ভূত ধরার বয়স এখনো হয়নি তোর। তোর শ্বশুরবাড়ির ভূতটা তোকে ছুঁয়ে রেখেছে। আরও চার পাঁচ বছর পরে বাইরের ভূত তোকে ধরতে

পারে। তখন সাবধানে থাকবি। ঘরের ভূতের আশ্রয়ে থাকলে বাইরের দুষ্টু ভূত ধরতে পারবে না।

তাঁর রসিকতার মর্ম এগারো বছরের পাড়াগাঁয়ের সরল বালিকা বুঝতে পারল কিনা জানি না। তাঁকে হাসতে দেখে তারাও হাসতে লাগল। পাঁচ বছরের ছোট ভাইটি মাদুরের উপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে হেমাঙ্গিনী তাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘরে বিছানার উপর শুইয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, তাহলে মেয়েদের ভূতে ধরলে কি আর ছাড়ে না?

—ইচ্ছে করে কি ছাড়ে? ওঝারা মন্ত্রতন্ত্রের জোরে ভূত ছাড়ায়। তাদের কাছে দুষ্টু ভূতগুলো জব্দ হয়।

হেমাঙ্গিনী আগ্রহের সুরে বললে, দিদিমা, তুমি ভূতে ধরা দেখেছ?

—তা আর দেখিনি? তবে শোন। অনেক কাল আগের কথা। তখন আমি কনে বউ। সবেমাত্র ঘর করতে এসেছি। ও বাড়ির ভবী ঠাকুরঝিকে ভূতে ধরেছে শুনে ছুটে গেলাম তাঁদের বাড়িতে। উঠন লোকে লোকারণ্য। আমি বউ মানুষ। ঘোমটার ভিতর থেকে জ্বল জ্বল করে দেখছিলাম। ভবী ঠাকুরঝি ঘরের দাবায় শুয়ে আছেন। হাত পা ছুড়ছেন। গোঁ গোঁ শব্দ করছেন। মুখে ফেনা তুলছেন। দু তিন ঘণ্টা এই অবস্থা! মাথা ও বুক থেকে কাপড় সরে গেছে। লাজ-লজ্জা নেই। হুঁস নেই। সকলের মুখের দিকে কট্‌কট চেয়ে আছেন। রামা চাঁড়ালকে ডাকা হয়েছে। এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ গুণিন রামা চাঁড়াল। পিশাচ-সিদ্ধ লোক। সে নাকি কামরূপ কামাখ্যা থেকে মন্ত্রতন্ত্র শিখে আকাশ পথে উড়ে এসেছিল। ভূতে-ধরা, সাপে-কাটা, পুঁইয়ে-পাওয়া, ডাইনী-চোষা, বাণমারা প্রভৃতি আধিভৌতিক আধিদৈবিক এমন কি আধ্যাত্মিক রোগের ধন্বন্তরি। বামনের মতো হ্রস্ব, আবলুশের মতো নাদুসনুদুস মানুষটি ভৌতিক বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ ছিল। সে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ছিল। সর্ষে ছুঁড়ে তাঁর গায়ে মারতে লাগল। তারপর একখানা হলুদ পুড়িয়ে তাঁর নাকের কাছে ধরল। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না। ঠাকুরঝির একই অবস্থা। তারপর একটা ছেঁড়া চটিজুতো নিয়ে রামা তাঁকে পটাপট মারতে লাগল।

ঠাকুরঝি চিৎকার করে বললে, ওরে বাবা রে! আমাকে ছেড়ে দে রে, আমি এখুনি চলে যাচ্ছি।

রামা জিজ্ঞেস করল, তুই কে রে?

—আমি ঠাক্‌রে মালির বেটা ফক্‌রে।

—কোথায় ধরলি?

—কেন, সাতগেড়ে পুকুরের ঘাটের ধারে। মাথার চুল এলো করে বুকের কাপড় খুলে দিয়ে পান খেয়ে ঠোঁট রাঙা করে পুকুরঘাটে যাচ্ছিল।

—তুই চলে যাচ্ছিস কি না দেখিয়ে যা।

ঠাকুরঝি ধড় মড় করে উঠে একটা জলভর্তি ঘড়া দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরে খিড়কির দিকে ছুটে চললেন। যেন উন্মত্ত পাগল। কিছুটা যেতে না যেতে চৌকাটটায় পা লেগে ধপাস করে পড়ে গেলেন। একেবারে অজ্ঞান। তাঁর মুখে চোখে জল ছিটিয়ে দেওয়া হল। তালপাখার বাতাস করা হল। জ্ঞান ফিরে এল। অত লোকজন দেখে হক্‌চকিয়ে গেলেন। বুকে ও মাথার উপর কাপড় টেনে ভালো মানুষের মতো উঠে বসলেন। ওঝারা শুধু ভূত ছাড়ায় না, সাপে কাটা, বাণমারা, পুঁয়ে-পাওয়া, ডাইনী-চোষা রোগীদেরও ভাল করে।

বুড়ী একবার গল্প আরম্ভ করলে থামত না। সে যেন আপনভোলা হয়ে যেত। রাত্রি হয়ে যাচ্ছে দেখে ভবতারিণী সদর দরজায় এসে বললেন, মা, এবার ওদের ছেড়ে দাও না। ভাত ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। অগত্যা তারা সকলে উঠে পড়ল।

॥ তিন ॥

জমিদারবাড়িতে সরস্বতী পূজা। মহা সমারোহ। কলকাতা থেকে ভালো যাত্রাদল এসেছে। বিকাল চারটায় যাত্রাগান আরম্ভ হয়েছে। দূর গ্রাম থেকে দলে দলে মেয়ে-পুরুষ ছেলে-বুড়ো এসেছে। এক মনে যাত্রা শুনছে। সন্ধ্যার সময় প্রতিমার দুধারে সেজ জ্বালা হয়েছে। সামিয়ানার নিচে ঝোলানো শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত কাঁচের ঝাড়-লণ্ঠনে অসংখ্য মোম-বাতি জ্বলে উঠেছে। ধীর স্থিরভাবে হাজার লোক ঠায় বসে গান শুনছে। অভিনয় দেখছে। বাজনার তালে তালে গদাযুদ্ধ, সখিনাচ দর্শকদের মনে আনন্দের ঢেউ তুলছে। রাজার শলমা-চুমকি বসানো

ঝকঝকে পোষাক দেখে তাদের চোখ ঝলসে যাচ্ছে। নারদ মুনির আবক্ষ পাকা দাড়ি, উদারপরায়ণ বয়স্তের স্থূল রসিকতা সরল গ্রামবাসীদের মনে হাসির ঢেউ তুলছে। অভিনেতাদের লম্বা লম্বা বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কাঠের বেড়া দিয়ে ঘেরা প্রেক্ষাস্থানের চার কোণে সাদা চোগা চাপ-কান পরে চার জন জুড়ি দাঁড়িয়ে তারস্বরে গান ধরেছে। মাঝে মাঝে তারা স্থান বিনিময় করছে। শ্রোতাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে, কাণের কাছে বা হাত তুলে রাগিণী ধরছে। কিছুক্ষণ তাদের ভিতর রাগিণী কাড়াকাড়ির পালা চলতে থাকে। সমজদার শ্রোতারা তারিফ করছে। ছোট ছেলেরা গোলমাল জুড়ে দিয়েছে। মেয়েরা পরস্পরের মধ্যে গৃহস্থালীর গল্পে মশগুল হয়েছে। কোন মেয়ের কোলের শিশু ট্যাঁ ট্যাঁ স্বরে কেঁদে উঠছে। জুড়িরা শ্রোতাদের দিকে পিছন ফিরিয়ে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে হাত নেড়ে সমস্বরে হট্টগোল বাধিয়ে তোলার পর হা-হা-হা করে এক সঙ্গে বসে পড়ছে। দুটি সুদীর্ঘ পঞ্চাঙ্ক পৌরাণিক গীতাভিনয় এবং দুখানি নাতিদীর্ঘ প্রহসন অভিনয় পরদিন সকাল আটটা ন'টা পর্যন্ত চলেছে। শ্রোতারা বারো চৌদ্দ ঘণ্টা একভাবে বসে শুনছে। নেহাৎ প্রয়োজন না হলে স্থান ছেড়ে ওঠে না, যদি বসার জায়গা বেদখল হয়ে যায়! যাত্রাশালের বাইরে মুড়ি মুড়কি বাতাসার দুচারটি দোকান, পান-দোক্তা আর বাড়সাই-এর স্টল। একটিও চা-এর দোকান নেই। চা যে কি বস্তু পাড়াগাঁয়ের লোকে তখনও জানত না।

পুরোহিত হিসেবে রামজয়বাবুকে পূজার তিনদিন জমিদারবাড়িতে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। বাড়িতে মিশ্রমশাইকে একলা রেখে এ বাড়ির কেউ যাত্রা শুনতে আসেনি।

সরস্বতী পূজার দিন কয়েক পরে একদিন হঠাৎ কাসতে কাসতে রামজয়বাবুর মুখ দিয়ে রক্ত উঠতে লাগল। কবিরাজমশাই দেখে শুনে ঔষুধের ব্যবস্থা করে বললেন, ও কিছু নয়, রক্তপিত্ত। পূজার কয়েক দিন একটু বেশী খাটাখাটুনি হয়েছিল কিনা। খালি পেটে থাকার দরুন পিত্ত বৃদ্ধি হয়েছে। মিছরির সরবৎ আর এই বড়ি খাও সেরে যাবে। ভয় নেই।

চিকিৎসায় কিছু ফল হল না। তাঁর দেহ শীর্ণ হয়ে গেল। নারায়ণের কাছে তুলসী দেওয়া হল। আরও বেশী রক্ত উঠতে লাগল। দিদিমা

শীতলা মায়ের 'থানে' হত্যা দিলেন। হত্যার তৃতীয় দিন ভোর রাত্রে কে যেন তাঁকে বলল, হত্যায় কিছু হবে না। উঠে যা। গুণিন ডেকে চণ্ড নামাতে বল। তোর জামাইকে কে 'বাণ' মেরেছে।

বুড়ী বাড়ি ফিরে এসে রামা গুণিনকে ডেকে পাঠালেন। রামা খালি পায়ে পুকুর থেকে এক ঘটি জল তুলে আনল। একটা কুশাসনের ওপর বসে চোখ বুজে কি যেন ভাবতে লাগল। ধ্যানভঙ্গের পর বলল, রামজয়বাবু যখন একদিন সদর পুকুরে জাল ফেলে মাছ ধরছিলেন তখন এক গুণিন পাড় দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে বাণ মেরে ছিল। যে সে বাণ নয়, একেবারে রক্তবাণ। কিছুদিন রক্ততোলার পর রোগী দুর্বল হয়ে মারা যায়। বেটা জানে না যে বাপেরও বাপ আছে। আমি এখুনি এর ব্যবস্থা করছি।

রামা একখানা কম্বল আসনের উপর বসল। তার সামনে একটি আমসার দেওয়া জলপূর্ণ পিতলের ঘট। পাশে পুষ্পপাত্র। থালাভর্তি বাতাসা মেঠাই মণ্ডা। ঘর থেকে ছেলেমেয়েদের বার করে দেওয়া হল। রামজয়বাবু তার বাঁ পাশে বসলেন। রামা তার গায়ে হাত ছুঁয়ে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগল। একটু পরে হঠাৎ ঘরের ভিতর দুম দুম শব্দ শোনা গেল। তারপর কে যেন নাকিস্বরে কথা বলতে লাগল। রামা মন্ত্র পড়তে লাগল। বমি করার শব্দ শোনা গেল। রামজয়বাবু ভয়ে জড়সড়। পূর্ব নির্দেশ অনুসারে তিনি নিস্তব্ধ ছিলেন। বমির শব্দ বন্ধ হয়ে যাওয়ার পর রামজয়বাবু প্রদীপ জ্বাললেন। দেখলেন, রামা অজ্ঞান অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে। তার নাকে মুখে রক্ত। মেঝেটা রক্তে পয়মাল হয়ে গেছে। দরজা খুলে রামজয় বাড়ির সকলকে ডাকলেন। রামার অবস্থা দেখে তারা অবাক। ভয়ে কেউ ঘরে ঢুকতে পারছিল না। একটু পরে রামা যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠে বসল। বলল, আর কোন ভয় নেই। রামজয়বাবু ভাল হয়ে গেছেন। তারপর নাকমুখ ধুয়ে একটা টাকা, একখানা নতুন কাপড় আর কিছু মিষ্টি নিয়ে বাড়ি গেল। পরদিন থেকে রামজয়বাবুর রক্ত ওঠা বন্ধ হয়ে গেল। দিন কয়েকের মধ্যে তিনি পূর্ণ স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন।

শ্বশুরের ছত্রছায়ায় রামজয়বাবুর দিনগুলি সুখে কাটতে লাগল; কিন্তু তিনি মনে অসুখী ছিলেন। শিবনাথের বয়স বেড়ে যাচ্ছে। তার লেখাপড়ার সুবিধা হচ্ছিল না। ওদেশে ইংরেজী স্কুল তো দূরের কথা,

একটা ভাল ছাত্রবৃত্তি স্কুলও ছিল না। জমিদারের এই ঢকের টাটি স্কুলটা তো স্কুল নয়, গোয়াল ঘর। দেশে যেতে পারলে অন্ততঃ দু মাইল দূরে ভাল এম. ই. স্কুলটিতে তাকে ভর্তি করে দেওয়া চলবে। তারপর যা হয় হবে।

একদিন সন্ধ্যার সময় ভবতারিণী ঠাকুরঘরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালছিলেন। মিশ্রমশাই রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহের সামনে বসে মালা জপতে জপতে যেন একটু ঢলে পড়লেন। ভবতারিণী ছুটে এসে বাবার মৃত দেহকে কোলে তুলে নিলেন। রামজয় ঠাকুরের শীতল দিতে জমিদারবাড়ি গেছেন। একটু পরে ফিরে এসে দেখলেন বৃদ্ধ পিতার মৃতদেহ ভবতারিণীর কোলে। নাতিনাতনী ও তাদের দিদিমা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। মিশ্রমশাই-এর মুখ যেন স্বর্গীয় দ্যুতিতে উজ্জ্বল। তার উপর মৃত্যুর ছায়া পড়েনি। পাড়ার লোকজন ছুটে এল। তারা বলল, জপ তপ যত কর মরতে জানলে হয়।

মিশ্রমশাই-এর মৃত্যুর কয়েক মাস পরে শ্বশুরের জমি চাষ ও ঠাকুর পূজার ব্যবস্থা করে রামজয় স্বগ্রামে ফিরে গেলেন। যাওয়ার সময় শাশুড়ী বললেন, আর কটা দিনই বা বাঁচব। স্বামীর ভিটে ছেড়ে যাব না। ভবতারিণীর চোখের জলেও মায়ের মন টলল না। তিনি বললেন, ভব, আমার জন্যে তুই কোন চিন্তা করিস না, মা। কোন রকমে চালিয়ে নেব। বিধবা মানুষ। এক বেলা এক মুঠো আলোচাল ফুটিয়ে নিলেই চলবে। রাত্রে তো ভাত খাওয়ার বালাই নেই। জলটল খেলেই চলে যাবে।

মাইল পাঁচেক রাস্তা গরুর গাড়িতে আসার পর রামজয়বাবুর ক্ষুদ্র পরিবারটি চাঁপাগ্রাম থেকে প্রায় দু মাইল দূরে পাশের গ্রামের মাঠের ধারে উপস্থিত হল। অদূরে তাদের সামনে পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা একটা মাটির পাহাড়। মাঝে মাঝে কতকটা ফাঁক। রামজয় তাদের বললেন, হাওড়া থেকে পুরী পর্যন্ত রেল চলাচলের রাস্তা তৈরি হচ্ছে। এখনো বাঁধ সম্পূর্ণ হয়নি।

কংসাবতীর উপর সেতু নির্মাণের তোড়জোড় চলছে। বাঁধের নিচে আচট জমির উপর লোহার পাত বসানো হয়েছে। তার উপর দিয়ে লোহা-লক্কড় বোঝাই মালগাড়ি যাচ্ছে। রামজয়বাবু ছাড়া অন্য সকলে জীবনে এই প্রথম রেলগাড়ি দেখে থমকে দাঁড়াল। গাড়ির সামনে গরু নেই, ঘোড়া নেই, মানুষ নেই। তবু গাড়ি চলছে। সামনের গাড়িখানার

চোঙ দিয়ে রাশি রাশি কালো ধোঁয়া আকাশ ছেয়ে ফেলেছে। পিছনের কুড়ি-পঁচিশখানা মালবোঝাই গাড়ি টানা হয়ে চলেছে। এমন তাজ্জব ব্যাপার তারা আর কখনো দেখেনি। অবাক বিস্ময়ে অভিভূত শিবনাথকে ডেকে রামজয় বললেন, ছ্যাখ রে শিবু, ছ্যাখ। ইংরেজ এ দেশে না এলে কি আমরা এমন গাড়ি দেখতে পেতুম? ওরা রাজার জাত। সব করতে পারে। দয়াবতী মহারাণী আমাদের মা। তিনি বিলেতে আছেন। আমাদের মঙ্গলের চিন্তায় তাঁর চোখে ঘুম নেই। আমাদের উপকারের জন্য তিনি কত ভাবেন, কত কি করেন। এই ছ্যাখনা আমাদের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কেমন রেলগাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছেন। ইংরেজরা সত্যিকার মানুষ। তাদের ভাষা না শিখলে কি মানুষ হওয়া যায়? এই জন্যই তো আমি তোকে ইংরেজি পড়িয়ে মানুষ করতে চাই।

তারপর পিছনে তাকিয়ে গাড়ি দেখতে দেখতে তারা নিজেদের বাড়িতে এসে পড়ল।

চার পাঁচ মাসের মধ্যেই যাত্রী নিয়ে গাড়ি চলতে লাগল। তখনও বড় নদীগুলির উপর পোল তৈরি হয়নি। কোম্পানির স্টীমারে যাত্রীরা নদী পার হত। অপর পার থেকে গাড়ি চড়ে যেত। রেল চলার পর আর পায়ে হেঁটে পুরী যেতে হল না। এ অঞ্চলের অসংখ্য মেয়ে পুরুষ তীর্থদর্শনে যাওয়ার জন্য স্টেশনে ভিড় করতে লাগল। গৃহীত ইব কেশেষু মৃত্যুনা, ভেবে হাজার হাজার যাত্রী তীর্থদর্শনের জন্য বাড়িঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। গ্রামে গ্রামে যেন তীর্থ গমনের ঢেউ বয়ে চলল। পুরী থেকে পাণ্ডারা এসে গ্রামে গ্রামে ঘুরে জগন্নাথ দেবের মহিমা কীর্তন করে অজ্ঞ গ্রামবাসীদের প্রলুব্ধ করতে লাগল। চাঁপাগ্রামও পাণ্ডাদের পদস্পর্শে ধন্য হয়েছিল। বামুন ও চাষী-পাড়ার বিস্তর মেয়ে-পুরুষ পাণ্ডাঠাকুরকে সেঁতো ধরে বাবার দর্শন লাভ করে স্বর্গের রাস্তা প্রস্তুত করার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

ভবতারিণী স্বামীকে বললেন, চল না, আমরাও পুরী যাই। পাড়ার কত লোক যাচ্ছে।

—তুমি কি পাগল হয়েছ? অনেক লোক যাচ্ছে বলেই কি আমাদেরও যেতে হবে? ছেলে-মেয়েদের কার কাছে রেখে যাবে? তুমি কি ভাবো, তীর্থে গেলেই পুণ্য হয়? ধর্ম তো মনের কাছে।

—তবে অত লোক ছুটছে কেন ?

—বাতিকে। প্রকৃত ধার্মিককে ছোটাছুটি করে ধর্ম করতে হয়না। দেখলে না আমার শ্বশুরকে ? তিনি তো কত বড়ো বৈষ্ণব ছিলেন। কোন দিন বৃন্দাবন মথুরা হরিদ্বার যাননি। সৎ ভাবে ঈশ্বর চিন্তায় সারা জীবনটা কাটালেন। হরিনাম করতে করতে স্বর্গে চলে গেলেন। আমার বাবাকে তুমি দেখনি। তাঁর মত অত বড় পণ্ডিত ও তান্ত্রিক সাধক দেখা যায় না। কালী নাম করতে করতে তিনি দেহরক্ষা করলেন। এঁরাই সত্যিকারের ধার্মিক। হুজুগে মাতা ধর্ম নয়। রামজয়বাবুর কথা শুনে ভবতারিণী আর কোন কথা বললেন না।

দিন কয়েকের ভিতর গোপালপুর থেকে সংবাদ এল যে শিবনাথের দিদিমা মারা গেছেন। তিনি কাউকে না জানিয়ে পাড়ার তীর্থযাত্রীদের সঙ্গে পুরী যান। ফিরে আসার পথে তাঁর কলেরা হয়। সঙ্গীরা তাঁকে কাঠজুড়ি নদীর তীরে অসহায় অবস্থায় ফেলে পালিয়ে আসে। তারপর তাঁর কি হল কেউ বলতে পারে নি।

বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো এই আকস্মিক দুঃসংবাদ শুনে ভবতারিণী মার জন্য শোকে অস্থির হয়ে পড়লেন। চোখের জলে নাতিনাতনীদের বুক ভেসে গেল। রামজয়বাবু গুম হয়ে বসে রইলেন। তারপর নিজেকে কতকটা সংযত করে নিয়ে বললেন, যারা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে হুজুকে মেতে কাজ করে তাদের পরিণাম এমনি শোচনীয় হয়। আবার যে সব লোক দেবদর্শনের পুণ্য অর্জন করার জন্য তীর্থে যায়, তারা একটি অসহায় বৃদ্ধাকে কুকুর শেয়ালের মুখে দিয়ে নিজেদের প্রাণ বাঁচানর জন্য পালিয়ে এল, এরাই নিজেদের ধার্মিক ভেবে বড়াই করে। এরা মনে করে দেবমন্দির ও বিগ্রহ দর্শন করলে স্বর্গে যাওয়া যায়। মন্দিরের বাইরে যে দেবতা আছেন তারা তা ভুলে যায়। স্বর্গের পথ এত সোজা নয়।

এই ঘটনার তিন মাস পরে ভবতারিণী কুশপুত্তলিকা দাহ করে মার শ্রাদ্ধ করলেন। রামজয়বাবু গোপালপুরে গিয়ে একটি শুদ্ধাচারী বৈষ্ণবকে মিশ্রমশাই-এর রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ দান করে দিলেন এবং জমি-জায়গার ব্যবস্থা ও জমিদারবাড়ির ঠাকুর পূজার বন্দোবস্ত করে এলেন।

চাঁপাগ্রাম থেকে দু মাইল দূরে এম. ই. স্কুলে শিবনাথকে ভর্তি করে দেওয়া

হল। রেল লাইন পার হয়ে যাতায়াত করতে হয়। রোজ স্কুলে যাওয়ার সময় ভবতারিণী বলতেন—বাবা, রেলগাড়ি জ্যান্ত যম, গাড়ি আসছে দেখলে লাইন থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থেকো। গাড়ি চলে গেলে লাইন পার হয়ো।

ভবতারিণী জানতেন শিবনাথ বড়ো ধীর স্থির প্রকৃতির ভীতু ছেলে। শিবনাথ মার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করত। পাঠশালে যাওয়ার সময় কংসাবতীর ধারের রাস্তায় গরু বাঁধা থাকলে সে বাড়ি ফিরে আসত। পাঠশালে যেত না। লাইন পার হওয়ার আগে সে দু দিক তাকিয়ে দেখত। এমন কি দূরে ইঞ্জিনের ধুঁয়ো দেখতে পেলে সে লাইন থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকত। গাড়ি চলে না যাওয়া পর্যন্ত সে লাইন পার হত না। রেলগাড়ি তার কাছে একটা দুর্বোধ্য বস্তু ছিল। গাড়ি কিসে তৈরী, কিভাবে চলে, কোথা থেকে আসে, কেন আসে, কোথা যায়, কেন যায়, অত সরু পাতের উপর দিয়ে অত দ্রুত চলে কেমন করে, পড়ে যায় না কেন ইত্যাদি প্রশ্ন তার কিশোর মনে আলোড়ন জাগাত। সে স্থির দৃষ্টিতে গাড়ি দেখত, ভাবত, বুঝতে পারত না কিছু।

গাঁয়ে কারোর বাড়িতে ঘড়ি ছিল না। ভোর চারটার সময় কংসাবতীর উঁচু পোলের উপর গাড়ি ওঠার শব্দ শুনে রামজয়ের ঘুম ভেঙে যেত। বিছানা থেকে উঠে তিনি যেতেন নদীর দিকে। চরের ওপর শৌচাদি সেরে বাগ্দী খাতকদের কাছ থেকে মাছ নিয়ে সকাল হলে বাড়ি আসতেন। মাছের ওজন এক সের বা দেড় সের হলেও দাম দু পয়সা ছিল। সুদের পয়সা থেকে দাম কাটান হত।

শিবনাথ স্কুলে গেছে। সেদিন হাট থেকে ফিরে আসার পথে রামজয় যে দৃশ্য দেখেছিলেন তা কোনদিন ভুলতে পারেন নি। রেল লাইনের পাশের গ্রামের কয়েকটা ছোট ছেলেমেয়ে রেলের পাতের উপর নুড়ি সাজিয়ে খেলা করতে করতে গাড়ির চাকার তলায় তুলাধুনো হয়ে গিয়েছিল। রক্তের দাগ আর লাইনের আশে পাশে দু-এক টুকরো মাংস ছাড়া তাদের আর কোন চিহ্ন ছিল না। তাদের বাপ-মার কান্না শুনে রামজয়ের বুক ফেটে গিয়েছিল।

শুনে ভবতারিণী বললেন, ঐটুকু ছেলে শিবনাথ। সে দুবেলা লাইন পার হয়ে স্কুলে যাতায়াত করে। কি জানি ভাগ্যে কি আছে। ওকে

আর স্কুলে পাঠানো হবে না। ছেলে আগে বাঁচুক, তারপর ইংরেজী পড়বে।

—ঘরে বসে থেকেই বা করবে কি ?

—কেন, টোলে পড়ুক না। সংস্কৃত বিদ্যা কি বিদ্যা নয় ?

—টোলে সংস্কৃত পড়ে কি হবে ? আজকাল সংস্কৃত অচল।

—আমাদের চোদ্দ পুরুষ সংস্কৃত পড়ে আসছে। টোলে পড়ে পণ্ডিত হবে। বংশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

—গ্রাম থেকে তো এখন সব টোল উঠে গেছে।

—তবে ঘরে মুখ্যু হয়ে বেঁচে থাকুক। আগে প্রাণে বাঁচা, তারপর পড়াশুনা।

—বেঁচে থাকাটাই কি সব ? ঐ ডোবা পুকুরের ধারের বট গাছটা তো একশ বছর বেঁচে আছে। এবার শুকিয়ে ভেঙ্গে পড়বে। তাতে হবে কি ? জ্বালানি কাঠও হবে না।

—আমি মুখ্যু মেয়েছেলে। অতশত বুঝি না। শিবুকে সৌদামিনীর কাছে পাঠিয়ে দিলে কেমন হয় ? ওদের তো ছেলেপুলে হয়নি। তা ছাড়া জামাই তো শিবুকে ছেলের মতো ভালবাসে।

—তা ঠিক। আর এক মাস পরে তো দুর্গাপূজা। ওরা সকলে বাড়ি আসবে। ওদের সঙ্গে যুক্তি করে যা হয় একটা কিছু করা যাবে।

—তাই ভালো। এখন শিবুর স্কুলে যাওয়া বন্ধ থাক।

—তা থাক। আমি কি ভাবছি জান ? এই দু বছরের ভিতর তিনটি স্কুল বদলানো হল। পড়াশুনা কিছু এগোয়নি। এত ঘন ঘন স্কুল বদলালে লেখাপড়া হয় না। এদিকে ওর বয়স বেড়ে যাচ্ছে।

—এমন কি আর বয়স ? শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এই তো এগারো বছরে পা দিয়েছে। এত দিন গেল, না হয় আরও দু-চার মাস যাবে।

এমন সময় শিবনাথ বাড়িতে ঢুকল। তার বগলে ছাতা। হাতে একটা মাঝারি গোছের পুটুলি।

তাকে দেখে ভবতারিণী বললেন, কি রে শিবু! তোর হাতে ওটা কি ?

—কেন, মনসা পূজার ফলফুলারি। এই নাও মা পুটুলিটা আর দক্ষিণার দশটা পয়সা।

ভবতারিণী আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তিনি জানতেন না যে রামজয় তাকে মনসা পূজা করতে যজমান বাড়ি পাঠিয়েছেন। তিনি তাকে বাড়িতে দেখতে না পেয়ে ভেবেছিলেন যে পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে খেলা করতে গেছে। রামজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি শিবুকে মনসা পূজা করতে পাঠিয়েছিলে। ওর পইতে হয়নি। পাপ হবে যে!

—বামুনের ছেলে পইতে না হলেও মনসা পূজা করতে পারে। এমন কি বামুনের মেয়েরাও পারে। কিছু দোষ হয় না।

তারপর শিবনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, মন্ত্র পড়ে পূজা করেছিস্ তো? মন্ত্র মনে আছে? ক' বাড়ির পূজা করেছিস্?

শিবনাথের কাছ থেকে এতগুলি প্রশ্নের উত্তর আসতে না আসতে ভবতারিণী বললেন, হাঁ গো হাঁ। শিবু আমার তেমন ছেলে নয়। ওর সব মন্ত্র মনে আছে। ও একবার যা শোনে তা আর ভোলে না।

তারপর একটু হেসে বললেন, কেমন পণ্ডিত বাপের ছেলে। তুই কি একলা গিয়েছিলি?

শিবনাথ বলল, বারে একলা কেন? দিদি সঙ্গে ছিল।

কেউ না বললেও হেমাঙ্গিনী ছোট ভাইটিকে কোথাও একলা যেতে দিত না। পুটুলি খুলে ফল-ফুলারিগুলি চুপড়িতে ঢালতে ঢালতে বললেন, ফলার খেয়েছিস্ তো?

—আমরা দুজনেই খেয়েছি। দিদি এক বাড়িতে আর আমি আর এক বাড়িতে।

—কি ফলার খেলি? কাঁচা না পাকা?

শিবনাথকে চুপ করে থাকতে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা ফলারে কি কি জিনিস ছিল?

—এই মুড়ি মুড়কি কলা কাঁঠালের কোয়া আর আম আনারস শশা কুচি—

—এর নাম কাঁচা ফলার। লুচি সন্দেশ পাকা ফলার।

তারপর রামজয়ের দিকে হেসে বললেন তোমার ছেলে কত পারঙ্গম হয়েছে দেখ। ফলার খেয়েছে, ছাঁদা বেঁধেছে, দক্ষিণা নিয়েছে। বাপের বেটা বটে!

বামুন বাদল বান
দক্ষিণা পেলে যান।

হেমাঙ্গিনীর ইসারা পেয়ে শিবনাথ চলে গেল।

—এইটুকু দুধের ছেলে। তাকে তুমি রোদে জলে কাদায় ছোটাচ্ছ কেন? অসুখ করবে যে।

—গরীবের ছেলে। খেটে খেতে হবে। রোদে জলে শক্ত হবে।

॥ চার ॥

রামেশ্বর কারিগর ও তার ছেলেকে আসতে দেখে শিবনাথ এবং তার বন্ধুরা বুঝেছিল যে দুর্গাপূজার আর বেশী দেরি নেই। গ্রামে সাত-আটখানি দুর্গা প্রতিমা উঠত। রামেশ্বর বাড়ি বাড়ি ঘুরে পর্যায়ক্রমে প্রতিমা গড়ত। যে দিন যে বাড়িতে কাজ করত, সেদিন সে বাড়িতে থাকত ও খেত।

শশীবাবুর বাড়িতে দুর্গাপূজা। মহালয়ার দিন পাঁচখানি মাল বোঝাই গরুর গাড়ি নিয়ে তিনি বাড়ি এসেছেন। মহকুমা শহরে দেওয়ানী আদালতের উকিলের মুহুরী শশীবাবু। অনেকগুলি জমিদার ঘর বাঁধা ছিল। তারা প্রতি বছর পূজার আগে দেবীর ভোগের জন্য সাত আট মণ আলোচাল এবং ও দেশে দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য তিন চার শ' ঝুনো নারকেল, আখ শশা প্রভৃতি ফল-ফুলারি দিত। ঝুড়ি ঝুড়ি কাঁচা আনাজ, বস্তা বস্তা গোল আলু আর তিন চারটি বলির পাঁঠা পাওয়া যেত।

যুবা বয়সে শশীবাবু ছিলেন দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক। চরিত্রহীন, মাতাল। মদ মাংস ও মেয়ে মানুষ তাঁর উপভোগের প্রিয় বস্তু ছিল। মাতাল অবস্থায় সামান্য কারণে প্রথম পক্ষের গর্ভবতী স্ত্রীর পেটে এমন জোরে লাথি মেরেছিলেন যে সেই আঘাতের দরুন তার মৃত্যু ঘটে। দারোগাকে মোটা আক্কেল সেলামী দিয়ে কোনমতে সে যাত্রা রক্ষা পান। অনুতপ্ত শশিভূষণ কালীর ফুল-বেলপাতা হাতে নিয়ে তর্কালঙ্কারমশাই-এর সামনে প্রতিজ্ঞা করে মদ ছেড়ে

দিয়েছিলেন। তিন বছর পরে তর্কালঙ্কারমশাই-এর অনুরোধে রামজয়-বাবুর বড় মেয়ে সৌদামিনীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। স্ত্রী-পুরুষের ভিতর বয়সের তফাৎ প্রায় ষোল বছর। প্রৌঢ়ত্বের সীমায় উপস্থিত হলেও তাঁর পূর্বের বদ অভ্যাসটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। তবে সৌদামিনী কাছে থাকলে তিনি অনেকটা সংযত থাকতেন।

শশিভূষণের ছোট ভাই শ্যামাচরণ মোক্তারের মুহুরী। মিথ্যা মকদ্দমা সাজানোতে ওস্তাদ ছিল সে। সে দিনকে রাত করতে পারত। তার স্ত্রী মঙ্গলা ডাকসাইটে ঝগড়াটে মেয়ে। গ্রামের কারোকে গ্রাহ্য করত না। কর্কশ বাক্য ও কাঠখোট্টা চেহারার জন্য পাড়ার ছেলেরা তাকে বৃষকাঠ বলত।

শশীবাবু জ্ঞাতিদের সঙ্গে পালাক্রমে পূজা করতেন। নবমী পূজার পালা থাকলেও পূজার কয়েকদিন তাঁর বাড়ি লোকজনের আনাগোনায় গম গম করত। ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যায় পুরোহিত ঢাকি এবং আত্মীয় স্বজন আসতে শুরু করত। বাড়ি মুখর ও কর্মচঞ্চল। খেজুর পাটিতে বস্তা বস্তা খৈ ঢেলে আখের গুড়ের মুড়কি মাখা হত। চালনাড়ু খৈনাড়ু তিলনাড়ু এবং সকলের চেয়ে উপাদেয় নারকেল নাড়ু তৈরি হত। হাঁড়ি হাঁড়ি ভাত ডাল, কড়াভর্তি তরকারি রান্না হত। দুবেলা চল্লিশ পঞ্চাশ জন লোকের পাত পড়ত।

সৌদামিনীর নিশ্বাস ফেলার সময় থাকত না। ভাঁড়ার থেকে রান্না ঘর, রান্নাঘর থেকে ঢেঁকশাল, ঢেঁকশাল থেকে ঠাকুর দালান ঘুরে কাজের তদারক করতেন। ছোট বউ মঙ্গলা তো পান দোক্তা নিয়ে ব্যস্ত। ঠাকুর বাড়ির উঠনে সত্যবাউল গেরুয়া রঙের আলখাল্লা এবং পায়ে ঘুঙুর পরে নেচে নেচে একতারায় আগমনী গান ধরত—

কেমন করে হরের ঘরে ছিলি উমা বল মা তাই।

শশীবাবুর প্রজাপাঠক ও জ্ঞাতিরা বসে গান শুনত, তামাক টানত, তাদের ভিতর কেউ কেউ তাঁর গ্রাস থেকে প্রসাদ পেত। সপ্তমীর দিন সকালে ঘট ডোবানোর আগে শশীবাবু মস্ত একটা কাপড়ের গাঁট খুলে চাকর-বাকর, রাঁধুনী-ভাজুনী, ধোপা-নাপিতকে নতুন কাপড় দিতেন। সপ্তমী অষ্টমী ও নবমীর দিন বিকেল থেকে রাত্রি পর্যন্ত চণ্ডীর গান চলত। তিন চারজন লোক মন্দিরা বাজিয়ে চামর দুলিয়ে দুম

ডুম নাচত। স্নানের সময় তারা পুকুরের পানা তুলে দিত। পেলা বাদে তাদের পারিশ্রমিক আড়াই টাকা। নবমী পূজার সময় শশীবাবু তিনটি পাঁঠা স্বহস্তে বলি দিয়ে রক্তাক্ত খড়্গ হস্তে ঢাকের ড্যাং ড্যাং বাদ্যের তালে তালে উদ্দাম নৃত্য করতেন। বিকেলে বহু নিমন্ত্রিত ভদ্রলোক শশীবাবুর বাড়িতে আসতেন।

এ বছর বৃদ্ধ মোক্তার আমেদ সাহেব এবং কয়েকজন মুসলমান মক্কেলও উপস্থিত হয়েছেন। তারা পাত পেতে বসে প্রসাদ গ্রহণ করছে। শিবনাথ তাদের পরিবেশন করছে। তার সুন্দর ফুটফুটে চেহারা আমেদ সাহেবের দৃষ্টি এড়ায় নি। স্কুলের অসুবিধার জন্য তার পড়াশুনা বন্ধ আছে শুনে বললেন—শশি, তোমার সম্বন্ধীকে দেখে মনে হয় সে বেশ বুদ্ধিমান ছেলে। তুমি ওকে তোমার বাসায় রেখে এনট্রান্স স্কুলে ভর্তি করে দাও। আমি ওর স্কুলের বেতন দেব। যাওয়ার সময় শিবনাথকে ডেকে বললেন—খোকা, পূজার বন্ধের পর দিদির সঙ্গে বাসায় চলে যেও। শিবনাথ মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল।

সেদিন সন্ধ্যার পর তিন মণ চালের অন্নভোগ দেওয়া হল। ভোগ সাজালেন রামজয়বাবু। বড় কঠিন কাজ এই ভোগ সাজানো। ভাতের প্রকাণ্ড স্তূপ অখণ্ড কলাপাতের উপর স্তরে স্তরে সাজানো হয়েছে। তার পাশে খিচুড়ি, গামলা গামলা ডাল, থালা থালা ভাজা, হাঁড়ি হাঁড়ি দৈ, নানা রকমের তরকারি ও মাছের ঝোলের গামলা, ঝোড়া ঝোড়া মুড়কি ও নাড়ু ইত্যাদি দেবীকে নিবেদন করার পর আরতি হল। চার পাঁচ শ' রবাহূত ও অনাহূত লোক প্রসাদ পেয়ে নিজেদের ধন্য মনে করল। অনেক রাত্রি পর্যন্ত প্রসাদ বিতরণ করা হল।

দশমীর দিন বিকেলে বংশের প্রাচীনতা ও সম্মানের পারম্পর্য অনুসারে গ্রামের প্রতিমাগুলিকে ঢাক-ঢোলের বাদ্যের সঙ্গে শোভাযাত্রা করে কংসাবতীর জলে নিরঞ্জন করার পর পরস্পরের ভিতর কোলাকুলি আলিঙ্গন অভিবাদন ও প্রণামের ধুম পড়ে গেল। সকল বাড়ির কর্তারা ও ছেলে-ছোকরারা গ্রামের মাঝখানে খোলা জায়গায় বসে ঢাক বাজানোর কসরৎ উপভোগ করলেন। বনমালী ঢাকি হাতের কৌশলে ঢাকে ও তবলায় বোল তুলে কাপড় গামছা পুরস্কার পেল।

শশীবাবু পূজক ব্রাহ্মণকে আড়াই টাকা, রাঁধুনী বামুনকে দু টাকা এবং

ঢাকিকে একটাকা নগদ মজুরি এবং মুড়ি মুড়কি নাড়ু দিয়ে বিদায় দিলেন। রামেশ্বর কারিগর প্রতিমার আকার এবং গঠন কৌশলের তারতম্য অনুসারে চার টাকা থেকে সাত টাকা পর্যন্ত মজুরি এবং পূজার প্রসাদ নিয়ে বাড়ি গেল।

এই ভাবে বৎসরান্তে চার দিন গ্রামের নিস্তরঙ্গ নির্জীব জীবনে আনন্দের ঢেউ উঠত। এ অঞ্চলে আর কোন গ্রামে এতগুলি দুর্গা প্রতিমা পূজা হত না। গ্রামান্তর থেকে প্রৌঢ়া গিন্নীরা বউ-ঝিকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রতিমা দেখাত। সধবারা নতুন চওড়া পাছাপেড়ে শাড়ি আর বিধবারা থান কাপড় পরে আসত। লজ্জায় আড়ষ্ট বউরা এক হাত ঘোমটা তুলে প্রতিমা দেখত। চুলের তেলে তাদের মাথার কাপড় ভিজে যেত। তাদের হাতে গোছা গোছা রূপার চুড়ি ও বাউটি, পায়ে রূপার মল, আঙ্গুলে আঙ্গট এবং কোমরে রূপার সাতনরী চন্দ্রহার ঝুলত।

দুর্গাপূজার পর অমাবস্যার দিন রাত্রে কালীপূজা হত। কালীর কাছে পাঁঠা মানত করার পর রামজয়বাবুর চুয়াল্লিশ বছর বয়সে শিবনাথের জন্ম হয়েছিল। তিনি প্রতি বৎসর কালীকে পাঁঠা দিয়ে পূজা দিতেন। বলির পাঁঠার জাত ছিল। বামুনদের কালীর কাছে অন্য জাতের লোক পাঁঠা বলি দিতে পারত না। তবে মদ খাওয়ার সময় জাত বিচার ছিল না। গ্রামের বামুন-শূদ্র মদ খেয়ে বাটি বাজিয়ে এক সঙ্গে উদ্দাম নৃত্য করত। তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মাতালদের ভিতর কথা কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি পর্যন্ত হয়ে যেত। কোন মাতাল ভক্তির উচ্ছ্বাসে কালীতলায় রক্তাক্ত মাটির উপর গড়াগড়ি দিত। কেউ খর্পরের কাঁচা রক্ত পান করত। কেউ অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকত। কোন মাতাল বলির পাঁঠা বাড়ি নিয়ে যেতে যেতে পথের পাশে কাঁটা বনে পড়ে অঘোরে ঘুমোত। শেয়াল কুকুর তার পাঁঠার সদ্ব্যবহার করত। শ্যামাচরণ পেঁতি মাতাল ছিল। এক গ্লাস মদ পেটে পড়লে সে দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে শত্রুমিত্র সকলকে অকথ্য ভাষায় গালি-গালাজ করত। শশীবাবু গভীর জলের মাছ ছিলেন। বোতলের পর বোতল কাবার করেও তিনি স্থির থাকতেন। সারারাত্রি মাতালদের চেঁচামেচি গোলমাল চিৎকার হট্টগোলে পার্শ্ববর্তী দু-তিনখানি গ্রামের লোকের ঘুম ভেঙ্গে যেত।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরদিন কাছারি খুলেছে। শশীবাবু একা বাসায় চলে গেছেন। মাসখানেক পরে সৌদামিনী শিবনাথকে নিয়ে রওনা হলেন।

ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে দিনের বেলা গরুর গাড়িতে যাওয়া স্থির হয়েছে। সকাল আটটায় সময় তারা খেয়েদেয়ে গ্রাম থেকে প্রায় আধ মাইল দূরে জেলা বোর্ডের বড় রাস্তায় গাড়িতে উঠল। গ্রামের প্রান্তসীমা পর্যন্ত ভবতারিণী তাদের সঙ্গে গেলেন। এ পর্যন্ত তিনি শিবনাথকে কোন দিন কাছ ছাড়া করেননি। তিনি বার বার আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন। শিবনাথের চোখ ছল ছল করছিল। সে তার বড়দিদির কাছে থাকবে, বড়দিদি তো তার মায়ের মতো, একাধারে মা-বোনের আদর যত্ন পাবে। আর ছেলেকে লেখাপড়া শেখাতে হলে তাকে আঁচলে বেঁধে রাখলে চলবে না। বিদেশে না পাঠালে মানুষ হবে কি করে? জামাই তো শিবনাথকে ছেলের মতো ভালবাসে; তাঁর শিবু বড়ো ইস্কুলে ইংরেজী পড়বে, মানুষ হয়ে বংশের গৌরব বৃদ্ধি করবে, তাঁদের দুঃখ কষ্ট ঘুচে যাবে, ইত্যাদি নানা কথা ভেবে তাঁর মাতৃহৃদয় কিছু সান্ত্বনা পেল। তাদের গাড়িতে ওঠার সময় পর্যন্ত তিনি মাঠের ধারে দাঁড়িয়ে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। রামজয়বাবু বাড়িতে ছিলেন। শিবনাথের স্কুলে ভর্তির সময় তিনি বাসায় যাবেন স্থির হয়েছিল।

মহকুমা শহরে যাওয়ার জেলা বোর্ডের ষোল মাইল লম্বা পাকা রাস্তা। বহুকাল মেরামত পর্যন্ত হয়নি। মাঝে মাঝে গর্ত। মাল বোঝাই গরুর গাড়ির চাকার ঘর্ষণে রাস্তার বুক উঁচু। দুপাশ লম্বা নালার মতো নিচু। রাস্তার দুধারে ডাইনে বাঁয়ে বড়ো বড়ো গাছের সারি স্তম্ভের মতো ধীর-স্থির দাঁড়িয়ে আছে। ছায়া শীতল চোখজুড়ানো সবুজ পত্রপল্লবের সমারোহ। গাড়ি ঢিমে তেতালা চালে এগিয়ে চলেছে। গাড়িতে উঠলে সৌদামিনীর গা বমি বমি করত। তিনি শুয়ে পড়লেন। শিবনাথ চুপ করে বসে উবড়ো-থুবড়ো আঁকা-বাঁকা রাস্তার দিকে চেয়ে রইল। না-দেখা পাখির একটানা সুর দূরত্বের আভাস দিচ্ছে। সামনে এগিয়ে যাওয়ায় আনন্দে আর গতির রোমাঞ্চে তার কিশোর মন অভিভূত। মাঝে মাঝে ধান খড় বাঁশ গুড় আর মানুষ বোঝাই গাড়ি তাদের পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। দু-চার জন লোক গম্ভীর ভাবে কি যেন আলোচনা করতে করতে থেলো হুঁকায় তামাক টানতে টানতে ধীরে ধীরে পথ হাঁটছে। তারা বোধ হয় মামলা করতে মহকুমা শহরে যাচ্ছে। যখন তখন দু একখানা সাইকেল কিড়িং কিড়িং শব্দে ঘণ্টা দিতে দিতে গাড়ির পাশ দিয়ে

বোঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। যেন কালো পাথরে কোঁদা সাঁওতাল মেয়ের দল সমস্বরে গান গাইতে গাইতে চলেছে। তাদের মাথায় বেতের ঝুড়ি, খোঁপায় লাল ফুল, গলায় আকন্দ কুঁড়ির মালা। দু-এক মাইল অন্তর রাস্তার ধারে হাট বাজার গঞ্জ। মাঝে মাঝে রাস্তা জনশূন্য। কখনো প্রান্তরের ভিতর দিয়ে, কখনো ধানখেতের পাশ দিয়ে, কখনো বসতিপূর্ণ গ্রামের প্রান্ত দিয়ে রাস্তাটা সাপের মতো এঁকে বেঁকে কোথায় চলে গেছে। গরুর গাড়ির একঘেয়ে মন্থর গতির তুলনায় রাস্তা অফুরন্ত মনে হল শিবনাথের।

সন্ধ্যার সময় গাড়ি এসে থামল শহরের মধ্যস্থলে একটা সরু গলির মোড়ে। কয়েকজন মেয়ে পুরুষ আনাগোনা করছে একটি প্রকাণ্ড দীঘির ঘাটে। ঘাটের ধারে কাঠের খুঁটিতে ঝোলানো মিউনিসিপ্যালিটির কেরোসিনের আলো টিম টিম করে জ্বলছে।

দীঘির পশ্চিম পাশে খড়ে ছাওয়া মাটির দেওয়ালের বাসাবাড়ি। একখানি শশীবাবুর শোয়ার ঘর। দিনের বেলাতেও আলো নিয়ে ঢুকতে হয়। পিছনে একটা ছিটেবেড়ার ছোট ঘরে শ্যামাচরণ থাকত। তার এক দিকে রান্নাশালা। আর একদিকে ইটের ওপর তক্তা পাতা খাটা পায়খানা। শিবনাথ শ্যামাচরণের সঙ্গে এক বিছানায় শুত। তার নাকের বিকট শব্দ আর শ্বাস-প্রশ্বাসে মদের গন্ধ শিবনাথের ঘুমের ব্যাঘাত জন্মাতে পারত না।

জানুয়ারী মাস। শিবনাথকে বড় স্কুলে ভর্তি করার জন্য তাকে নিয়ে রামজয়বাবু গেলেন হেড্‌মাস্টারমশাই-এর আফিস ঘরে। হেড্‌মাস্টার জ্যোতিষবাবু একটা বড় টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে ছিলেন। টেবিলের উপর মোটা বাঁধানো ছেলেভর্তির খাতা, দোয়াত ও কলম। মাস্টার মশাই-এর বয়স চল্লিশের বেশী নয়। বয়সের তুলনায় একটু বেশী গম্ভীর। নাকের উপর সোনার ফ্রেমের চশমা। পরণে কোট ও পায়জামা। গোঁফ-দাড়িজোড়া মুখ। রাসভারী লোক। স্কুলের প্রকাণ্ড বাড়ি আর হেড্‌মাস্টারের গুরুগম্ভীর মূর্তি দেখে শিবনাথ ভড়কে গেল। তাঁর কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না। সে সকলের নিচের ক্লাসে ভর্তি হল। চলে আসার সময় শিবনাথ ভেবেছিল বড় হলে সে এম.এ. পাশ করে জ্যোতিষবাবুর মতো একটা বড় স্কুলের হেড্‌মাস্টার হবে।

পর বৎসর পূজার পর বৈষয়িক কাজকর্মের জন্য সৌদামিনী তিন চার মাস বাড়িতে থেকে গেলেন। বাসায় একজন ঠাকুর ও চাকর ছিল।

শশিভূষণের শোয়ার ঘরে সিকে পাঁচেক দামের একটি ছোট কেরোসিন কাঠের পুরনো আলমারি ছিল। তাতে শিবনাথ দু-চারখানি পড়ার বই, দোয়াত কলম ও খাতা সাজিয়ে রাখত। একদিন সন্ধ্যার সময় শিবনাথ আলমারির পাল্লা খুলে বই বের করতে গেছে এমন সময় একটা দিকের মরচে পড়া কব্জা খুলে গিয়ে পাল্লাটি ঠক্ করে মাটিতে পড়ে গেল। শব্দ শুনে শ্যামাচরণ কোথা থেকে দৌড়ে এসে চিৎকার করে উঠল—হায়, হায়, আমার অমন নতুন দামী আলমারিটা ভেঙ্গে ফেললি! দেখ, দাদা, তোমার পেয়ারের শিবু কি অনর্থ ঘটিয়েছে। বাইরের দাওয়ায় বসে মদ খেতে খেতে শশিভূষণ মকদ্দমার কাগজপত্র দেখছিলেন। চিৎকার শুনে তিনি হট করে ঘরে ঢুকে পায়ের এক পাটি চটি খুলে শিবনাথের পিঠের উপর পটাপট মারতে লাগলেন। তারপর অজস্র কিল ঘুষি লাথি বর্ষিত হল। শিবনাথ মেজের উপর উপুড় হয়ে পড়ে গোঁ গোঁ শব্দ করতে লাগল। অকথ্য ভাষায় গালাগালি চলতে লাগল। শশিভূষণ ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। পরদিন সকালে শিবনাথের সর্বাঙ্গে পাকা ফোঁড়ার মতো ভীষণ ব্যথা হয়ে গেল। সেদিন শিবনাথ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিল, বড় হয়ে টাকা রোজগার করে সে প্রথমেই একটা আলমারি কিনবে আর মোটা পুরু বই কিনে তাতে সাজিয়ে রাখবে। পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় সেদিনের কথা সে কাউকে বলেনি।

॥ পাঁচ ॥

বৈশাখ মাস। স্কুলে গ্রীষ্মের ছুটি হয়ে গেছে। শিবনাথ দেশে এসেছে। তার পইতে দেওয়া হয়েছে। জ্যৈষ্ঠের প্রথম দিকে বনভোজন। চারিদিকে সাড়া পড়ে গেছে। ঘোষালবুড়ী বাড়ি বাড়ি ঘুরে সকলের মত নিয়ে দিন স্থির করেছেন।

নির্দিষ্ট দিনে সকল শ্রেণীর, সকল বয়সের, সকল সম্পর্কের মেয়েরা এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে প্রস্তুত হয়েছে। সংসারের কাজকর্ম সেরে দুপুরের কাঠফাটা রোদ মাথায় করে তারা বেরিয়ে পড়েছে। তাদের হাতে চিড়ে মুড়ি মুড়কির ছোট বড় মাঝারি ধরনের পুঁটুলি। ঘরে পাতা

দইএর ছাবা, গুড়ের ভাঁড়, আম কাঁঠাল জাম খেজুর প্রভৃতি ফলফুলারীর চুপড়ি, জল খাবার ঘটি, পাথরের থালা, শঙ্খ আর বঁটি। সেদিন প্রৌঢ়া গম্ভীর প্রকৃতির গিন্নীরা কলহাস্যময়ী। ঝিউড়ীরা আনন্দমুখরা। লজ্জাবতী বধূরা অবগুণ্ঠনমুক্তা। বছরের এই একটি দিনে শাশুড়ী-বউ, ননদ-ভাজ, মা-মেয়ে, ভাই-বোন অচলায়তন গ্রাম্য সমাজের কৃত্রিম বন্ধনের নাগপাশ মুক্ত। সঙ্কোচের বাধা নেই। আব্রুর বালাই নেই। লজ্জার কারণ নেই। অন্ততঃ এই একটি দিনের জন্য তারা স্বাধীন, মুক্ত, কতকটা যেন বেপরোয়া।

এক এক বাড়ির মেয়েরা এক একটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে চরের সবুজ তৃণ আস্তরণের এক এক অংশে বসে দ্রব্যসম্ভার সাজিয়েছে। মাটিতে মনসা ডাল পুতে দিয়েছে। পাথরের থালায় ফলের কুচি আর চিড়ে মুড়ি মুড়কির সঙ্গে দৈ মেখে নৈবেদ্য প্রস্তুত করেছে। বেলা পড়ে এসেছে। ক্লান্ত অপরাহ্ণের তপ্ত নিশ্বাস নদীর ওপারে দেবদারুর ঘন পত্রপল্লবের কম্পন তুলে, তীরের বেণুকুঞ্জের ভিতর দিয়ে, দূরপ্রসারী কাশ বনে হিল্লোল জাগিয়ে শন্ শন্ শব্দে বয়ে চলেছে। মাথার উপর মেঘমুক্ত নীল আকাশ। সম্মুখে শীর্ণ তোয়া কংসাবতীর মৃদুমন্দ স্বচ্ছ স্রোত। গ্রাম্য প্রকৃতির সুন্দর পরিবেশে যেন চাঁদের হাট বসে গেছে।

শিবনাথের মতো যে সব ছেলের পইতে হয়েছিল, তারা ঘুরে ঘুরে শঙ্খধ্বনির ভিতর মনসা ডালে ফুলচন্দন সিঁদুর দিয়ে, হলুদ জল ছিটিয়ে পূজা করল। নৈবেদ্য নিবেদন করল। মা-বোনদের আদর যত্ন আর বউদিদের কোমল নয়নের কটাক্ষ দৃষ্টি আর রসিকতার ভিতর তারা হাত পেতে ফলমূল নিতে লাগল। তারপর সারাদিন অভুক্ত থাকার পর মেয়েরা প্রসাদ খেতে বসল। সুরসিকা ঘোষালবুড়ী নাত-বউদের সামনে নেচে নেচে গান জুড়ে দিলেন—

মোর কথা শুন লো মালিনী।
এতেক বিলম্ব আজু কেনি ॥
বিধাতা করিল একাকিনী।
কি করিব আমি অভাগিনী ॥
আছয়ে মালঞ্চ অতি দূরে।
আনিতে বিধাতা বেলা করে ॥

বুড়ীর নাচ ও রঙ্গ দেখে নাত-বউরা হাসিতে ফেটে পড়ল, মেয়েরা আঁচল দিয়ে মুখ ঢাকল, গিন্নীরা ছেলে-মেয়েদের কাছে অপ্রতিভ হয়ে গেল।

বনভোজন শেষ হয়েছে দেখে বুড়ী আবার গান ধরল—

ফুরিয়েছে জীবনের ছুটি
ফিরিয়ে দে তোর নয়ন দুটি।
নাম ধরে আর ডাকিস্ নে ভাই
যেতে হবে ত্বরা করে।
আমার যাবার সময় হল
আমায় কেন রাখিস্ ধরে
চোখের জলের বাঁধন দিয়ে
বাঁধিস্‌নে আর মায়া ডোরে।

মনসা ডাল ও পূজার ফুল নদীর স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে বাসন-কোসন মেজে-ধুয়ে বউরা জলে গা ডুবিয়ে বসল। শিবনাথ সঙ্গীদের নিয়ে বালুচরের উপর হা-ডু-ডু খেলতে লাগল। তারপর সাদা কাশগুচ্ছ নিয়ে দৌড়ে গিয়ে আকণ্ঠনিমজ্জিত বউদিদের খোঁপায় গুঁজে হাততালি দিয়ে তাদের রসিকতার প্রতিশোধ নিল।

পশ্চিম দিগন্ত অস্তগামী সূর্যের আলোকছটায় অপূর্ব রূপ ধারণ করেছে। মেয়েরা জল থেকে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে সারিবদ্ধ হয়ে শাঁখ বাজাতে বাজাতে ভিজে কাপড়ে গৃহে ফিরে গেল।

॥ ছয় ॥

বছর কয়েক কেটে গেছে। শিবনাথ এখন ক্লাসের একজন ভালো ছেলে। দ্বিতীয় হয়ে সে সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছে। বাবার চিঠি পেয়ে বাড়ি এসে সে শুনল তার বিয়ের পাত্রী ও দিন স্থির হয়েছে। সতেরো বছর বয়সে ছেলের বিয়ে দেওয়া সেকালে গর্হিত কাজ ছিল না। তার সমবয়সী গ্রামের প্রায় সকল ছেলের বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলের মাথায় এক ঘটি জল ঢালতে পারলে রামজয়বাবু নিশ্চিন্ত হতে পারেন। বয়স হয়েছে তাঁর। কি জানি কখন কি হয়। ছেলেটার একটা হিল্লে করে দেওয়া ভালো।

প্রথম ফাল্গুনের একটি নির্মল শান্ত উষায় বরণ প্রভৃতি মাঙ্গলিক কার্যের পর উলু ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে বাদ্যের কলরোলের ভিতর শিবনাথ আর তার ছোট ভাই রামনাথ কপালে চন্দনের ফোঁটা আর চেলির জোড় পরে বর ও নিতবর সেজে পালকিতে বসল। তিরিশ চল্লিশ জন বাজন্দার, কুড়ি পঁচিশ জন বরযাত্রী, কয়েক জন চাকর-বাকর বরের পালকির সঙ্গে শোভাযাত্র করে চলতে সুরু করল। কনের বাড়ি আঠারো মাইল দূর।

মাইলের পর মাইল রাস্তা চলে লোকজন ক্লান্ত। বাদ্য যন্ত্রগুলি বাজন্দারদের কাঁধে উঠেছে। বেহারারা ঘন ঘন কাঁধ বদলাচ্ছে। মাঝে মাঝে পালকি নামিয়ে দম নিচ্ছে। তামাক খাচ্ছে। লোকালয়ের কাছে এসে বাদ্যযন্ত্রগুলি বেজে ওঠে। নিঝুম গ্রাম মুখর হয়। ঘোমটা টানা কুলবধূ জলকে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ায়। আড় চোখে বর দেখে। মুনিষরা ধান ঝাড়া থামিয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকায়। পথের ধারে শীর্ণ হাড় জিরজিরে গরুবাছুরগুলো উদাস নয়নে চেয়ে থাকে।

পালকির খোলা দরজার ভিতর দিয়ে প্রথম ফাল্গুনের মিষ্টি হাওয়া শিবনাথের গায়ে লাগছে। তার কিশোর হৃদয় কি যেন একটা অজানা আনন্দে কানায় কানায় ভরে উঠেছে। ম্যালেরিয়া বিধ্বস্ত গাঁয়ের পর গাঁয়ের ভিতর দিয়ে সরু বাঁকা পথ ধরে বরযাত্রীর দল চলেছে। কোথাও ধুতরা গাছের জঙ্গলভরা উঁচু ভিটা। সবুজ পানায় ঢাকা পচা পুকুর। ভাঙ্গা ঘাট। মজা শুকনো দীঘি। কোথাও মাটির ঘরের কাঁথড়ার উপর একটা সাদা বিড়াল গম্ভীর হয়ে বসে আছে। কোথাও নোনাধরা ভাঙ্গা দালানের হাঁ-করা দরজা জানালার ফাঁকগুলো যেন গিলতে আসছে। কোথাও ঝুরিনামা বহু কালের প্রাচীন বটের শাখা-প্রশাখা অজস্র নতুন পল্লবে শ্যামায়মান। কোথাও আবার আম্রমুকুলের সুগন্ধভরা বাগান। এখানে ওখানে দু একটা অস্থি-চর্ম-সার ছাড়া-গরু তৃণশস্য-শূন্য মাটি কামড়াচ্ছে।

দোকান-পসারী শূন্য হাটের ওপর দিয়ে, রথতলা বাঁয়ে রেখে, খড়ের গাদার পাশ কাটিয়ে পালকি ও বরযাত্রীর দল আসে একটা ছোট নদীর উঁচু বাঁধের ওপর। নদীর জলে স্নান করে, মুড়ি মুড়কি নাড়ু প্রভৃতি খেয়ে তারা কিছুক্ষণ জিরিয়ে নিল। সেখান থেকে কনের বাড়ি বেশি দূর নয়। প্রায় মাইল তিনেক।

সন্ধ্যার সময় শোভাষাত্রা কনের গ্রামে ঢোকে। বাজনা বাজে। মশাল

জলে। পালকি চলে। গাঁয়ের হাড়-জিরজিরে ছেলে ছোটে। অবশেষে শঙ্খ ও উলুধ্বনির ভিতর পালকি থামে। কনের বাবা বরের হাত ধরে পালকি থেকে নামিয়ে বরকে ফরাশের উপর বসালেন। বরযাত্রীরা গল্পগুজব করে। শ্যামাচরণ আনমনা।

রাত্রি দশটার পর বিয়ের লগ্ন। ছাতনা তলায় যাওয়ার জন্য বর পালকিতে উঠেছে। চারদিকে মশাল জ্বলে উঠেছে। বাজনা বেজে উঠেছে। বোমের ভীষণ শব্দ হচ্ছে। এমন সময় শ্যামাচরণ আর দু তিন জন বরযাত্রী কোথা থেকে দৌড়ে এসে পালকি ধরে টানাটানি করতে লাগল। চিৎকার করে বললে, পালকি থামাও। শিবু বেরিয়ে আয় পালকি থেকে। ওখানে বিয়ে হবে না। শ্যামাচরণের রুদ্রমূর্তি দেখে শিবু ভয় পেল, কিছু বুঝতে না পেরে রামজয়বাবু এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে, শ্যামা? পালকি থামালে কেন? শ্যামা ও তার সঙ্গীদের মুখে মদের গন্ধ। সে উত্তেজিত হয়ে বললে, কি আর হবে! হতে আর কি বাকি? যা হয়েছে শুনে কাজ নেই। ওখানে বিয়ে দেওয়া চলবে না।

রামজয় বললে, বিয়ে কি একটা ছেলেখেলা? হবে বললে হবে, আর হবে না বললেই হবে না?

—আপনার বেয়াই আমাদের অপমান করেছে।

—অপমানটা কি শুনি?

—শুনে কাজ নেই। বিয়ে দেওয়া চলবে না।

—চলবে না বললেই হল? বিয়ে দেওয়া না দেওয়ার কর্তা কি তুমি?

—হাঁ, আমি কর্তা বই কি? ছেলে আমাদের বাড়ির ভাত খেয়ে মানুষ আর তার বিয়ে দেওয়ার সময় আমরা কেউ নই? আমার কথা না শুনলে আমরা এক্ষুনি চলে যাব। দেখি, আপনি কি করে ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে দেশে ঢোকেন। আমরা একটি সুন্দরী কনে যোগাড় করেছি। তার বাপ নগদ এক হাজার টাকা দেবে। এই লগ্নেই বিয়ে হবে। ওঠাও পালকি।

রামজয় দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, তা কিছুতেই হবে না। এখানেই বিয়ে হবে। যার অসুবিধা হয় চলে যেতে পারে।

শ্যামাচরণ গর্জে উঠল, বাঁড়ুয্যে বংশের এতো অপমান। চক্কোত্তি বামুন বড় বাড় বেড়েছে। চল রে চল। এ বিয়েতে কোন ভদ্রলোক

থাকে ? বরযাত্রীরা বরহুড়মুড় করে বেরিয়ে পড়ল। শশীবাবুর অবস্থা ন যযৌ ন তস্থৌ। শেষে তিনিও উঠে পড়লেন। পা ঘষতে লাগলেন।

বর উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে শুনে কনের বাড়ির মেয়েমহলে একটা সোরগোল পড়ে গেছে। অঘোরবালা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছেন। তাঁর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। আট বছরের কনে শিবানী মায়ের কাছে ছুটে এসে বলছে, মা, আমার বর চলে যাচ্ছে। বাবাকে বল না তাকে ফিরিয়ে আনতে। আমি ঐ বরকেই বিয়ে করব। বেশ স্বন্দর বর। তার কথা শুনে দুঃখের ভিতর সকলে হাসতে লাগল।

গোলমাল শুনে ইতিপূর্বেই রামচরণবাবু বরের বাসায় উপস্থিত হয়ে দেখলেন বরযাত্রীরা সকলে চলে গেছে। রামজয়বাবু তাঁকে বললেন, আপনি চিন্তিত হবেন না, বেয়াই মশায়। প্রস্তুত থাকুন। আমি বর নিয়ে যাচ্ছি। শেষ লগ্নে বিয়ে হবে। রামচরণবাবু তাঁর পায়ের ধুলো নিয়ে ফিরে গেলেন।

রামজয়বাবু ছেলের বিয়ে দিয়ে স্বন্দরী বউ, অত গহনা দানশয্যা আর নগদ টাকা বরপণ পাবেন, তা শ্যামাচরণের সহ্য হচ্ছিল না। এজন্য সে একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে এক হাজার টাকার লোভ দেখিয়ে একটা কুশ্রী কালো মেয়ে ঠিক করেছিল। অনেক কাল পরে দেশে ফিরে এসে রামচরণ বাবু ধুমধাম করে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন দেখে এক জ্ঞাতি শত্রুর গাত্রদাহ হয়েছিল। নগদ এক হাজার টাকার বরপণ দিয়ে নিজের কালো মেয়েটার বিয়ে দিয়ে রামচরণবাবুর উপর টেক্কা দিতে চেয়েছিল। এজন্য সে গোপনে শ্যামাচরণকে মদ খাইয়ে এবং তার সঙ্গীদের কিছু টাকা ঘুষ দিয়ে হাত করে নিয়েছিল।

শেষ লগ্নে কন্যা সম্প্রদান হতে রাত্রি চারটা বেজে গেল। বর-কনে বাসর ঘরে উঠে গেছে। তখন ভোর হয়ে গেছে। শিবানী বিছানার এক পাশে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে শিবনাথ নামমাত্র কিছু জলখাবার খেয়ে বিছানার আর এক কোণে শুয়ে পড়েছে। তখনও পাড়ার জনকয়েক বাঘিনী বাসর জাগার জন্য ওত পেতে বসেছিল।

বড় ভাশুরের মেয়ে চারুশীলাকে অঘোরবালা বললেন, ত্যাখ্, চারী, ওদের জাগাস নে। ভোর হয়ে গেছে। ওদের একটু ঘুমোতে দে। চারুশীলা ঠোঁট ফুলিয়ে ব্যঙ্গ করে বললে—কি জামাই করলে, কাকীমা? আমাদের দেখে ভয়ে বউ-এর আঁচলে মুখ লুকিয়েছে।

—ভয়ে নয় রে। তোদের মতো পেত্নীদের রূপ দেখে ঘেন্নায় চোখ বুজে আছে।

—আহা, কি কার্তিক জামাই না করেছ, কাকীমা ?

—যা তা কার্তিক নয় রে, সোনার কার্তিক। আমাদের গাঁয়ে কোন্ লোকটা এমন জামাই এনেছে বল না। দ্যাখ্না, কেমন কাঁচা সোনার মতো রঙ আর চাঁদপানা মুখ।

—গয়লা কি নিজের দৈ-কে টক বলে ? তোমার পায়ে পড়ি। তুমি একটি বার নিচে যাওনা, কাকীমা। তোমার সোনার কার্তিকের কি অবস্থা করি দেখে নিও।

—লক্ষ্মী মা আমার, এখন যা। ওর ঘুম ভাঙ্গাস নে। সারারাত জেগে বাছা আমার ঘুমিয়ে পড়েছে। সূয্যি ওঠার আগে ওকে বাসায় ফিরে যেতে হবে।

চারু কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করে সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে দুম দুম করে চলে যাওয়ার সময় বলে গেল—আচ্ছা, তুমি কতক্ষণ তোমার খোকা জামাইটিকে আগ্লে রাখ দেখব। আকাঠা স্নানের সময় তোমার বাছার কি দুর্দশা করি দেখে নিও।

তারা চলে গেল। অঘোরবালা বিছানার পাশে বসে মেয়ে-জামাইকে দেখতে দেখতে আপনমনে বলতে লাগলেন, মেয়েকে পেটে ধরে ছেলে পেয়েছি। তারপর ঘুমন্ত শিবানীকে বিছানার ধার থেকে তুলে এনে শিবনাথের পাশে শুইয়ে দিয়ে বললেন, রাম-সীতা আমার ঘর আলো করেছে।

কুশণ্ডিকা শেষ হল। পরদিন সকাল আটটার সময় বর-কনের বিদায়ের আগে রামচরণবাবু শিবানীর কচি কোমল ডান হাতখানি রামজয়বাবুর হাতের উপর রেখে বললেন, বেয়াই, আজ থেকে আমার শিবানী আপনার মেয়ে হল। অঘোরবালা আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে শিবনাথকে বললেন, বাবা, আজ একে তোমার হাতে তুলে দিলাম। এর সমস্ত দোষ অপরাধ ক্ষমা করে আপন করে নিও। আশীর্বাদ করি তোমরা সুখী হও। বর্ষার বারিধারার মতো চোখের জলে দুজনের বুক ভেসে গেল। বালিকার কুসুম কোমল নিটোল মুখখানি অশ্রুধারায় শিশিরসিক্ত কিশলয়ের মতো দেখাচ্ছিল। নিচে সানাই-এর করুণ সুর বেজে উঠেছে। উভয়ে এক মাত্র সন্তানকে চিরজীবনের জন্য পরের হাতে তুলে দেওয়ার মর্মস্পর্শী দৃশ্য

শিবনাথের মনের উপর যে গভীর দাগ রেখে গেছে তা কোনদিন মুছে যায়নি। বাদ্য ও শঙ্খধ্বনির সঙ্গে বিদায়ের পর্ব শেষ হল।

বরের পুনর্যাত্রা আরম্ভ হল। পালকির সঙ্কীর্ণ জায়গার মধ্যে অপরিচিত দুটি প্রাণী। একটি আট বছর বয়সের সদ্য পরিণীতা দীর্ঘ ঘোমটাটানা বালিকা। আর একটি স্ফুটনোন্মুখ যুবক। চলার পথ দীর্ঘ। চার পাঁচ মাইল হাঁটার পর পালকি থামে। পালকি থেকে নেমে তারা পায়ের খিল ছাড়ায়। যখন ফাল্গুনের অপরাহ্ণ সন্ধ্যার অন্ধকারে বিলীন তখন তারা পৌছল গ্রাম থেকে এক মাইল দূরে। শিবনাথ কান্নার ফ্যাঁস ফ্যাঁস শব্দ পালকির ভিতর শুনতে পেল। সে শিবানীকে জিজ্ঞাসা করল, তোমার কি খিদে পেয়েছে? মাথা নেড়ে সে জানাল, না। শিবনাথ সান্ত্বনা দেওয়ার কথা খুঁজে পাচ্ছিল না। এমন বিপদে সে কোন দিন পড়েনি। সে আবার জিজ্ঞাসা করল, মা-বাবার জন্য কি তোমার মন কেমন করছে? বালিকা নীরব।

শিবনাথ বলল, এই তো তিন দিন পরে আবার মা-বাবার কাছে ফিরে যাবে। শিবানী তখন কতকটা সামলে নিয়েছে। এমন সময় গোটাকয়েক হাউই সোঁ করে আকাশে উঠে ফেটে গেল। শিবনাথ আবার কথা বলার সুযোগ পেল। বল্‌ল, ঐ দেখ আকাশে কেমন আগুনের ফুলঝুরি। শিবানী দেখলো কি না কে জানে। কিন্তু তখন তার বুক ফাটা নিস্ফল কান্না থেমে গেছে। দূরে শোনা গেল শঙ্খধ্বনি—বর কনেকে গৃহে তুলে নেওয়ার মাঙ্গলিক আহ্বান।

গৃহের আঙ্গিনায় মাটির উপর একখানা নতুন কাপড় পেতে দেওয়ার পর পালকি নামানো হল। মেয়েলী অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হওয়ার পর গাটছড়া মোচন করা হল।

পরদিন বউভাত নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল। শ্যামাচরণের উস্কানিতে গ্রামে একটু গোলযোগের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তর্কালঙ্কারমশাই-এর মধ্যস্থতায় সেটা বেশীদূর গড়াতে পারেনি।

তিন দিন পরে রামচরণবাবুর ছোট সম্বন্ধী শিবানীকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়ার পর শিবনাথ স্কুলে উপস্থিত হল। তাকে দেখে সহপাঠীদের ভিতর একটা বেশ হৈ-হল্লা পড়ে গেল। শ্যামল দৌড়ে গিয়ে শিবনাথের মাথায় নিজের মাথাটা ঠুকে চিৎকার করে উঠল—কে কোথায় আছিস

দৌড়ে আয় রে। শিবুর কপালে তোদের কপালটা ছুঁয়ে নে। ভাগ্য ফিরে যাবে। একজন ঘৃণায় নাক সিটকে বলল, পাড়াগেঁয়ে ভূত ছাড়া এই বয়সে কেউ বিয়ে করে নাকি ?

শ্যামল শিবনাথের অন্তরঙ্গ বন্ধু। তার জ্যেঠামশাই বৃন্দাবনবাবু একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল। বিপত্নীক। বিদগ্ধ গ্রন্থকীট। কাব্য নাটক দর্শনশাস্ত্রের বহু সংস্কৃত ও ইংরেজী গ্রন্থপূর্ণ কয়েকখানি আলমারি সজ্জিত বৈঠকখানার মাঝখানে একখানি আরাম চেয়ারে হেলান দিয়ে এই জ্ঞান-তপস্বী দিবসের অধিকাংশ সময় পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। তিনি ছিলেন স্বল্পাহারী, নিরামিষাশী, বীতরাগ। ওকালতী একরকম ছেড়েই দিয়েছিলেন। শিবনাথ তাঁর বাড়ির ছেলেদের সঙ্গে পড়ত, এমন কি খেত শুত বেড়াত ও খেলা করত।

শ্যামলের মেজ কাকাও উকিল। বড় দাদার নাম ভাঙ্গিয়ে চালাতেন। দেহের রঙ কালো। খোঁচা খোঁচা গোঁফ। আমড়ার মতো বড় বড় গোল চোখ। মাথার চুল কদম ছাঁট। কড়া মেজাজ। বিদ্যার খুব চহট ছিল। তিনি মাঝে মাঝে শিবনাথ ও শ্যামলকে ইংরেজী পড়াতেন। মক্কেলদের সামনে ল্যাম্বস্ টেলস্ বইখানা খুলে মার্চেণ্ট অব ভিনিসের বিচারের দৃশ্যটা প্রায়ই পড়াতেন। 'আণ্টনির গা থেকে এক পাউণ্ড মাংস কাটতে পার কিন্তু এক ফোঁটা রক্তপাত করতে পারবে না—এ কথা দলিলে লেখা নেই'—পোর্শিয়ার এই উক্তিটি বার বার পড়ে মক্কেলদের শোনাতেন। আইনের এই কুট-কচালে বাখ্যা শুনে তারা বিস্ময়ে হাঁ করে উকিলবাবুর মুখের দিকে চেয়ে থাকত। আনন্দে ডগমগ হয়ে তিনি বিপুল আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন।

ক্লাসে রজনীর বয়স ছিল সকলের চেয়ে বেশী। হিংসুটে। গর্বিত। ম্যাক্‌মার্ডির বই থেকে নতুন ফ্রেজ ও ইডিয়ম হরদম মুখস্থ করত। পাছে কেউ তার বিদ্যা শিখে নেয় এই ভয়ে তাদের ব্যবহার করত না। ফলে তার মুখস্থ বিদ্যা পুস্তকের নির্বাক পাতার মধ্যে গুমরে মরত। কুস্থানে জন্ম বলে সকলে তাকে এড়িয়ে চলত। অনাথ ছিলো কবি। ভাবপ্রবণ। কবিজন সুলভ উদার মন। উদাসীন। ঢিলেঢালা ভাব। 'শিশু' নামে তার একটা কবিতা কলকাতার ছেলেদের একটা মাসিকে ছাপা হয়েছিল। তার শেষ দুটি লাইনে কবি বলছেন—

হাস হাস হাস, শিশু, হাস আরবার।
তোমার হাসিতে ঝরে মধু অনিবার॥

কবিতাটির সমালোচক লিখেছিলেন, কবির এই দুটি লাইন পড়ে কেবল মাত্র শিশু নয় শিশুর বাবাও হেসে ফেলবেন। সমালোচনার তীব্র শ্লেষ তরুণ কবির কোমল প্রাণে ব্যথা দিয়েছিল। কবি দিন কয়েক যেন একটু মুষড়ে পড়েছিলেন। ক্লাসের সেরা ছাত্র মতি। মেধাবী বুদ্ধিমান ছেলে। শিবনাথকে সে ভাইয়ের মতো ভালবাসত। উত্তর জীবনে সে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হয়েছিল। অকালে স্ত্রীবিয়োগের ফলে ও অত্যধিক মদ্য পানের জন্য অসময়ে তার মৃত্যু হয়।

হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে বাঙ্গালী জাতির সংহতি ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য লর্ড কার্জন যে বৎসর বাংলা দেশকে দুভাগে বিভক্ত করে দিল, সে বৎসর দেশের উপর দিয়ে তুমুল আন্দোলনের ঝড় বইতে লাগল। সুদূর মফঃস্বলের ক্ষুদ্র শহরেও তার উচ্ছ্বাস পৌছুতে দেরি হয়নি। সুরেন্দ্রনাথের সিংহগর্জন, বিপিনচন্দ্রের জ্বালাময়ী বক্তৃতার তরঙ্গ, কাব্যবিশারদের উদ্দীপনা-পূর্ণ স্বদেশী গান, রবীন্দ্রনাথের প্রাণমাতানো স্বদেশী সঙ্গীত আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালী জাতির যুগযুগান্তের সুপ্তি ভেঙ্গে দিল। বাঙ্গালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির কেন্দ্রস্থল, ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জন্মভূমি কলকাতা থেকে বিদেশী বর্জনের বাণী প্রচারিত হল। নতুন যুগের ভাবের বন্যায় বাংলা দেশ ভেসে গেল। কত বক্তা বক্তৃতা দিতে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথের রাখিবন্ধন, 'বাংলার মাটি বাংলার জল', রজনীকান্তের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই', কাব্যবিশারদের 'যায় যাবে জীবন চলে' ইত্যাদি সঙ্গীত শত শত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে বিপুল উদ্দীপনা সঞ্চার করল। বিলিতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব, মেয়েদের হাতের কাঁচের চুড়ি ভাঙ্গার হিড়িক, করকচ লবণের ব্যবহার পুরামাত্রায় চলতে লাগল। শিবনাথ ও মতি করকচ নুনের ঝুড়ি মাথায় নিয়ে পাড়ায় পাড়ায় ফিরি করতে লাগল। অনেক সময় পল্লী অঞ্চলের গৃহস্থ বাড়ির মেয়েদের শ্রম লাঘব করার জন্য তারা করকচ নুন শিল নোড়ায় গুঁড়িয়ে দিয়ে আসত।

একদিন শোনা গেল, নদীর ওপারে একটি হাটে বিরাট স্বদেশী সভা হবে। বক্তা একখানি খবরের কাগজের সম্পাদক। ছেলেরা দলে দলে খেয়া পার হয়ে সভা স্থলে উপস্থিত হল। কি যে বিপুল উদ্দীপনা। বিরাট

জনসমাবেশ। বক্তার ভাষা অগ্নিশ্রাবী। বাচনভঙ্গী অপূর্ব। শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধ। নির্বাক বিস্ময়ে অভিভূত, ভাববিহ্বল। নবশক্তির উদ্বোধনে তাদের হৃদয় অনুরণিত। কখনো জলদ গম্ভীর স্বরে, কখনো কম্বুকণ্ঠে কখনো উদ্দীপনাময় বাক্‌ছটায় বক্তা সকলকে স্বদেশ সেবার কণ্টকাকীর্ণ পথে অগ্রসর হয়ে দেশ-মাতৃকার দাসত্ব মোচন করার জন্য আহ্বান জানালেন। শ্রোতারা কর্মপথে যাত্রা সুরু করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হল।

এর দিনকয়েক পরে শোনা গেল মহকুমা শহরে আর একটা স্বদেশী সভা হবে। কলকাতা থেকে একজন বক্তা আসছেন। ছেলের দল শোভাযাত্রা করে বক্তাকে স্টীমার ঘাট থেকে নিয়ে এল। বন্দে মাতরম্ ধ্বনিতে আকাশ কেঁপে উঠল। সমবেত কণ্ঠে তারা গাইতে লাগল—

যায় যাবে জীবন চলে,
তোমার কাজে জগৎ মাঝে
বন্দে মাতরম্ বলে।

বন্দে মাতরম্ গান হওয়ার পর সভার কাজ আরম্ভ হল। ইংরেজ আমলের পূর্বে ভারতের ছবির সঙ্গে ইংরেজ আমলে ভারতের ছবির তুলনা করে চোখে আঙ্গুল দিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে ইংরেজের শোষণ দেশের মানুষকে পশুত্বের কোঠায় নামিয়ে দিয়েছে। তার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছে। তাকে অন্তঃসারশূন্য করে দিয়েছে। ক্রুরবুদ্ধি ইংরেজ বঙ্গদেশকে দ্বিধা বিভক্ত করে বাঙ্গালীর ঐক্য ও সংহতি ধ্বংস করতে চাচ্ছে। তাকে হাতে না মেরে ভাতে মারতে হবে। এজন্য চাই স্বদেশী ও বয়কট। এই আন্দোলনকে সফল করে তুলতে হবে। জীবন-মরণ পণ করে লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হতে হবে। বিরাট জনতার সামনে দণ্ডায়মান বক্তার মূর্তিখানি এখনও শিবনাথের চোখের উপর ভাসছে।

বিয়ের পাঁচ ছয় মাস পরে আষাঢ় মাসে রথের ছুটির সময় শশীবাবু ও শ্যামাচরণ গেছেন দেশে কি যেন একটা কাজের উপলক্ষ্যে। বড়দিদির অনুমতি নিয়ে দুই বন্ধু অনাথ ও মতির সঙ্গে শিবনাথ গেল দশ বারো মাইল দূরে সিংহগড়ের রথের মেলা দেখতে। ওখানকার জমিদারদের এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন মতির দাদামশাই। দিদিমার অনুরোধে তারা সে রাত্রি তাঁর বাড়িতে থেকে গেল। পরের দিনও তিনি মতিকে ছাড়লেন না।

এক মাইল দূরে স্টীমার স্টেশন। স্টীমারে চড়ে আসার জন্য অনাথ মতি ও শিবনাথ গন্তব্য স্থানের টিকিট কেটে পাশাপাশি দুখানা স্টীমারের মধ্যে একটা স্টীমারের উপর তলায় উঠে জাঁকিয়ে বসল।

স্টীমারখানি ছেড়ে দিল। স্থানটি দুটি নদীর সঙ্গমস্থল, তিন চার মাইল চওড়া। দিগন্ত প্রসারিত জলরাশি উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে নৃত্য করছিল। অসংখ্য সামুদ্রিক পাখি ঢেউ-এর সঙ্গে ভেসে চলছিল। দিকচক্রবালে বন্নরাজির নীল রেখা। অনাথ কবি মানুষ। কবিতা লেখার এমন সুযোগ ছাড়া যায় না। সে কাগজ পেন্সিল নিয়ে কবিতা লিখতে বসে গেল। ক্রমে সঙ্গমস্থল ছেড়ে স্টীমারখানি ভাগীরথীর মুখে ঢুকল। শিবনাথ ডেকের ওপর পায়চারি করছিল। একজন সহযাত্রীর মুখে শুনল স্টীমার কলকাতা যাচ্ছে। ভুল বুঝতে পেরে সে চিন্তিত হয়ে পড়ল। কবির হেলদোল নেই। তিনি ভাবে বিভোর। কাব্য সরস্বতীর উপাসনায় মগ্ন।

শিবনাথ তাকে ঠেলা দিয়ে বলল, মাথামুণ্ডু ছাইভস্ম কি লিখছিস? আমাদের স্টীমার কলকাতা যাচ্ছে যে!

কবি নির্বিকার। বললেন, ভালই হল। ভুল না করলে কি আমাদের মতো পাড়াগাঁর মেঠো ছেলে কলকাতা যেতে পারত, না জলস্থল আকাশকে এক সঙ্গে দেখতে পেত? আর ভারতবর্ষের রাজধানী স্বপনপুরী কলকাতা যাওয়া হত কি?

শিবনাথ তার বক্তৃতায় বাধা দিয়ে বলল, তোর পাকামো ছেড়ে দে। এখন শোন, কবে ছেলেবেলায় কলকাতা গিয়েছিলাম কিছু মনে নেই। যাব কোথায়? গিয়ে উঠব কোথায়?

অনাথ স্মিতমুখে বলল, ওরে, জেনে যাওয়ার আনন্দের চেয়ে না জেনে যাওয়ার আনন্দ বেশী জানবি। তোর শ্বশুরমশাই তো কলকাতায় থাকেন শুনেছি। সেখানেই উঠব।

—শোন কথা! শ্বশুরমশাই কলকাতা আছেন জানি আর তাঁর বাড়ির ঠিকানাও জানি কিন্তু যাওয়ার রাস্তা জানি না।

—তাতে কি? একখানা ঘোড়ার গাড়ি ডেকে নিয়ে গাড়োয়ানকে ওই ঠিকানায় যেতে বলব। কলকাতার সব রাস্তা গাড়োয়ানদের নখ-দর্পণে। এর জন্যে এত ভাবনা কিসের? দেখছি তুই পাড়াগাঁর একটা ভ্যাবাকান্ত ছেলে।

—না হয় ওখানে ওঠা গেল। এমন ট্যাংটেঙ্গে আধময়লা কাপড় জামা, তালিমারা জুতো পরে মানুষ প্রথম শ্বশুরবাড়ি যায়? লোকে বলবে কি?

—কি আর বলবে? লোকে অনেক কিছু বলে। ভালো করলেও বলে আবার কিছু না করলেও বলে। যে কোন কাজ কর না তারা বলবেই। লোকের মুখে তুই হাতচাপা দিবি কি করে?

—জ্যাঠামো রাখ। লোকের কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। ওঁরা কি ভাববেন? বাবা কি মনে করবেন? বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি যাওয়া কি এমনভাবে হয়? নিমন্ত্রণ নেই, দিন স্থির নেই, বলা কওয়া নেই গেলেই হল? তুই পাগল নাকি?

—পাগল নই, আর ছাগলও নই। ভুল যখন হয়ে গেছে, তখন কি করবি বল? জলে ঝাঁপ দিবি, না, আকাশে উড়বি? জাহাজের শক্ত তক্তার উপর মাথা কুটে মরলে হবে কি?

—না, তা নয়। বড় লজ্জা করে।

—লজ্জার কি আছে? কথায় বলে, শ্বশুরবাড়ি মথুরাপুরী, তিন দিন পরে ঝাঁটার বাড়ি। আমরা তো আর তিন দিনের বেশী থাকব না। লোকে লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে দুপুররাত্রেও শ্বশুরবাড়ি পাড়ি মারে। আমরা তো সন্ধ্যার সময় যাবো। তাতে লজ্জার কি আছে? তিড়বিড় করিস্ নে, বোস। লিখতে দে।

শিবনাথ চুপ করল। নিজের পকেট হাতড়ে দেখল নগদ পাঁচ সিকে পয়সা ঢনঢন করছে। কবিকে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, আমার কাছে তো পাঁচ সিকে পুঁজি। তোর কাছে টাকা কড়ি কিছু আছে? কবি বল্‌ল আমার কাছে বোধ হয় একটা টাকা আছে। বলে, রুমাল থেকে টাকাটা বের করে শিবনাথের হাতে দিল।

—ব্যাস্, আর পায় কে রে? গোটা কলকাতা কিনে ফেলা চলবে। তারপর মুখ কাঁচুমাচু করে বল্‌ল, তামাশা নয় ভাই। এই ন সিকেয় কি হবে বলত?

—যা হবার তাই হবে। হওয়া না-হওয়া কি মানুষের হাতে? দ্যাখ্ না কি হয়।

—হবে আর কি? লজ্জা আর অপমান।

—কিছুই হবে না। অজানাকে লোকে ভয় করে। সব ঠিক হয়ে যাবে। বিধিলিপি খণ্ডাবে কে? অনিবার্যকে ঠেকানো যায় না।

স্টীমার জেটিতে ভিড়ল। সামনে হাওড়ার পোল। কত লোকজন, গাড়ি-ঘোড়া আনাগোনা করছে। জেটির উপর এক গাদা কুলি। নামার আগে কবির আর একটা উচ্ছ্বাস এল। সে বলতে লাগল—এই কলকাতা, ভারতের রাজধানী। আজ কেউ আমাদের খোঁজ খবর নিচ্ছে না। হয়তো এমন একদিন আসবে যখন দলে দলে লোক আমাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য ভিড় করবে। জয়ধ্বনি দেবে। শিবনাথ বিরক্ত হয়ে শেষে দাবড়ি দিয়ে বলল, তোর বক্তিমা থামা। পাগলামি করিস নে। লোকে কি ভাববে বলতো!

যাত্রীরা ব্যস্ত সমস্ত হয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে নামতে লাগল। পোঁটলা-পুঁটুলি, বিছানার মোট, ট্রাঙ্ক ও হরেক-রকম জিনিসপত্র নিয়ে যেতে যেতে কবির দিকে তাকিয়ে কেউ নিঃশব্দে, কেউ একটু মুচকি হেসে চলে যাচ্ছে। কবির ধনুর্ভঙ্গ পণ ভিড় না কমলে তিনি উঠবেন না। স্টীমারের উপরে টিকিটবাবুর কাছে শিবনাথ বাড়তি ভাড়া দিয়ে ইতিপূর্বেই টিকিট দুখানি বদলে নিয়েছিল। স্টেশনের বাইরে এসে ছ আনায় একটা ছ্যাকড়া গাড়ির ভাড়া ঠিক করে গাড়োয়ানকে ঠিকানা বাত্‌লে দিয়ে তারা গাড়ির ভিতরে বসল। গাড়ি কলুটোলার একটা গলির ভিতর একটা বাড়ির সামনে থামলে গাড়োয়ান ভাড়া নিয়ে চলে গেল।

প্রকাণ্ড বাড়ি। ফটকের বাঁ দিকে বৈঠকখানা। ডান দিকে দারোয়ানের ঘর। শ্বশুরমশাই-এর নাম বলতে সে তাদের ভিতরে নিয়ে গেল। বাইরের উঠনের উপর দিয়ে অন্দর-মহলে যাওয়ায় পথ। ডান দিকে একটা জলের কল। তার পাশে একটি গন্ধরাজ ফুলের গাছ। ফুলে সাদা হয়ে গেছে।

শ্বশুরমশাই বাড়িতে ছিলেন না। শাশুড়ী বেরিয়ে এলেন। দুজনে তাঁকে প্রণাম করল। শিবনাথ অপ্রতিভ। তার অবস্থা দেখে তিনি বললেন, এসো, বাবা, এসো। ঘরের ছেলে ঘরে এসেছ তাতে লজ্জা কি?

উঠন থেকে নিচের তলার ঢোকবার ডান দিকের একখানি বড় ঘরে থাকতেন শ্বশুর-শাশুড়ী আর তাঁদের মেয়ে। ভাড়া পাঁচ টাকা। পিছনের ঘরগুলির ভাড়া আরও কম। দারোয়ান পাশের একখানা ছোট ঘর খুলে দিয়ে গেল। কাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে জলখাবার খেয়ে দুই বন্ধু গল্প

করছিল। এমন সময় শ্বশুরমশাই বাসায় এলেন। শিবনাথকে দেখে তিনি প্রথমটা খুব আশ্চর্য এবং আনন্দিতও হলেন। বললেন, বড় ছেলেমানুষি করেছ। নিরাপদে পৌঁচেছ ভালোই হয়েছে। অজানা লোকের পক্ষে কলকাতা বড় বিষম স্থান। তার ওপর তোমরা কখন কলকাতায় আসনি। এখানে চোর ডাকাত গুণ্ডা পকেটমার ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে কোন মুহূর্তে বিপদ ঘটতে পারে। বাড়িতে তাঁরা ভাবনা-চিন্তা করছেন। আমি কালই শশীবাবুকে টেলিগ্রাম করে জানিয়ে দিচ্ছি, যে তোমরা এখানে এসেছ।

তিনি অন্য ঘরে চলে গেলেন। সামনেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি দিয়ে দুটি ছোট মেয়ে বার বার ওঠানামা করছে। তাদের মধ্যে একজন ব্যারিস্টারের মেয়ে। আর একজন শিবানী। দুজনের মধ্যে খুব ভাব। দুজনেরই গোলগাল চেহারা। ডাগর চোখ। ভ্রূ দুটি যেন তুলি দিয়ে আঁকা। এক বোঁটায় দুটি গোলাপ। তারা বালিকাসুলভ নিঃসঙ্কোচে ছোটাছুটি দাপাদাপি করছিল। কবি ওত পেতে বসে থাকে শিবানীকে দেখবে বলে। চিনতে পারে না। জিজ্ঞেস করে, এদের মধ্যে কোন্‌টি তোর বউ রে?

শিবনাথ বলল, যে মেয়েটি একটু মোটাসোটা আর একটু ময়লা রঙ।

কবিবর গুণ গুণ সুরে কি গান যেন গাইতে লাগলেন। শিবনাথ তাকে বাধা দিয়ে বলল, ভাব উথলে উঠল নাকি? আর গাইতে হবে না। শ্বশুরমশাই এসে পড়বেন। শিবনাথের দাবড়ি খেয়ে কবি একটু ঘাবড়ে গেল।

ওখানে তারা তিন চার দিন ছিল। শ্বশুরমশাই বাড়িতে সংবাদ দিয়েছেন। শিবনাথ নিশ্চিন্ত।

অনাথ বললে, কারোকে কোন সংবাদ দেওয়ার বালাই আমার নেই।

শিবনাথ বলল, কেন?

—পৃথিবীতে আমি ছাড়া আপনার বলতে আমার কেউ নেই।

—তাই না কি?

—হাঁ। জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মা মারা যান। তার তিন চার দিনের মধ্যে কলেরায় বাবার হঠাৎ মৃত্যু হয়। সেবা-শুশ্রূষা তো দূরের কথা তিনি এক ফোঁটা ওষুধও পাননি।

—কেন?

—কে দেবে ? ডাক্তার ডাকবে কে ? পাড়ার সব লোক তো কলেরার ভয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়েছিল।

—তবে দেখাশোনা করলে কে ?

—ভগবান। আমি দাই-এর বাড়িতে মানুষ হয়েছিলাম। মরার আগে বাবা দাই-এর হাতে আমাকে তুলে দিয়ে যান।

—তারপর ?

—সমাজে আমার স্থান ছিল না। দশ বারো বছর বয়স পর্যন্ত দাই-এর বাড়িতে ছিলাম। সেও মরে গেল। আমি অকূল পাথারে ভাসলাম।

—তোর কথা শুনে বড় কষ্ট হচ্ছে। তারপর ?

—ওরে সংসারে কতকগুলো লোক দুঃখ ভোগ করতে আসে। আমি তাদের ভিতর একজন। ঘুরতে ঘুরতে এলাম এক উকিলবাবুর বাড়িতে; আমার করুণ কাহিনী শুনে উকিল-গিন্নী আমাকে তাঁর বাড়িতে স্থান দিলেন। উকিলবাবু ছিলেন স্কুলের সেক্রেটারি। তাঁর অনুরোধে হেড্‌মাস্টার আমাকে স্কুলে ফ্রি করে দিলেন। উকিলবাবুর স্ত্রী আমাকে ছেলের মতো ভালবাসতেন। কিন্তু ভালবাসা আমার সহ্য হয় না। আমাকে ভালবাসার অপরাধে ভগবান অসময়ে তাঁকেও তুলে নিলেন।

তারপর অনাথ একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, ওরে আমি মৃত্যুর দূত। যেখানে যাই, সেখানে মৃত্যুর বীজ নিয়ে যাই। যে মৃত্যুর দূত, সে মৃত্যুকে ভয় করবে কেন ? আমি বেপরোয়া।

—এখনও তো তুই উকিলবাবুর বাসায় থাকিস ?

—থাকিও বটে, আর না থাকিও বটে।

—সে কেমন ?

—বিপত্নীক উকিলবাবু সংসারে মন দেন না। একেবারে উদাসীন। খাই না খাই, থাকি আর না থাকি কেউ খোঁজ খবর নেয় না। ও বাড়িতে আমার আবাহন নেই, আর বিসর্জনও নেই। শালগ্রামের শোওয়া-বসা সমান রে।

কলকাতা থেকে চলে যাওয়ার কিছু দিন পরে অনাথ মৃত্যুর কোলে লুটিয়ে পড়েছিল। পৃথিবীতে অনাথের মতো কত জীবন আসে, দিন কয়েক থাকে। তারপর ঝরে পড়ে শুকনো পাতার মতো। সংসারে কে কার খোঁজ খবর রাখে!

॥ সাত ॥

ওখানে আসার একদিন পরে ব্যারিস্টার-গিন্নী দুই বন্ধুকে রাত্রে খাওয়ার নিমন্ত্রণ করলেন। তাদের বসার স্থান হয়েছিল তাঁর শোয়ার ঘরে। বিরাট সজ্জিত কক্ষ। শ্বেত পাথরের মেঝে। আবক্ষ দেওয়ালে নানা রঙের পাথর বসানো। বেলজিয়ম গ্লাসের মানুষপ্রমাণ আয়না বসানো বিরাট বুক কেস। সুন্দর পালিশ করা মেহগনির খাট। ড্রেসিং টেবিল। শ্বেত পাথরের টেবিলের উপর রূপার ফুলদানি। মেহগনি কাঠের আলমারি। আরও কত আসবাব পত্র। নাম জানা তো দূরের কথা, তারা কোনদিন এ সব চোখে দেখেনি। শিবনাথ বিস্মিত, অভিভূত! মুখর কবি নীরব। সব দেখেশুনে তাদের চোখ ভরে গিয়েছিল। একদিকে বিপুল ঐশ্বর্যের বাহ্য প্রকাশ, অন্যদিকে দৈহিক সৌন্দর্যের অপরূপ বিকাশ তাদের মুগ্ধ করে দিয়েছিল। ব্যারিস্টার-গিন্নীর বয়স সাতাশ আঠাশ। গোলাপের মতো বর্ণচ্ছটা। নিটোল রক্তিম গণ্ডদ্বয়। নাসিকা আর ভ্রূ-যুগল নিখুঁত। সুচিক্কণ কেশরাশি নিতম্বের উপর যেন আনন্দে আছড়ে পড়েছে। পরনে মিহি থান—শুভ্র সীমন্তের উপর কতকটা টানা। বিধাতা যেন তাঁর সকল সৌন্দর্য এই রক্ত মাংসে গড়া দেহলতাটির উপর অকৃপণ হস্তে ঢেলে দিয়েছিলেন। অকাল বৈধব্যের অন্তর্জালা তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর রূপখানিকে ম্লান করে দিতে পারেনি। নয় বছরের একটি মেয়ে আর চার বছরের একটি ছেলে রেখে ব্যারিস্টার সাহেব বছরখানেক আগে সংসার ছেড়ে চলে গেছেন।

তাঁর পার্শ্বে ছিলেন অঘোরবালা। আর্থিক সম্পদে দরিদ্র হলেও তিনি দৈহিক সৌন্দর্যে হীন ছিলেন না। বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে না হলেও অঙ্গ-সৌষ্ঠবে শিবানী মায়ের প্রতিচ্ছবি ছিল, আর সখিসোনা তার মায়ের অনুরূপ ছিল না।

শিবনাথের দিকে তাকিয়ে হেসে ব্যারিস্টার-গিন্নী বললেন, দিদি তো নতুন জামাইকে আনলে না। তাই জামাই নিজেই চলে এসেছে। কি বল, বাবা? ভালোই হয়েছে।

অঘোরবালা লজ্জিত হয়ে বললেন, উনি বলেছিলেন, পূজোর ছুটিতে জামাইকে আনবেন। দুই বন্ধু নিস্তব্ধে খাচ্ছিল। কথা বলতে সাহস ছিল

না। আর কি কথাই বা বলবে? কথা বলতে গিয়ে পাছে তাদের আধা উড়ে আধা বাংলার খিচুড়ি ভাষা শুনে তাঁরা হেসে ফেলেন, এই ভয়ও তাদের নিস্তব্ধতার জন্য কম দায়ী ছিল না। কবির বাক্-সংযম হলেও রসনা-সংযমের কোন লক্ষণ ছিল না। বরং এক দিকের স্রোত রুদ্ধ হওয়ার দরুন অন্য দিকের স্রোতটি দ্বিগুণ বেগে বয়ে চলেছিল। হাতা হাতা পোলাও, গণ্ডা গণ্ডা মাছ, ডজন ডজন সন্দেশ রসগোল্লা, বাটি বাটি মাংস সে গোগ্রাসে গিলুছিল। জীবনের মায়া কাটিয়ে সে যেন ফাঁসির খাওয়া খাচ্ছিল। তার অশোভন ভোজনপটুতা এই দুই মহিলার মনে কি ভাব উদ্রেক করেছিল বুঝতে পারলেও শিবনাথ বন্ধুর রাক্ষুসে আচরণে মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল।

ওখান থেকে উঠে আসার পর শিবনাথ বলল, তুই অমন অসভ্যের মতো গিলছিলি কেন? একি ভদ্রলোকের খাওয়া?

অনাথ হেসে বলল, খাওয়ার কাছে কি ভদ্রলোক আর ছোটলোক আছে? সব বেটাই খায়, খেতে দিয়েছে খাব না কেন? খিদেয় পেট চিঁ চিঁ করবে আর আমি ভদ্রতার খাতিরে পেট খালি রেখে দেঁতো হাসি হাসব? যে যা মনে করুক, পেট খালি রেখে ওঠার পাত্র আমি নই। হাজার হোক বামুনের ছেলে, গাণ্ডে পিণ্ডে ফলার খাওয়া আমাদের জাত ব্যবসা। তবু তো দক্ষিণাটা না নিয়ে উঠে এসেছি। লোভ সম্বরণ করেছি বলে আমাকে ধন্যবাদ দে। যারা অপরকে খাইয়ে সুখ পায় তাদের মনে ব্যথা দিতে নেই। খাওয়ার যখন ব্যবস্থা করেছে তখন কম খেয়ে জিনিসপত্র নষ্ট করা কি উচিত? বড়লোক হলে কি হয়, আমার মতো বামুন তো নয়! ওদের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার হয়ে গেল। ব্যারিস্টার সাহেবের আত্মা এতদিন ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্যে ঝুলছিল। তার স্বর্গের দরজা খুলে গেছে জানবি।

অতিভোজনের এই কৈফিয়ত শুনে শিবনাথের রাগ জল হয়ে গেল।

পরদিন সকালে শাশুড়ীর গলা শোনা গেল। তিনি তাঁর দাদা নেত্য-বাবুকে বলছিলেন, দাদা, তুমি আজ সন্ধ্যেয় ওদের দু বন্ধুকে স্টার থিয়েটার দেখিয়ে আন। ওরা সখের থিয়েটার দেখেছে। কলকাতায় ভালো থিয়েটার দেখেনি। নেত্যবাবু বললেন, তাহলে টিকিট কেনার টাকা দিস্।

নেত্যবাবু ছিলেন অঘোরবালার বড় ভাই। ভাই বলে মনে হয় না। খুব লম্বা কালো কাঠখোট্টা চেহারা। দেহের উপর অসংযম ও অমিতাচারের ছাপ পড়েছে। ঘাঁটালের এক গ্রামে বাড়ি। লেখাপড়া বিশেষ কিছু

জানতেন না। চতুর ধড়িবাজ শয়তান ও চরিত্রহীন। কলকাতায় বাড়ির দালালি করতেন। বেশ দুপয়সা রোজগারও ছিল। ভগ্নীপতির বাসায় খেতেন। দিনের বেলা ঘুরে বেড়াতেন। রাতে কোন্ কুঞ্জে বিহার করতেন কেউ জানত না। টাকাকড়ি উড়িয়ে দিতেন। দেশের বাড়িতে স্ত্রী ও দুটি ছেলে ছিল। তাদের টাকা পাঠাতেন না। কোন খোঁজ খবরও নিতেন না।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। বোনের কাছ থেকে গোটা চার পাঁচেক টাকা হস্তগত করে নেত্যবাবু শিবনাথকে বললেন, আজ রাত্রে তোমাদের থিয়েটার দেখিয়ে আনব। অনাথ, তুমি, বাবা একটুখানি অপেক্ষা কর। আমি বাবাজীকে নিয়ে একটু ঘুরে আসি। শিবনাথকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বৌবাজারে একটা গলিতে ঢুকলেন। তখন রাস্তার আলো জ্বালা হয়ে গেছে। এ পাড়ায় শুধু মেয়েদের বাস। যেন বভ্রুবাহনের দেশ! অদ্ভুত নির্লজ্জ বেহায়া মেয়ে তারা। ফরসা কাপড় পরে, চুল বেঁধে খোঁপায় ফুল গুঁজে, চোখে সুরমা দিয়ে, গালে আর ঠোঁটে রঙ মেখে তারা বাড়ির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট টানতে টানতে হাসছিল।

নেত্যবাবু শিবনাথকে সঙ্গে নিয়ে বেপরোয়া ভাবে এক বাড়ি থেকে আর এক বাড়িতে যান, বাড়ির এক ঘর থেকে আর এক ঘরে ঢোকেন। সকল জায়গায় অবারিত দ্বার। সকলেই অতি পরিচিত। কোন ঘরে একটা মেয়ে সেজেগুজে ফরাশের উপর বসে হারমোনিয়ম আর ডুগি তবলার সঙ্গে বেসুরো গান গাইছে, কোন ঘরে একটি তরুণী বাজনার তালে পাছা দুলিয়ে নাচছে। কোন ঘরে সভ্যভব্য দু চারজন ছোকরার সঙ্গে দু তিনটে যুবতী মদ খাচ্ছে; ঠোঙ্গা ঠোঙ্গা খাবার খাচ্ছে, হল্লা করছে, ঢলাঢলি করছে। নেত্যবাবু তাদের দলে ভিড়ে যান। শিবনাথ ঘরের দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে। নেত্যবাবু শিবনাথের পরিচয় দেন। বলেন, এই ছেলেটি আমার ভাগ্নী জামাই। বড়লোকের ছেলে। দেশে বাপের জমিদারি আর প্রকাণ্ড পাকা বাড়ি আছে। শিবনাথ লজ্জায় মরে যায়। ভাবে, কলকাতায় দেখবার বা দেখাবার মতো আর কোন কিছু নেই! নেত্যবাবু বেরিয়ে এলে কানে কানে বলে, মামাবাবু, আপনার পায়ে পড়ি; এবার চলুন, আর পরিচয় দিয়ে কাজ নেই। একলা পালিয়ে আসার উপায় ছিল না তার। এমন আঁকাবাঁকা সরু গলি। গলির পর গলি। যেন

গোলকধাঁধা। সেখানে একবার ঢুকলে নতুন লোকের পক্ষে বেরিয়ে আসা কঠিন। এখানে বারাঙ্গনাদের ঘাঁটি, মদের ভাঁটি, নাচগানের ফোয়ারা। মোড়ে মোড়ে পুলিশ পাহারা। পান সিগারেটের স্টল। লেমোনেড সোডার ছোটখাটো আড়ৎ, চায়ের দোকান। নতুন জামাই ক্ষুণ্ণ হয়েছে দেখে নেত্যবাবু অগত্যা বেরিয়ে এলেন এই নরককুণ্ড থেকে। শিবনাথ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। অনেক দিন আগে একবার বেণীঠাকুরের পাল্লায় পড়ে তার কি দুর্দশা হয়েছিল তার মনে এল। শিবনাথকে বাসার দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে নেত্যবাবু কোথায় ভেসে পড়লেন। লাজ-লজ্জার মাথা খেয়ে ছেলেমানুষ জামাইকে নিয়ে তিনি যে এমন খেলা খেলবেন, অঘোরবালা তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি।

পরদিন অঘোরবালা ব্যারিস্টার-গিন্নীর গোমস্তার সঙ্গে দু বন্ধুকে থিয়েটার দেখতে পাঠিয়ে দিলেন। সন্ধ্যা সাতটা থেকে ভোর পর্যন্ত তিনখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক ও তিনখানি প্রহসন পর পর অভিনীত হল। আলিবাবা নাটকে মর্জিনার ভূমিকায় যিনি অভিনয় করেছিলেন, তিনি এক গাছা ঝাঁটা হাতে নিয়ে 'ছি ছি এত্তা বড়া বাড়ি মে এত্তা জঞ্জাল' গানটা গাওয়ার সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের উপর ঝাঁট দেওয়ার ভঙ্গিতে কোমর দুলিয়ে চোখ ঠেরে নাচতে লাগলেন। ঠিক সেই সময় আর এক দিক থেকে আবদাল্লা লাফাতে লাফাতে বেরিয়ে এলেন। তারপর দুজনে জড়াজড়ি করে 'বাদ্‌শা বেগম বউ ঝমাঝম' গান গাইতে গাইতে নাচের চোটে স্টেজটাকে ফাটিয়ে দিলেন! তাঁদের পায়ের তলায় তক্তাপোশ থেকে চপাচপ শব্দ দর্শকদের তাক লাগিয়ে দিল। প্রেক্ষাগৃহে হাসি ও আনন্দের বান ডেকে গেল। আনন্দে উদ্বেলচিত্ত দর্শকদের হাততালির শব্দ, চিৎকার, 'এন কোর' 'ঘুরে ফিরে' প্রভৃতি কথার সঙ্গে অভিনেত্রীর গায়ে মাথায় ফুল এবং ফুলের মালা বর্ষিত হতে লাগল। দর্শকবৃন্দের অভদ্রোচিত আচরণ, অসংযত চিৎকার আর প্রলয় নাচের দৃশ্যের স্মৃতি শিবনাথের মন থেকে কখনও মুছে যায়নি। আসার পথে গোমস্তাবাবু সগর্বে শিবনাথকে বলল, কেমন অভিনয় দেখলেন, জামাইবাবু? কলকাতার সকল থিয়েটারের সেরা এই স্টার থিয়েটার আর যাঁরা মর্জিনা আর আবদাল্লা সেজেছিলেন তাঁরা হলেন কলকাতার শ্রেষ্ঠ নৃত্যশিল্পী।

পরদিন সকালে এল বিদায়ের পালা। অনাথ স্টীমারে বাসায় ফিরে গেল। শিবনাথ শাশুড়ীকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই তিনি আশীর্বাদ করলেন।

তখন শিবনাথ জানত না যে, শাশুড়ীর সঙ্গে এই তার শেষ দেখা। বিয়ের পরদিন বর-কনেকে বিদায় দেওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন—আমি মেয়ে পেটে ধরে ছেলে পেয়েছি। আজও সেই কথার পুনরুল্লেখ করলেন।

শ্বশুরমশাই হাওড়া স্টেশনে গিয়ে শিবনাথকে মেদিনীপুরের গাড়িতে তুলে দিয়ে এলেন।

বাপ-মার অনুমতি না নিয়ে বা তাঁদের না জানিয়ে শিবনাথ শ্বশুরবাড়ি গেছে শুনে পাড়ার মেয়েদের মধ্যে বেশ একটু আলোড়নের সৃষ্টি হল। তার রেশ বেশ কিছুদিন চলল। ঘোষালবুড়ী ভবতারিণীকে তামাশার সুরে জিজ্ঞাসা করলেন, কি গো, শিবুর মা, ছেলে নাকি শ্বশুরবাড়ি থেকে এসেছে? বিয়ে হলেই ইংরেজী পড়ুয়ারা বউ-এর ভেড়ো হয়। ছেলেমানুষ বউ তাতেই এত! বড় হলে না জানি কি হবে! মুখ নেড়ে ঠোঁট ফুলিয়ে তিনি আরও বললেন, এর পর ছেলে বউ-এর আঁচল ধরে বেড়াবে গো, আঁচল ধরে বেড়াবে! যত বাঁচি ততো শিখি! দেখছি কত, দেখলুম কত, কিছুদিন বেঁচে থাকলে আরও দেখব কত! ঘোর কলিকাল! হল কি?

ভবতারিণী কথার উত্তর দিলেন না দেখে সে ফোকলা দাঁতে তামাকের গুল ঘসতে ঘসতে চলে গেল।

সেদিন বিকেলে শিবনাথ নদীর বাঁধের উপর বেড়াচ্ছিল। দেখল তার পাঠশালার সাথী রামচন্দ্র হন্ হন্ করে তার দিকে এগিয়ে আসছে। তাকে অনেক দিন পরে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কি রে রাম, কেমন আছিস্?

—কেমন আছি? বেশ আছি।

—তার মানে?

—লোকে বলে আছি ভালো, শালুক খেয়ে দাঁত কালো।

—কেন, কি হল?

—হবে আর কি? এই সেদিন আমার একটা মেয়ে তিন দিনের জ্বরে মরে গেল! সাত বিঘা জমি হাতে চাষ করেছিলাম। নদীর বাঁধ ভেঙ্গে সব নষ্ট হয়ে গেছে। তা ছাড়া গোমস্তার তাগাদা, চৌকিদারি ট্যাক্স, আবার পুলিশের চোখরাঙ্গানি আর হয়রানি।

—কেন, পুলিশের চোখরাঙ্গানি কেন?

—দারোগা বলে আমি না কি স্বদেশী করছি। শোন কথা। আমরা ভাই চাষা-ভুষা মানুষ। মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল। বাজারে সেদিন একটা স্বদেশী

সভা হয়ে গেল। আমরা মিটিং শুনতে গিয়েছিলাম। এই অপরাধ। চৌকিদার দিয়ে ডাকিয়ে দারোগা আমায় থানায় নিয়ে গেল। বলে, আমরা নাকি গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবার জন্য বোমা মারার দল বেঁধেছি। আমি বললাম, হুজুর, আমাদের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই। গায়ে-গতরে খেটে-খুটে দিন গুজরান করি। ওসব ইংরেজী-পড়া বাবুদের কাজ। আমরা ছাপোষা মানুষ, হুজুকে মাতলে আমাদের চলবে কি করে?

—দারোগা কি বললে?

—বলবে আর কি? সাবধান করে দিয়ে ছেড়ে দিলে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। ওদের খপ্পরে পড়লে কি আর বাঁচবার উপায় আছে?

—এখন যাচ্ছ কোথায়?

—যাচ্ছি বীজধান কিনতে। দেখি, জমিগুলো যদি রুইতে পারি, তা হলে এখনো আশা আছে। নইলে সারা বছর ছেলেমেয়েদের ভাত মুড়ি যোগাব কি করে?

—এখন রুইলে ধান হবে?

—হবে না? এই তো শ্রাবণের প্রথম। কথায় বলে—

আষাড়ে রোয় খড়কে
শ্রাবণে রোয় ধানকে
ভাদ্রে রোয় শিষকে
আশ্বিনে রোয় কিসকে

এই বলে রাম হন্ হন্ করে বীজধান কিনতে চলে গেল।

রামচন্দ্র চলে যাওয়ার পর শিবনাথ ভাবতে লাগল—এরাই তো আমাদের দেশের ষোল আনা লোকের ভিতর পনরো আনা। এদের দুঃখ-দারিদ্র্যের আঁধারে কি কোনদিন সুখের আলো জ্বলবে?

॥ আট ॥

ফার্স্ট ক্লাসে উঠার পর থেকে শিবনাথ অন্য ছেলেদের নিয়ে শরীরচর্চার দিকে মন দিল। তাদের নেতা ছিলেন ওখানকার বড় উকিল সীতানাথ বাবু। কাছারীর কাজকর্ম শেষ করে বাড়ি এসে জল-টল খেয়ে রোজ

বিকেলে ঘড়ির কাঁটার মতো স্কুলের ড্রিল-গ্রাউণ্ডে তিনি হাজির হতেন। ছেলেরা প্যারালাল বারে ঝুলত। ডাম্বেল আর মুগুর ভাঁজত, ডন-বৈঠক হা-ডু-ডু প্রভৃতি খেলা করত। সীতানাথবাবু তাদের উৎসাহ দিতেন। হেড্-মাস্টারমশাই বলতেন, স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যেটুকু শরীরচর্চা দরকার, তার বেশী হলে বুদ্ধি মোটা হয়। ডন-বৈঠক, ডাম্বেল বা মুগুর ভাঁজা যথেষ্ট। স্বাস্থ্যরক্ষা করতে গিয়ে বেশী দৌড়-ঝাঁপ করে হাত-পা ভাঙ্গার কোন অর্থই হয় না। কষ্টসাধ্য ক্লান্তিকর ব্যায়াম শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। ক্রিকেট খেলা ভাল কিন্তু সময়সাধ্য। এতে দৃষ্টিশক্তি বাড়ে, হাত পায়ের পেশী সবল হয়, লক্ষ্য স্থির হয়। টেনিস খেলার মতো এমন ভদ্র আর নিরাপদ খেলা আর নাই। এই খেলায় মনের আনন্দ, স্বাস্থ্যের উন্নতি, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঞ্চালন হয়, তবে ব্যয়সাধ্য। ফুটবল ষণ্ডামার্কের খেলা। এ তো খেলা নয়, যুদ্ধ। ষাঁড়ের ডালনা, বাছুরের জিভ্ভাজা, শুয়োরের মাংস না খেলে ফুটবল খেলা বাতুলতা। ডাল-চচ্চড়ি-খেকো বাঙ্গালীর জন্যে ফুটবল খেলা নয়। বিশেষতঃ ছাত্রদের পক্ষে মারাত্মক। বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ধাক্কাধাক্কি ধস্তাধস্তি করে মরণ-বাঁচন লক্ষ্য না করে অবিশ্রান্ত ছোটাছুটি করে গলদঘর্ম হয়ে, হাত-পা ভেঙ্গে, মাথা ফাটিয়ে, নখ তুলে, হাঁটু ছিঁড়ে ছেলেরা ঘরে ফিরে এসে ঢক্ ঢক্ করে জল খেয়ে পড়তে বসতে না বসতে ঘুমে ঢুলতে থাকে। তারপর নাক ডাকায়, লেখাপড়া শিকেয় ওঠে।

বড় হয়ে জ্যোতিষবাবুর মতো হেড্মাস্টার হওয়ার যে আদর্শ স্কুলে প্রথম ভর্তির দিন থেকে শিবনাথ মনে মনে পোষণ করে এসেছিল, নতুন ভাবের বন্যায় তা ভেসে গেল। এখন সংবাদপত্রের সম্পাদক হয়ে স্বদেশী বক্তৃতা দিয়ে দেশসেবা করার ইচ্ছা প্রবল হয়ে উঠল। নতুন খেয়ালের বশে শিবনাথ হাতেলেখা একখানা ইংরেজী মাসিক পত্রিকা বের করতে লাগল। কাগজের সামনের পৃষ্ঠার উপর বড় অক্ষরে সম্পাদকের নাম লেখা থাকত। কাগজখানা ক্লাসের ছেলেদের হাতে হাতে ঘুরত। সকলে তার নামটা আগে পড়ছে দেখে সে মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করত। কিন্তু হাতে লেখার পরিশ্রম, সময় নষ্ট করে পড়াশোনার ক্ষতি হচ্ছে দেখে হেড্মাস্টারমশাই-এর উপদেশে শিবনাথ কাগজ সম্পাদনার বিলাস ত্যাগ করতে বাধ্য হল।

ক্লাসের সকল ছেলের চেয়ে ইংরেজীতে বেশী নম্বর পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে শিবনাথ ফার্স্ট ক্লাসে উঠল। হেড্মাস্টারমশাই এন. ঘোষের

নেশন কাগজে লেখেন দেখে সে বাইবেল সম্বন্ধে একটা প্রবন্ধ লিখল। সেই প্রবন্ধটা একখানা মিসনারি সাপ্তাহিক পত্রে ছাপা হয়েছিল। প্রথম ছাপার অক্ষরে নিজের নামটা দেখে শিবনাথের সে কি আনন্দ! সে আনন্দের তুলনা নেই। কেউ পাছে দেখে ফেলে এবং কিছু মনে করে, এজন্য নির্জনে বসে ছাপার হরফে নিজের নামটা বার বার উল্টে পাল্টে দেখতে দেখতে শিবনাথ নির্বাক আনন্দে অভিভূত হয়ে যেতে লাগল!

॥ নয় ॥

এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। তখনও ফল বের হয়নি। একদিন সারদাবাবু বললেন, চল, একটা এক্সকার্‌সন করে আসি। সারদাবাবু ইতিহাসে এম. এ. পড়তেন। গ্রীষ্মের ছুটিতে বাড়ি এসেছিলেন। বড় অমায়িক ভদ্রলোক। ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতেন, গল্পগুজব করতেন, তাদের পড়াতেন, ভালবাসতেন।

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি একদিন ভোর চারটার সময় শিবনাথ আর চার জন ছেলেকে নিয়ে সারদাবাবু রওনা হলেন। গন্তব্য স্থান সারদাবাবুর বন্ধু চারুবাবুর বাড়ি। ষোল মাইল রাস্তা হেঁটেই যাওয়া হবে স্থির হল। মেঠো রাস্তা। আকাশ স্বচ্ছ, নির্মল। ভোরের মৃদু শীতল হাওয়া সকলের মনে আনন্দ শিহরণ জাগিয়ে তুলল। প্রথম মাইল দুই জেলা বোর্ডের বাঁধ। তারপর মাঠের ভিতর দিয়ে মাড়া রাস্তা, উঁচু-নিচু এবড়ো-থেবড়ো। পাঁচ ছয় মাইল যেতে না যেতে তাদের পায়ে ফোস্কা পড়ে গেল। সারদাবাবু গল্প বলেন, তারা শোনে, আর ধীরে ধীরে চলে। বারো তেরো মাইল হাঁটার পর তাদের সামনে পড়ল একটা নদী। তরতরে জল। মৃদু স্রোত। একজন লোক বলল, নদীর নাম কংসাবতী। পার হওয়ার সময় শিবনাথের মনে পড়ল সেই নদীর তীরে তার ছোট গ্রামখানি। জলের ধারে ঝুঁকে-পড়া সেই বুড়ো বটগাছটা, তাদের খেলার চর, বালুরাশির উপর ঘন কাশের বন, ফসল জাগার জন্য চাষীদের ছোট ছোট কুঁড়ে—এই সকল দৃশ্যের মানসিক চিত্র যেন তার চোখের উপর ছবির মতো ভাসতে লাগল।

আনমনা হয়ে ভাবতে ভাবতে শিবনাথ নদী পার হচ্ছিল। সে সকলের পিছনে পড়ে গেছে। তার সঙ্গীরা ওপারে তার জন্য অপেক্ষা করছিল।

সারদাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, শিবু, অমন ধীরে ধীরে তুমি নদী পার হচ্ছিলে কেন? মাত্র এক হাঁটু জল। ভয় কিসের?

শিবনাথ বলল, না ভয় পাইনি। অতটা রাস্তা হাঁটার পর ঠাণ্ডা জলে পা ডুবিয়ে বড় আরাম বোধ করছিলাম।

ঠাণ্ডা জলে পা ডুবিয়ে তারা সকলেই আরাম বোধ করছিল। চারুবাবুর বাড়ি পৌছতে প্রায় বারোটা বেজে গেল। এইভাবে তাদের হঠাৎ আসতে দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন। তারা সকলে বৈঠকখানায় বসল। তাদের পায়ে একহাঁটু ধুলো। জুতোগুলি ধুলোয় সাদা। জামা ঘামে ভেজা। হাত পা ধোয়ার অবসর ছিল না। তারা সাদা চাদর পাতা ফরাশের উপর তাকিয়ায় মাথা দিয়ে দেহ এলিয়ে দিল। দুজন চাকর তাল-পাখা দিয়ে তাদের বাতাস করছিল। কতকটা জিরিয়ে নেওয়ার পর তারা একে একে উঠল, মুখহাত ধুয়ে নেয়াপাতি ডাবের জল খেয়ে গল্প-গুজব করতে লাগল।

অনেক বেলা হয়ে গেছে দেখে চারুবাবু তাদের নিয়ে স্নানের জন্য পুকুরের ধারে উপস্থিত হলেন। সুগন্ধী তৈল, সাবান, তোয়ালে ও কাপড় সেখানে প্রস্তুত ছিল। প্রকাণ্ড দীঘি। শান বাঁধনো প্রশস্ত ঘাট। পাশে রাধাবল্লভজীউ-এর মন্দির। ঘাট আর মন্দির ছাড়া আর কিছুতে ইটের সম্পর্ক ছিল না। স্নান সেরে তারা বসল। সে এক বিরাট ব্যাপার। এক এক জনের বসার গালিচা আসনের সামনে এক একটি প্রকাণ্ড থালা। রূপার মতো উজ্জ্বল। ব্যাস আঠারো ইঞ্চির কম নয়। তার মাঝখানে জিরার মতো সুগন্ধী চালের ধপ্‌ধপে সাদা ভাত সাজানো। একটি রেকাবিতে নানা রকমের ভাজা। আর একটিতে শুধু বড়িভাজা—জিলিপী বড়ি, ফুল বড়ি, গয়না বড়ি, সাদা বড়ি, যেন বড়ির প্রদর্শনী। তারপর নানা রকমের তরকারি—পেঁপের ডাল্না, পাঁপরের ডালনা, মুড়িঘণ্ট, পোনা মাছ ভাজা, কৈ মাছের ঝালদেয়া, মুগের ডাল, ফুল কফি, মাছের কালিয়া, চাঁটনী, দৈ আর সন্দেশ, ক্ষীরের ছাঁচ। খাবে কি! দেখেই তাদের পেট ভরে গেল।

সারদাবাবু বললেন, ভোজনের এই আয়োজন দেখে আমরা অবাক হয়ে গেছি! শহর থেকে এত দূরে ঘণ্টাকয়েকের ভিতর খাদ্যের এমন বিরাট আয়োজন সম্ভব হল কেমন করে?

চারুবাবু হাসতে লাগলেন। ভোজ্য বস্তুর এমন সমারোহ, এমন বিনয়, অতিথি-সৎকারের এমন সুষ্ঠু ব্যবস্থা বাংলা দেশের সুদূর পল্লীতে বিরল।

চারুবাবু বললেন, এই সকল আহার্য বস্তুর জন্য একটি পয়সাও খরচ করতে হয়নি। তারা অবাক হয়ে গেল! ঘরে নোনা জল ফুটিয়ে নুন তৈরি হয়। তরিতরকারি, এমন কি সর্ষে ধনে লঙ্কা ইত্যাদি নিজেদের চাষে উৎপন্ন হয়। ক্ষীর সন্দেশ ছানা ঘরের গাই-এর দুধে তৈরি। চারুবাবু বললেন, আমরা কোন জিনিষ কিনে খাই না। এত বড় সংসার। দু বেলা এক শ লোকের পাতা পড়ে। এই অজ পাড়াগাঁয়ে এত তরি-তরকারি রোজ পাওয়া যাবে কি করে? ভালো জিনিস তো বিক্রি হয় না। কিনবে কে? পয়সা পাবে কোথায়? সপ্তাহে মাত্র দু দিন হাট বসে। সেও দূরে। আমাদের গোয়ালে ষাটটি গাই গরু, কুড়ি জোড়া হালের বলদ। বড় দুটো দীঘিতে বিশ-পঁচিশ মণ পোনা মাছ। কাজকর্মের সময় ধরা হয়। দুটো ছোট পুকুরের মাছ চাকররা জালে ধরে দৈনন্দিন খরচের জন্য। জলে-মাছে এক হয়ে থাকে।

চারুবাবুর দু ভাই। সকলের বিয়ে হয়েছে। প্রত্যেকের চার পাঁচটি ছেলেমেয়ে। কর্তা-গিন্নী আর তাদের তিনটি বিধবা মেয়ের সাতটি সন্তান। ঝি-চাকর আট-দশ জন, চাষের জন্য দশ জন মুনিষ। তাছাড়া রোজ দু-চার জন অতিথির শুভাগমন হয়। শান বাঁধানো ঘাট, ঠাকুর মন্দির, সদর দাওয়ায় ওঠার জন্য গোটা কয়েক পৈঠা ছাড়া আর কোথাও ইটের নাম গন্ধ ছিল না। চারুবাবু বললেন, তাদের বংশে না কি ইংরেজী পড়া আর ইট পোতা সহ্য হয় না। এখন ইংরেজী কুসংস্কারটা কেটে গেছে। বাড়ির অন্দর-মহলে খড়ে-ছাওয়া দশ বারোখানি মাটির দোতলা ঘর নিয়ে একটি প্রস্থ। আর একটি প্রস্থে বৈঠকখানা ও তৎসংলগ্ন চার পাঁচখানি কুঠরি। একলপ্তে ষাট বিঘা ডাঙ্গা। ডাঙ্গার ধারে ধারে প্রায় বারো শ নারিকেল গাছ। একটা ফলের বাগান—আম, জাম, লিচু, গোলাপ জাম, কাঁঠাল প্রভৃতি নানা জাতের গাছ। খামারে দশ বারোটি খড়ের প্রকাণ্ড গাদা। এক কাহন খড়ের দাম আড়াই টাকা। তিনটি বড় ধানের গোলা। এক

মণ ধানের দাম দেড় টাকা। হাজার দুই মণ ধান সর্বদা মজুদ থাকে খোরাকির জন্য। দুটো ঢেঁকিতে রোজ সকাল-বিকাল ধান ভানা হয়। ডাঙ্গার সংলগ্ন হাজার বিঘা ধান জমি। একশ বিঘা জমি হাতে, আর সব ভাগে চাষ হয়।

বাংলা দেশের সুদূর পল্লীতে এমন একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ গৃহস্থ পরিবার আছে দেখে শস্যশ্যামলা সুজলা বাংলা মায়ের প্রতি তাদের ভক্তি গভীরতর হয়ে উঠল।

সারদাবাবু বললেন, একদিকে মাঠ ধু ধু করছে। আপনাদের ডাঙ্গার উপর দাঁড়িয়ে দেখলে ধান-জমি ছাড়া তো আর কিছু নজরে পড়ে না। এখানে কি লোকের বসতি নেই?

—আছে, তবে একটু দূরে দূরে।

—কেন?

—হাজার বছর আগে এই অঞ্চলটা সমুদ্রের নিচে ছিল। ক্রমে সমুদ্র সরে গেল। চর দেখা দিল। লোকজন এল। যে যতটা পারল জমি দখল করে নিল—কারোর হাজার বিঘা, কারোর পাঁচ শ বিঘা। এ অঞ্চলে অধিকাংশ লোকের এক শ বিঘা জমির কমও নেই। প্রায় সকলেই জমিদার, আধা জমিদার, তালুকদার, পত্তনিদার। এরা সব ধেনো বড়লোক। বেশী কিছু লেখা-পড়া শেখে না। সভ্যতা-ভব্যতার ধার ধারে না। এদের মোটা ভাত, মোটা কাপড়, মোটা চাল চলন। এদের গোলা-ভর্তি ধান, পুকুর-ভর্তি মাছ, আর গোয়াল-ভর্তি গরু।

—এদেশে চোর ডাকাত নেই?

—আছে হয়তো, কিন্তু আমাদের বাড়িতে কোন দিন চুরি-ডাকাতি হয়নি। আগে কোনদিন এখানে পুলিশকে আসতে দেখিনি। আজকাল স্বদেশীর গন্ধ পেয়ে আসতে শুরু করেছে। এখানকার অধিকাংশ লোকের গোলায় ধান আছে। লোকের অভাব অল্প। দু-চার জনের অভাব থাকলেও বাবা তাদের অভাব পূরণ করে দেন। তিনি সকলকেই ধান চাল আনাজ দেন। মানুষ অভাবেই তো চুরি করে?

—আবার স্বভাবেও করে। অনেকে ক্রিমিনাল মেণ্টালিটি নিয়েই জন্মে, আবার কেউ বা অভাবে পড়েই চুরি করে। তখন চুরি করা অভ্যাসে পরিণত হয়। তবে সে ধরনের চোর এ অঞ্চলে নেই বললেও হয়।

—এই সেদিন একটা লোক আমাদের বাইরের গোলার তলা ফুটো করে মণ দেড়েক ধান নিয়ে পালাতে চেষ্টা করছিল। ভোরে উঠে সদর দরজা খুলে বাবা আসছেন দেখে তার ভ্যাবাচাকা লেগে গিয়েছিল। পালায়নি। সে চুপটি করে দাঁড়িয়েছিল।

—কর্তা লোকজনদের ডাকলেন না?

—তিনি লোকটাকে বললেন, চুরি করছিস কেন? বললেই তো পারতিস, কিছু ধান দিতাম। লোকটা তাঁর পায়ে ধরে কাঁদতে লাগল। তিনি তার মাথার উপর ধানের বস্তাটা তুলে দিয়ে বললেন, শীগ্‌গীর পালা। ছেলে বাবুরা টের পেলে তোর মাথা ভেঙ্গে দেবে। লোকটা ধানের বস্তা নিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল।

তারপর চারুবাবু বললেন, কথায় কথা বেড়ে যাচ্ছে। জল খাবেন চলুন।

সারদাবাবু বললেন, কেউ লোককে না খাইয়ে বিদায় দেয়; আবার কেউ অত্যধিক খাইয়ে লোক তাড়নোর ব্যবস্থা করে। দুজনে হাসতে লাগলেন।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত দুই বন্ধুর মধ্যে গল্পের পর গল্প চলতে লাগল। বৈশাখের খরতাপ সহ্য করে ষোল মাইল পথ হাঁটার দরুন ছেলেরা নাক ডাকিয়ে অসাড়ে নিদ্রা যাচ্ছিল। কি ভাবে রাত কেটে গেছে তারা জানতে পারেনি। তাদের শরীরের শোচনীয় অবস্থা দেখে চারুবাবুর বাবা সেদিন তাদের ছাড়লেন না। আদর-যত্ন, মুহুর্মুহুঃ ভোজন, বেড়ানো, গল্প, নিদ্রা আর তাস-খেলা চলতে লাগল। চার দিন খাওয়া দাওয়া সেরে তারা তিন মাইল দূরে কংসাবতী নদীতে চলল। এই পর্যন্ত নদীতে জোয়ার ভাটা খেলে। নৌকায় নদী-পথে ঘুরে আসতে দেরি হলেও তাদের হাঁটতে হয়নি। হাঁটবার তাগিদ ছিল না। মাত্র দশ মাইল গরুর গাড়িতে চড়ে তারা সন্ধ্যার সময় শহরে পৌঁচেছিল। চারুবাবু তাদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণ খাবার দিয়েছিলেন।

ফিরে আসার পর সারদাবাবু এক্সকারসন সম্বন্ধে সকলকে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখতে বললেন। শিবনাথের প্রবন্ধ শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয়েছিল। তার সরল স্বচ্ছ ভাষা নিখুঁত বর্ণনা ও রচনাশৈলী সারদাবাবুর অজস্র প্রশংসা লাভ করেছিল। তাঁর বন্ধু মোহিনীবাবু সে বছর বি. এল. পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। প্রবন্ধটি পড়ে তিনি বলেছিলেন, মনে হয় কোন গ্রাজুয়েটের লেখা।

পরীক্ষার ফল বের হওয়ার কয়েক দিন পরে ফুটবল ম্যাচ খেলতে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে শিবনাথ এমন ভাবে মাটির উপর পড়ে গেল তার বাঁ হাতের হাড় ভেঙ্গে গেল। প্রথমে সে বুঝতে পারেনি। সে উঠে বসল। বাঁ হাতখানা তুলতে পারছিল না। ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলোর ডগা ধরে তোলার পর কনুই পর্যন্ত হাতখানা উঠল। সে খেলোয়াড়দের ডাকল। তারা ছুটে এল। পাশের গ্রাউণ্ডে গবর্ণমেণ্ট ডাক্তার টেনিস্ খেলছিলেন। গেমটা শেষ করে তিনি এলেন। হাতখানাকে এদিকে ওদিকে টেনে-টুনে টিপেটাপে হাড়ের জোড়ামুখটা ঠিক করে লাগিয়ে দিলেন। শিবনাথকে ডাক্তারখানায় নিয়ে যেতে বললেন। কম্পাউণ্ডার হাতখানাকে ধরে টানাটানি করতে লাগল। একটা কেরোসিন কাঠের বাক্স থেকে দুখানা ছোট পাতলা তক্তা খুলে নিয়ে ভাঙ্গা হাতখানার দুদিকে ধরে ন্যাকড়া জড়িয়ে বেশ শক্ত করে বেঁধে দিল। কতকটা গুলাড লোশন ঢেলে দিয়ে বাঁধনের ন্যাকড়াটা ভিজিয়ে দিয়ে শিবনাথকে বাড়ি নিয়ে যেতে বলল। তাদের সেই হেঁচকা টানে ভাঙ্গা হাতখানা বেশ ফুলে গেল। একটি ছেলের কাঁধের উপর ভর দিয়ে সে চলতে লাগল। গলা থেকে ঝোলানো একটা কাপড়ের পাড়ের উপর কাঠ বাঁধা বাঁ হাতখানা তার বুকের উপর ঝুলছিল। শশীবাবুর বকুনি খাওয়ার ভয়ে শিবনাথ খিড়কি দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকল। বড়দিদি রান্না-ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। চোখের জল আঁচলে মুছে চুপি চুপি শিবনাথকে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। সে অসহ্য যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে পড়েছিল। হাসপাতাল থেকে তারা এক শিশি ওষুধ দিয়েছিল। দু-এক ডোজ ওষুধ খাওয়ার পর সে ঘুমোতে লাগল। বড়দিদি সারারাত তার বিছানার উপর বসেছিলেন। ডাক্তারের অবহেলায় আর হাসপাতালের লোকের অবজ্ঞার ফলে তার বাঁ হাতখানা চিরজীবনের জন্য বেঁকে গেল। জ্যোতিষবাবুর উপদেশ ও তিক্ত অভিজ্ঞতার ফলে সে জীবনে আর কোন দিন ফুটবল খেলেনি। সে খেলার মাঠে যেত যেন একটা নেশার টানে। খেলায় যোগ দিত না। লাইনের বাইরে বসে খেলা দেখে আনন্দ পেত।

দিন কয়েক পরে এক ভদ্রলোক খেলার মাঠে এলেন। তাঁর নাম জানা ছিল না। তিনি ছিলেন মেদিনীপুরের একটি স্কুলের শিক্ষক। খেলার পর তিনি ছেলেদের নিয়ে গল্পগুজব করতে লাগলেন। বেশ মিষ্টভাষী সদালাপী ভদ্রলোক। বেশীর ভাগই দেশের কথা বলতেন। ছাত্রদের তিনি স্বাস্থ্য ও চরিত্র গঠন করতে

উপদেশ দিতেন। তখন স্বদেশী আন্দোলন পুরোদমে চলেছে। ধরপাকড় আরম্ভ হয়ে গেছে। তিনি দেশের কথা, আন্দোলনের অবস্থা, ছেলেদের কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করতেন। তাঁর সুন্দর আচরণ, মধুর ব্যবহার জ্ঞানগর্ভ আলোচনা ছেলেদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। তারা তাঁর অনুরক্ত ভক্ত হয়ে উঠেছিল। এক-এক দিন তিনি ছেলেদের নিয়ে ডাকবাংলায় যেতেন। ডাকবাংলাটি ছিল শহরের এক প্রান্তে নির্জন স্থানে। সেদিকে বড় একটা কেউ যেত না। একটু দূরে রাস্তা। তিনি সখারাম গণেশ দেউস্করের 'দেশের কথা,' ম্যাট্‌সিনি ও গ্যারিবল্ডীর জীবনী ও গীতাপাঠ করে শোনাতেন। ওদিকে ঘনঘন যাতায়াত করার জন্য ছেলেদের উপর পুলিশের নজর পড়েছিল। তিনি ছেলেদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র পাঠচক্র গড়ে তুললেন। তিনি বলতেন, দেশোদ্ধারের জন্য কোন কাজ, এমন কি হত্যাও অপরাধ নয়। দেশের কাজই গীতার নিষ্কাম কর্ম। দেশের জন্যে প্রাণ দিলে মানুষ স্বর্গে যায়। প্রথমে চরিত্র গঠন, তারপর দেশের মুক্তি সাধন যুবকদের জীবনের একমাত্র ব্রত হওয়া উচিত। এইভাবে অনেক কথা বলে তিনি ছেলেদের চিত্তে দেশভক্তির উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলতেন। গ্রীষ্মের ছুটি শেষ হলে তিনি চলে গেলেন। ছেলেদের ডাকবাংলায় যাতায়াতও শেষ হয়ে গেল। শোষণ অত্যাচার জেল ও নির্বাসনের হিড়িকে স্বদেশী আন্দোলন একটু থমথমে ভাব ধারণ করেছিল ; কিন্তু বাইরের আন্দোলন চাপতে গিয়ে ভিতরে ভিতরে বিপ্লববাদীর দল গড়ে উঠেছিল। ইংরেজ এমন কি দেশের শত্রু বিভীষণদের দূর করে দেশোদ্ধারের জন্যে গুপ্তদলের সৃষ্টি হয়েছিল।

সে বছর কলকাতায় বসন্ত রোগের মহামারী আরম্ভ হয়েছিল। সংবাদ পাওয়া গেল অঘোরবালার বসন্ত হয়েছে। জীবনের কোন আশা নেই। তিনি শিবনাথকে একবার দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সংক্রামক ব্যাধির ভয়ে তাকে কলকাতায় যেতে দেওয়া হয়নি। দিন কয়েক পরেই শোনা গেল তিনি দেহরক্ষা করেছেন।

এ বাড়ির কোন লোক নতুন বউকে কোন সংবাদ দেওয়া সঙ্গত মনে করেনি। রামচরণবাবু মেয়েকে ব্যারিস্টার-গিন্নীর হেপাজতে রাখলেন। কিন্তু বেশী দিন পরের মেয়েকে কে রাখে? তিনি দুঃখের জ্বালায় চাকরি করতে সকালে বেরিয়ে যেতেন। যাওয়ার আগে মেয়েকে দুধ পাঁউরুটি ও মাখন খাইয়ে ব্যারিস্টার-গিন্নীর কাছে পাঠিয়ে দিতেন। মাতৃহারা বালিকা

সারাদিন তার সখিসোনার কাছে থাকত, খেলা করত ও ঘুমোত। বিকালে ফিরে এসে রামচরণবাবু মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে আসতেন। রাত্রে এক মুঠো চাল ফুটিয়ে নিজে খেতেন। মেয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়ে খাওয়াতেন। রাত্রে সে তাঁর গলা জড়িয়ে ঘুমোত। তাঁর চোখের জলে বালিশ ভিজে যেত।

বাড়ির লোকদের হৃদয়হীন ব্যবহারের কথা শুনে শিবনাথ বেদনা অনুভব করেছিল; কিন্তু কর্তা-ব্যক্তিরা বর্তমান থাকতে তার মতো নাবালকের কোন কিছু করার ছিল না। দু তিন মাস অপেক্ষা করার পর ব্যারিস্টার-গিন্নীর পরামর্শে রামচরণবাবু অগত্যা মেয়েটিকে তার শ্বশুরবাড়িতে রেখে এলেন।

॥ দশ ॥

শিবানীর জন্মের আগে রামচরণবাবুর অবস্থা ভাল ছিল। রেশমের কারবারে তাঁর বাবা প্রচুর ধন সম্পত্তির মালিক হয়েছিলেন। তাঁদের বড় বাড়ি জমি জায়গা দীঘি ও বাগান ছিল। বাবার মৃত্যুর পর জ্ঞাতিদের সঙ্গে সুদীর্ঘকাল মামলার ফলে রামচরণবাবুর রেশমের কারবার ফেল হয়ে গেল। কিছু ধান জমি আর ভদ্রাসনটুকু ছাড়া সকল সম্পত্তি দেনার দায়ে বিক্রি হয়ে গেল। ভাগ্যহত নিঃস্ব রামচরণবাবু জীবিকা অর্জনের জন্যে ছ মাসের মেয়ে আর অঘোরবালাকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় আসেন। কলুটোলার এক বড় লোকের জমিদারি সেরেস্তায় ত্রিশ টাকা বেতনে চাকরি যোগাড় করে নিলেন। তাঁর পূর্বের অবস্থা এবং বর্তমান দুর্ভাগ্যের করুণ কাহিনী জমিদারের বৃদ্ধা মাতার করুণা উদ্রেক করে। তিনি রামচরণকে ছেলের মতো ভালবাসতে লাগলেন। তাঁদের বাড়িতে বারো মাসে তেরো পার্বণ হত। রামায়ণ মহাভারত বা ভাগবত পাঠ, দেবদেবীর পূজা শ্রাদ্ধ স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি ধর্ম-কর্মের অভাব ছিল না। এই সকল কাজের ভার রামচরণবাবুর উপর দেওয়া ছিল। ধুতি শাড়ি চাল গামছা খাবার ফলমূল এবং নগদ দক্ষিণা তাঁর প্রাপ্য ছিল।

শিবানী ছিল অঘোরবালার একমাত্র মেয়ে। মা বাপের আদর যত্নে লালিত পালিত। মাঝে মাঝে জমিদার-গিন্নী তাকে বাড়িতে নিয়ে যেতেন। একরত্তি টুকটুকে মেয়েটিকে কোলে নিয়ে অঘোরবালা যখন বুড়ীর সামনে দাঁড়াতেন, তখন মা ও মেয়ের রূপে ঘর আলো হয়ে যেত। বুড়ী অপলক-

নেত্রে তাকিয়ে আনন্দে চিৎকার করে বলতেন, তোরা কে কোথায় আছিস দেখবি আয় রে। আমার বাড়িতে গণেশ-জননী এসেছে।

রামচরণের দুঃখকষ্ট দূর হয়েছিল। পয়মন্ত মেয়ে শিবানীকে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই চোখের আড়াল করতেন না। অঘোরবালা তাকে নিয়ে সর্বদা ব্যস্ত থাকতেন। সে কি খাবে, কি পরবে, তার কোন্ জামাটা চাই, কোন্ পুতুলটা কিনে দিতে হবে, ইত্যাদি কঠিন ও জটিল সমস্যার সমাধান করা অনেক সময় তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠত না। এজন্য তিনি ব্যারিস্টার-গিন্নীর শরণাপন্ন হতেন।

শুক্লপক্ষের চাঁদের মতো শিবানী দিনে দিনে বাড়তে লাগল। তার মুখ চোখ নাক হাত পায়ের গড়ন নিখুঁত হলেও গায়ের রঙ একটু ময়লা ছিল। অঙ্গসৌষ্ঠবে সে ছিল মায়ের মতো, তার গায়ের রঙ ছিল বাবার মতো। জুতো ও ফ্রক-পরা সাত বছরের মেয়েটি বাপের হাতের আঙ্গুল ধরে যেত জমিদার-গিন্নীর কাছে। তাঁকে ঠাকুমা বলে ডাকত, তাঁর কোলে বসে সন্দেশ খেত, পুতুলের বায়না ধরত। বৃদ্ধা স্মিতহাস্যে তার সকল আবদার পূরণ করতেন।

তিনি রামচরণবাবুকে বলেছিলেন, দেখ বাবা, মেয়েকে ফ্রক পরাবে না। ছোট মেয়েদের জন্যে কি রঙীন চওড়া পাড়ের শাড়ি বাজারে পাওয়া যায় না? আমাদের মেয়েরা ফ্রক পরবে কেন? এবার ওকে শাড়ি পরিয়ে এনো। পরীর মতো দেখাবে। আসার সময় ভাল শাড়ি কিনে দেওয়ার জন্যে তিনি রামচরণবাবুর হাতে দশ টাকার একখানি নোট গুঁজে দিলেন। এর পর শিবানী আর কোনদিন ফ্রক পরে বৃদ্ধার কাছে যায়নি।

শিবানী মিশনারি স্কুলে পড়ত। স্কুলটি মেডিক্যাল কলেজের পিছনে ছিল। এখন চিত্তরঞ্জন এভিনিউ স্কুল-বাড়িটিকে উদরস্থ করেছে। রোজ সখিসোনার সঙ্গে সে স্কুলে যেত। ব্যারিস্টারের মেয়ে সখিসোনা দেশী পোষাক পরত না। নিজে সাহেব সাজা, আর স্ত্রী ও মেয়েকে মেম সাজানো সেকালে যেন একটা ব্যাধির মতো এ দেশের উপর-তলার সমাজের ভিতর প্রবেশ করেছিল। অবস্থায় আকারে ও পোষাকে দুটি মেয়ের মধ্যে যথেষ্ট প্রভেদ থাকলেও, তারা মনের দিক দিয়ে এক ছিল। একজন আর একজনকে ছেড়ে বেশীক্ষণ থাকতে পারত না। উপরের তলার মাসীমাও শিবানীকে নিজের মেয়ের মতো ভালবাসতেন।

এইভাবে গড্ডলিকাপ্রবাহের মতো দিনের পর দিন কাটে। অঘোরবালা ও রামচরণবাবুর প্রাণঢালা স্নেহে ক্ষুদ্র মেয়েটি মানুষ হতে লাগল। জমিদার-গিন্নীর মুক্তহস্ত অর্থসাহায্যে এই ক্ষুদ্র পরিবারটির অভাব ও দুঃখ ঘুচে গিয়েছিল।

একদিন দয়াবতী বৃদ্ধা রামচরণবাবুকে বললেন, আমার শরীরের অবস্থা ভালো নয়। বোধ হয় আমি শীগ্‌গীর মা গঙ্গার কোলে স্থান নেব। তুমি মেয়ের বিয়ে ঠিক কর। তোমাদের জেলায় পাড়াগাঁয়ের দিকে একটি সুপাত্রের সন্ধান কর। দেওয়া-থোওয়ার খরচ সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত থাক। শিবানীর বয়স এখন আট বছর। ছেলেমানুষ জানি। তবে বরটিও তো ছেলেমানুষ হবে। ষোল-সতরো বছরের বেশী হলে মেয়ের সঙ্গে মানাবে না। বাপের দু-চার বিঘে ধান জমি, বাস্তুভিটে থাকে, লেখাপড়া শিখছে, এমন একটি সুন্দর পাড়াগাঁর বর সব দিক দিয়ে ভালো হবে। কলকাতার দিকে হাত বাড়িও না। তুমি গরীব মানুষ। ওদের খাঁই মেটাতে পারবে না।

রামচরণবাবু বিনয়ের সঙ্গে বললেন, ঠিকই বলেছেন মা। কিন্তু অত ছোট মেয়ে—

তাঁর কথা শেষ হতে না হতে বৃদ্ধা বললেন, আমরাও তো আট-দশ বছর বয়সে প্রথম ঘর করতে এসেছিলাম। কোন অসুবিধে হয়নি, বরং ভালোই হয়েছিল। এঁদের বাড়ির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পেরেছিলাম।' আমি ছিলাম গরীবের মেয়ে। ভাগ্যের জোরে এঁদের বাড়িতে পড়েছিলাম।

বৃদ্ধার সঙ্গে এই কথাবার্তার দশ পনরো দিনের মধ্যে কনকপুরের বরদা ভট্টাচার্যমশায় রামচরণবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তিনি ছিলেন রামচরণবাবুর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। পণ্ডিত। মজলিসী। সুরসিক। কথায় কথায় উদ্ভট শ্লোক আওড়াতেন আর তার বাখ্যা করতেন। তাঁর গল্প বলার ভঙ্গী আর কথা শুনে হেসে লোকের পেটে খিল ধরে যেত। হাঁটু থেকে কাপড় গুটিয়ে উবো হয়ে বসে থেলো হুঁকোয় তামাক টানতে টানতে চুটকি গল্প বলে সকলকে হাসাতেন। তিনি রামচরণবাবুর কথা শুনে বললেন, আমাদের গ্রামে একটি ছেলে আছে। রঙ ফরসা। সুগঠন। স্বাস্থ্যবান। এ বছর সেকেণ্ড ক্লাসে উঠেছে। পড়াশুনায় বেশ ভাল। ক্লাসে ফার্স্ট সেকেণ্ড হয়। বাবার কিছু ধান জমি, বাস্তু ভিটে, পুকুর আর সামান্য কিছু তেজারতি আছে। ছেলের নাম শিবনাথ। বেশ শান্ত শিষ্ট ভদ্র, বড় তিন বোনের বিয়ে হয়ে গেছে, একটি ছোট ভাই আছে। বাপের বুড়ো বয়সের ছেলে।

বয়স সতরো-আঠারো। রামজয়বাবু ছেলের বিয়ে দিয়ে বউ ঘরে আনতে চান। বলেন, কি জানি কবে চোখ বুজবে। বউ দেখতে পাব না। ছেলেটার মাথায় এক ঘটি জল ঢেলে নিশ্চিন্ত হতে চাই। আচ্ছা, আমি দেখছি। মেয়ের কোষ্ঠীটা দাও। চার পাঁচ দিনের মধ্যে সংবাদ দেব। ভালোই হবে। কোষ্ঠীর মিল হলে সামনে মাঘ মাসের শেষে বিয়ে হয়ে যাবে।

তিনি চলে গেলেন। দিন কয়েকের মধ্যে জানালেন কোষ্ঠীর ভালো মিল হয়েছে। শুনে জমিদার-গিন্নীর আনন্দের সীমা ছিল না। বললেন, ভালোই হয়েছে। আমি এই রকম ছেলের কথা বলেছিলাম। আবার তার নামটিও শিবনাথ। শিবনাথ আর শিবানী নাম দুটি মানাবে, আর শোনাবে ভালো। শিবানীর বিয়ের ব্যবস্থা কর। দেরি করো না।

রামজয়ের মেজো ভাই ভালো কোষ্ঠী বিচার করতেন। তিনি বলেছিলেন, দাদা, এই মেয়েটিকে বউ কর। এর গ্রহের ফল ভালো। সে যে বরের হাত ধরবে সে বিদ্বান আর গুণী হবে। সে যে বাড়ির বউ হবে সে বাড়ির উন্নতি হবে।

মেয়ে পছন্দ হল। ঘর ও বর দেখা হল। বিবাহের দিন স্থির হল। বৃদ্ধার আদেশে রামচরণবাবু গ্রামের বাড়িতে বিবাহের ব্যবস্থা করলেন। বৃদ্ধা খাট বিছানা ঘড়ি আঙটি বর ও কনের বেনারসী জোড় আর কিছু টাকা দিলেন।

বিবাহের অল্প দিন পরে পুণ্যবতী বৃদ্ধা গঙ্গালাভ করেছিলেন।

॥ এগারো ॥

বিয়ের দু বছর পরে মায়ের মৃত্যুর পর শিবানী ছিট্‌কে পড়েছিল মেদিনীপুর জেলার ম্যালেরিয়া-বিধ্বস্ত একটি গণ্ড গ্রামে। চারদিকে বনজঙ্গল। বাঁশ ঝাড়। এঁদো পুকুর। পোড়ো বাড়ি। সব কিছু বেখাপ্পা, অদ্ভুত। ভালো লাগে না কিছু শিবানীর। খড়ে-ছাওয়া মাটির স্যাঁতসেঁতে ঘর। এখানে না আছে চওড়া শান বাঁধানো রাস্তা, না আছে উঁচু পাকা বাড়ি, ট্রাম আর ঘোড়ার গাড়ি। এখানকার রাস্তায় এক হাঁটু কাদা। এখানে ঘরের বাইরে সাপ জোঁক ব্যাঙ পোকা-মাকড় আর ঘরের ভিতর ইঁদুর আরশুলা মাকড়শা বিছে। এখানে দোকান কোথায়?

বাজার কোথায়? এরা জিনিসপত্র পায় কোথায়? সে ভাবে। নিজের মনে প্রশ্ন করে। উত্তর পায় না। বুঝতে পারে না। এ গাঁয়ের লোক যাকে নদী বলে সে কি একটা নদী? নদী কি এত ছোট? সে গঙ্গা দেখেছে। তার জলে মার সঙ্গে কতবার নেয়েছে। গঙ্গা কত বড়, কত চাওড়া নদী। তাতে জল থৈ থৈ করে। কত ষ্টীমার বাঁশী বাজিয়ে এদিক ওদিক আনাগোনা করে। কত নৌকা চলে। কংসাবতী আবার নদী! এত ছোট কেন? এত সরু কেন? এত বালু কেন? এত কম জল কেন? এরা যেমন, এদের দেশের নদীও তেমনি! লোকগুলো যেমন হাড় জির-জিরে রোগা! এদের নদীও তেমনি শুকনো। এই সকল চিন্তা ওঠে শিবানীর মনে। চিন্তা চিন্তাই থাকে। ও নিয়ে আর মাথা ঘামায় না। এখানকার বুড়ীগুলো দাঁতে মিশি ঘষে। এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। এ-পাড়ার ও-পাড়ার ছোট ছোট বউগুলোর দোষের বিচার করে। গালে ঠনা মারে। বাপের বাড়ির খোঁটা দেয়। এখানকার ঝিউড়ীগুলো এলো চুলে গাছ-কোমর বেঁধে গাছে উঠে পেয়ারা, নোনা আতা পাড়ে। পুকুরের জলে সাঁতার কাটে আর ঘুরে বেড়ায়। ভাজদের গঞ্জনা দেয়। কাজের খুঁত ধরে। তাদের সাতখুন মাপ। শিবানী এই সব দেখে, শোনে, ভাবে আর অবাক হয়ে যায়, ভয় পায়।

সখিসোনাকে ছেড়ে আসার সময় বড় কষ্ট হয়েছিল তার। তবে বাবা সঙ্গে ছিলেন। এই তার সান্ত্বনা। তাই কতকটা সামলে নিতে পেরেছিল। দু বছর আগে বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি এসেছিল। তখন ঘর ভর্তি লোকজন। বাজনা বাদ্যি। রোশনাই। কত মেয়ে-পুরুষ তাকে দেখতে এসেছিল। সে তাদের চিনত না। কে একজন লোকের কোলে বসে সে গান শুনেছিল। সে কোথায়? এখন কেউ কোথাও নেই। তারা সব গেল কোথায়? চারদিক ফাঁকা ফাঁকা! বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। মাত্র দু তিনটি প্রাণী টিম টিম করছে। এদের কথাগুলো বাঁকা বাঁকা। বুঝতে পারে না সে। হাঁ করে চেয়ে থাকে। এক শুনতে আর এক শোনে। বকুনি খায়।

দু-তিন দিন পরে তার বাবা চলে গেলেন। এখানে আপনার বলতে কেউ নেই তার। এদের কাউকে সে চেনে না। এরা কেমন মানুষ জানে না। এরা কি ভালবাসবে? সে ভাবে। যত ভাবে ততই বাবার মুখখানা তার মনের উপর ভেসে ওঠে। মার মুখ, মাসীমার ভালবাসা, সখিসোনার কথা

মনে পড়ে। তার কষ্ট যায় বেড়ে। খিড়কি পুকুরের ঘাটে একলা বসে কাঁদে। আঁচলে চোখ মুখ মুছে ঘরে ঢোকে। পাছে কেউ দেখে ফেলে। কাউকে জানতে দেয় না, বুঝতে দেয় না। এরা কি ভাববে? নিজের মনে নিজে গুমরে মরে। বুক ফেটে যায়, মুখ ফোটে না।

রাত্রে মাটির দোতলা ঘরের মেঝের উপর সে একলা শোয়। কোনদিন সে একলা শোয়নি। মায়ের মৃত্যুর পর সে বাবার কাছে শুতো। বালিশ ভিজে যায় চোখের জলে। সেই অন্ধকারে কেউ দেখে না চোখের জল! গ্রীষ্মকালে তার বিছানায় একখানা ছেঁড়া মাদুর। মশারিটা গামছা দিয়ে তৈরি, মোটা শতছিদ্র। বাঁশ বনের মশা ঝাঁকে ঝাঁকে আসে। কানের কাছে বাঁশি বাজায়। কামড়ে গা ফুলিয়ে দেয়। সে ছটফট করে। শেয়ালের হুক্কা হুয়া রব শোনে। ভয়ে বুক দুর দুর্ করে। দেওয়ালের দিকে সরে যায়।

ভোর হলেই সংসারের কাজ। ঝি চাকর নেই। ঠাকুর ঘর মুক্ত করে। বাসন মাজে। এঁটো থালা বাটি গ্লাস মেজে ধুয়ে সাজিয়ে রাখে রান্নাঘরে। স্নান করে ভেজা কাপড়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে রান্নার জল তোলে। রান্না করে। সকলকে খাইয়ে শেষে নিজে খায়। হেঁসেল পরিষ্কার করে। আবার বাসন-কোসন মেজে ধুয়ে রাখে। বিকেলে গোয়াল ঘরের পিছনে জড়ো-করা কাঁটা বাঁশের শুকনো কঞ্চি কাঠারি দিয়ে কুচোয়। সেগুলি গুছিয়ে রাখে উনুনের ধারে রাত্রির রান্নার জন্যে।

ভোর থেকে রাত্রি পর্যন্ত কাজ। কাজের বিশ্রাম নেই, শেষ নেই। শুধু কাজ—কাজ—আর কাজ। এ বাড়ির কাজ করতে এসেছে সে। কাজ ছাড়া আর কি কাজ ছিল তার? ভবতারিণী বলেছিলেন, বউ এনেছি কাজ করতে। কাজ করবে না তো কি ঠাকুর হয়ে বসে থাকবে? সে নিজে অবাক হয়ে যায়। কোথা থেকে সে শিখেছিল এত কাজ, এমন কাজ? কোথায় পেল সে এত কর্মশক্তি?

পাড়ার গিন্নীরা তার কাজের বিচার করে। মা-বাপ তুলে গাল দিত। এক তরফা বিচার চলে। আসামী তো বোবা। বোবারও শত্রু ছিল এই পোড়া দেশে!

গ্রীষ্মের খরতাপে পুকুরের জল শুকিয়ে যেত। পাড়ার বউরা যেত নদী থেকে জল আনতে। শিবানীও যেত তাদের দলে ভিড়ে। এই সময় তাদের মলিন ওষ্ঠাধরে ফুটে উঠত হাসির রেখা। মেঘে ঢাকা আকাশে বিদ্যুৎ রেখার

মতো। মুখ নেড়ে, হাত ঘুরিয়ে, চোখ তুলে, তারা কি কথা বলত তা তারাই জানত। হয়তো গৃহস্থালির নিছক কাজের কথা, হয়তো শাশুড়ী-ননদের গঞ্জনা আর বকুনি, হয়তো বা নির্যাতনের করুণ কাহিনী। নদীর বালু দিয়ে তারা মাজত জলের ঘড়া। ঘড়াগুলি রূপার মতো ঝক ঝক করত। আবক্ষ জলে বসে তারা দাঁত মাজত, স্নান করত, কাপড় কাচত। এক হাত ঘোমটা টেনে জলভরা ঘড়া নিয়ে চলত যে যার বাড়ির দিকে।

শিবানীর পরনে একখানা মোটা লাল পেড়ে তাঁতের শাড়ি। ট্যাং টেঙে। মাথায় কাপড় টানলে কোন রকমে কান ঢাকা পড়ে না। রামচরণবাবু খান-কয়েক বিয়ের শাড়ি আর জামা দিয়ে গেছেন। ভবতারিণী বললেন, ও সব ভাল শাড়ি জামা তুলে রাখ। পরলে ছিঁড়ে যাবে। নোংরা হবে। সেগুলো তোলাই ছিল। পরা হল না কোনদিন শিবানীর।

গাঁয়ের বউদের মধ্যে যাদের বাপের বাড়ি ছিল তারা বছরে অন্ততঃ এক-বার যেতো হাড় জুড়োতে। শিবানীর বাপের বাড়ি থেকেও ছিল না। মুখ গুঁজে সে সব সহ্য করত।

॥ বারো ॥

শিবনাথ যাবে কলকাতার কলেজে ভর্তি হতে। সৌদামিনীর আনন্দ ধরে না। সযত্নে সাজিয়ে গুছিয়ে দিলেন ছোট ভাইটির জিনিসপত্র। বারো আনা দাম দিয়ে কেনা হল সাধারণ ধরনের একটা টিনের পেটরা। চারখানা ধুতি, তুটো শার্ট, গামছা একখানা, বিছানার চাদর, গায়ের কাপড়, বেণীমাধব গাঙ্গুলীর ডিক্‌সনারি আর তু-চারখানা বই গুছিয়ে রাখা হল। একখানা নতুন শতরঞ্জিতে মোড়া একটি ছোট বিছানার মোট। শিবনাথ রামচরণবাবুর কাছে শুনেছিল, কলকাতা নাকি গাঁটকাটা চোর জোচ্চোরে ভর্তি। ধুতির খুঁটে বেশ শক্ত করে গিঁট দিয়ে সে বেঁধে নিল বড় দিদির পনরোটি টাকা। যেন যখের ধন। শশীবাবু আর সৌদামিনীকে গড় হয়ে প্রণাম করে সে রওনা হল বাসা থেকে। বিপনে চাকর মাথায় তুলে নিল পেটরাটা আর বিছানার ছোট মোটটি। পাঁচ আনা দিয়ে

একখানা থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনে শিবনাথ বসল ষ্টীমারের ডেকের উপর কলঘরের পাশে। ষ্টীমার ছেড়ে দিল। ক্রমে শহরের মাঝখানে দেবী-মন্দিরের সুউচ্চ চূড়ার সোনার কলস অদৃশ্য হয়ে গেল। তার মনটা ভালো নয়। এনট্রান্স পরীক্ষার ফল বার হওয়ার আগে সারদাবাবু তাকে প্যারাডাইস্ লস্টের প্রথম সর্গ পড়িয়েছিলেন। কৈশোরের খেলার স্থানটির দিকে তাকিয়ে সে মনে মনে বলতে লাগল—

Farewell happy fields where joy
for ever dwells :
Hail, horrors, hail !

বড়দিকে ছেড়ে সে আজ চলেছে কোথায় সে জানে না। কলকাতার কোন্ বাড়িতে উঠবে, কোথায় থাকবে জানা ছিল না। সে যেন একটা প্রকাণ্ড অনিশ্চিয়তার গহ্বরে ঝাঁপ দিতে চলেছে।

পাড়াগাঁর পাঠশালা থেকে ইংরেজী স্কুলে পড়তে আসার সময় তার শিশুমন আনন্দে কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। নতুন স্থানে যাওয়ার, নতুন স্কুলে পড়ার, নতুন সঙ্গী পাওয়ার একটা অনির্দিষ্ট অজানা আনন্দের শিহরণ তখন তার মনে নাড়া দিয়েছিল। তার ভয় হয়েছিল সত্য ; কিন্তু তখন সে তার বড়দিদির সঙ্গে যাচ্ছে, তাঁর কাছে তাঁর বাসায় থাকবে, মায়ের মতো আদর-যত্ন স্নেহ পাবে। এই ধারণা তার মনে সান্ত্বনা দিয়েছিল। নতুনকে পাওয়ার ঔৎসুক্যে, অজানাকে জানার আনন্দে ভয়ের ভীষণতার ছবি ম্লান হয়েগিয়েছিল।

এখন সে কৈশোর পার হয়ে যৌবনের দরজায় পা দিয়েছে। তার বুদ্ধির, বিচার শক্তির উন্মেষ হয়েছে। কিশোর মনের ধূসর গোধূলি যৌবনে জ্ঞানোদয়ের অরুণালোকে ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে। বাস্তব জীবনের রূঢ়তা সম্বন্ধে সচেতনতা আনন্দের চেয়ে ভয়ের সঞ্চার করেছে তার মনে। নিশ্চিন্ত সহজ সাবলীল জীবন ভোগ করার তৃষ্ণার স্থানে মহানগরীর বিপুল জনসমুদ্রে ডুবে যাওয়ার ভয়, আর বিরাট বিদ্যায়তনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ আবহাওয়ায় দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা তার মনে একটা অশান্তি সৃষ্টি করেছিল।

মাত্র পনরোটি টাকা সম্বল করে সে আজ চলেছে ঐশ্বর্যের যক্ষপুরী ভারতের রাজধানীতে বিদ্যা অর্জনের উদ্দেশ্য নিয়ে। এ যেন ফুটো নৌকায় চড়ে সাগর পার হওয়ার দুরাশা! বামনের চাঁদ ধরার দুঃসাহস! কে আছে তার সেখানে আপনার বলতে? ব্যয় নির্বাহের প্রতিশ্রুতি কোথায়? মা-বাবার

আশীর্বাদ ছাড়া কিছুই ছিল না তার। রামজয়ের সামান্য তেজারতি কারবার নষ্ট হয়ে গেছে। তাঁর বাগদী খাতকরা এখন সুদ দিতে পারে না। এমন কি আসল টাকাও ডুবে যেতে বসেছে। কংসাবতীতে আর তেমন মাছ জন্মাচ্ছে না। মাছ বিক্রি করে কোন রকমে তাদের সংসার খরচ চলে। ঋণের টাকার জন্য নালিশ করে তাদের ঘরবাড়ি নিলাম করে টাকা আদায় হতে পারে। রামজয় তা পারবেন না। তিনি আদালতের কাঠগোড়ায় কোন দিন ওঠেন নি। জীবনে কোন দিন মিথ্যা বলেন নি। আদালত হাকিম হুকিমের কথা শুনলে তাঁর বুক ভয়ে দুর দুর করে। পেয়াদার লাল পাকড়ি দেখলে তিনি দরজায় খিল দেন। পুলিশ আসছে শুনলে তিনি বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান। ওদের বিশ্বাস কি? ওরা সব করতে পারে।

রামজয়ের হাতের সব টাকা ফুরিয়ে গেছে। ফলারের দক্ষিণা আর সাত বিঘা জমির ভাগ-ধানে কষ্টেসৃষ্টে তাঁর সংসার চলে। শিবনাথকে মাসে দু-একটা টাকা দেওয়াও অসম্ভব তাঁর পক্ষে। শিবনাথের একমাত্র ভরসা শ্যামলের জ্যাঠতুতো ভাই তরুণবাবু। তিনি বলেছিলেন, একবার পাসটা করে তুই আমার কাছে চলে আসিস শিবু। দেখা যাবে'খন। আরে, কপাল ঠুকে একবার কলকাতায় চলে আসতে পারলে হয়। এখানে কেউ না খেয়ে মরে না রে, কেউ না খেয়ে মরে না। কলকাতায় পয়সা উড়ছে। ধরে নিতে জানলে হয়। শিবনাথ বলেছিল—আমার যে ভয় হয়।

—আমরা দূর থেকে সব জিনিসকে ভয় করি, বড়ো করে দেখি। কাছে এসে দেখলে চিনলে আর জানলে ভয় ভয় পেয়ে কোথায় পালিয়ে যায়! জানিস, ভয়ের চেয়ে মানুষের বড়ো শত্রু আর নেই।

—আপনার কথা শুনলে সাহস হয় বটে। টাকার কথা ভাবলে ভয় হয়।

—আরে মা-বোনের আঁচল ছেড়ে একবার বেরিয়ে পড়। দেখবি সব ঠিক হয়ে যাবে। আগে জলে নামতে হবে। তবে সাঁতার শেখা হয়। গামছা গায়ে দিয়ে জলের ধারে বসে থাকলে কি স্নান করা হয়? বেপরোয়া হতে হবে। দুঃখের সম্মুখীন হতে হবে। দেখছিস না এই মাড়োয়ারীগুলোকে? ওরা ঘর ছেড়ে লোটা-কম্বল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। দিনরাত খাটে। কঠোর পরিশ্রম করে। বুদ্ধি খাটায়। শেষে লক্ষপতি হয়।

—আমি তো আর ব্যবসা করতে যাচ্ছি না, লেখাপড়া শিখতে যাচ্ছি। মেস-খরচের টাকা পাব কোত্থেকে? সর্বদা যদি খেটে মরি তো পড়ব কখন?

—হোয়ার দেয়ার ইজ্ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে—ইচ্ছা থাকলেই পথ খুঁজে পাওয়া যায়। আমি তো আছি, ভয় কিসের? নিজের উপর নির্ভর করতে শেখ।

তরুণবাবুর এই কথাগুলি স্মরণ করে সে মনে মনে তরুণবাবুকে প্রণাম জানিয়েছিল। মনটা শূন্য থাকলে যত রাজ্যের চিন্তা তাকে ছুঁচ ফোটায়। সে বেণীমাধব গাঙ্গুলীর ডিকস্‌নারিটা খুলে ইংরেজী কথাগুলির মানে মুখস্থ করতে লাগল।

ষ্টীমার ঘাটে ভিড়ল। তরুণবাবু জেটিতে উপস্থিত ছিলেন। আগে থেকেই একখানা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করা ছিল। শিবনাথকে নিয়ে তিনি কলেজ ষ্ট্রীটের কাছে একটি মেস-বাড়িতে উপস্থিত হলেন। পরদিন শিবনাথ রিপণ কলেজে ভর্তি হল। মাইনে তিন টাকা। একটু অনুরোধ করতেই হাফ্ ফ্রি হয়ে গেল। চেয়ে চিন্তে প্রায় পড়ার সব বই যোগাড় হল। তরুণবাবু বলেছিলেন, এই মাসটা মেসেই থাক। সামনের মাস থেকে তুই ফ্রি বোর্ডিং-এ খাবি আর এখানে থাকবি। এখন তো চার বৎসর নিশ্চিন্তি। একটা টিউসনও যোগাড় করেছি। একটা ফিফ্‌থ ক্লাসের ছেলেকে পড়াতে হবে। মাইনে দশ টাকা।

শিবনাথের আনন্দের সীমা ছিল না। তখন দশ-বারো টাকায় মেসে থাকা আর কলেজে পড়া চলত। শিবনাথ ফ্রি বোর্ডিং-এ ছুবেলা খেয়ে আসে। বড়লোকের বিরাট বাড়ি। সামনে জমিদারীর অফিস। ভিতরে শান বাঁধানো উঠন। তিন দিকে বারো ফুট চওড়া শ্বেত পাথরের বারান্দা। এক দিকে ঠাকুর দালান। ষাট-সত্তরটি ছেলেকে ফ্রি খেতে দেওয়া হত। প্রত্যেকের জন্যে একখানি পিতলের থালা ও জল খাওয়ার জন্যে একটি চুমকি ঘটি। সকাল দশটায় আর রাত্রি নটায় ভাত দেওয়া হত। সরু চালের ভাত। পাত্‌লা কড়াই-এর ডাল। সুন্দরবন চচ্চড়ি! একটুক্‌রো ঝাল-দেয়া মাছ। তেঁতুলের অম্বল। দিনের পর দিন এই ধরনের খাওয়ার একঘেয়ে ব্যবস্থা। তা হোক, এই ভাবে খেয়ে শিবনাথের মতো কত দরিদ্র ছাত্র লেখাপড়া শিখে মানুষ হয়ে গেছে।

রামচরণবাবু মাঝে মাঝে শিবনাথকে দেখে যেতেন। তার পড়ার সুবিধার জন্য একদিন একখানি টেবিল তার ঘরে তিনি রেখে গেলেন। আর্থিক সাহায্য করার সঙ্গতি ছিল না তাঁর। অতীতের

সুখস্মৃতির মোহে তিনি কলুটোলার পুরানো বাসাটাকে আঁকড়ে পড়েছিলেন।

মাস কয়েক পরে একদিন রাত্রি দশটার সময় ব্যারিস্টার-গিন্নীর গোমস্তা শিবনাথের মেসে এসে খবর দিল যে তার শ্বশুরের কলেরা হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি কলুটোলার বাসায় এসে দেখল যে, যে ছোট ঘরটায় বসে অনাথ ও সে গল্প করেছিল তার মেঝের বিছানার উপর তিনি পড়ে আছেন। কেউ ছিল না সেখানে। মাথার দিকে একটা হ্যারিকেন মিটমিট করে জ্বলছিল। পাশে এক শিশি ওষুধ, একঘটি জল ও একটা গেলাস। বিছানার চাদরখানা নোংরা। ভিজে গেছে। শিবনাথকে দেখে যেন একটু আশ্বস্ত হয়ে বললেন, বাবা, আমার মুখে একটু জল দাও। বড় তেষ্টা। তালু শুকিয়ে যাচ্ছে। মুখে জল ঢেলে দিয়ে শিবনাথ তাঁর চাদরখানি বদলে দিল। তাঁর গলা বসে গেছে। মুখ বিবর্ণ। চোখ কোটরে ঢুকে গেছে। নাকটা একটু বাঁকা।

ব্যারিস্টার-বাড়ির গোমস্তা সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল। শিবনাথকে ডাক্তারের ঠিকানা বলে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বালিশের তলা থেকে একটি টাকার থলি বের করে শিবনাথকে দিয়ে রামচরণবাবু বললেন, এই নাও টাকা। ডাক্তারকে দিতে হবে। দু টাকা ফি। রাত্রে চার টাকা নেবে। ওষুধের দামটা দিয়ে দিও।

শিবনাথ ছুটে গেল বউবাজারের একটা গলিতে ডাক্তারের খোঁজে। মাত্র কয়েক মাস হল সে কলকাতায় এসেছে। দু-চারটে বড় রাস্তা ছাড়া অলিগলি চিনত না। তখন রাত্রি বারোটা। রাস্তায় লোকজন নেই। অনেক খোঁজাখুঁজি ঘোরাঘুরি ছোটাছুটি করার পর সে ডাক্তারের বাড়ির হদিস পেল। সামনে গলির মোড়ে একটা গ্যাসের আলো জ্বলছিল। নির্বান্ধব পুরী। চারদিক নিঝুম। যেন দৈত্যের হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেছে! মাঝে মাঝে দূরে বড় রাস্তা থেকে দু-একখানা ছ্যাকড়া গাড়ির চাকার ঘড় ঘড় শব্দ নীরেট জমাট-বাঁধা নিস্তব্ধতাকে ভঙ্গ করছিল। একটা মাতাল টলতে টলতে বকতে বকতে চলেছে। সে কটমট করে শিবনাথের দিকে তাকাল। ভয়ে তার প্রাণ উড়ে গেছে। একটা রুগ্ন পথ-কুকুর তার দিকে পিছন ফিরে যেন অবজ্ঞাভরে চলে গেল। কম্পিত হস্তে সে ডাক্তারের বাড়ির বাইরের দরজায় কড়া নাড়তে লাগল।

কাকস্য পরিবেদনা। কেউ সাড়া দিল না। উঁচু গলায় ডাক্তারবাবুকে ডাকতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে খুট করে শব্দ হল। দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ডাক্তারবাবু শিবনাথের কথা শুনলেন। গোটা কয়েক ওষুধের পুরিয়া মোড়ক করে নিচে ফেলে দিয়ে বললেন, এখুনি একটা পুরিয়া খাইয়ে দিও। একঘণ্টা অন্তর ওষুধ খাওয়াবে। রোগীর হাতে পায়ে খিল ধরে গেলে সেঁক দিও। রোগী কেমন থাকে সকালে জানালে আমি যাব। তিনি ঘরে ঢুকে গেলেন।

ফিরে এসে শিবনাথ দেখল রোগীর হাতে-পায়ে খিল ধরে যাচ্ছে। দেহ বরফের মতো ঠাণ্ডা। সে রোগীর মুখে জল দেয়। সেঁক দেয়। চাদর বদলায়। হাত-পা টেনে ধরে। ময়লা হাত ধুতে বার বার বাইরের উঠনের কলতলায় যায়। জলের ছটছট শব্দ শুনে দারোয়ানের স্ত্রী দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় জিজ্ঞাসা করে, জামাইবাবু আপনার শ্বশুর কেমন আছেন? উপরের তলার কেউ কোন খোঁজখবর নেয় না। গভীর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে সেই দয়াবতী বিদেশিনীর স্নেহমাখা কণ্ঠস্বর দৈববাণীর মতো শিবনাথের একাকিত্বের কঠোরতা অপনোদন করেছিল।

একদিন যারা আপন বলে পরিচয় দিত, তারা এখন কোথায়? যে ব্যারিস্টার-গিন্নী একদিন বড়-ঠাকুর বলতে ভক্তির উচ্ছ্বাসে গলে যেতেন আজ বিসূচিকার বিষ থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য দরজা বন্ধ করে আছেন। রামচরণবাবু আজ একাকী। নিঃসঙ্গ। মৃত্যুপথযাত্রী। প্রাণঘাতী রোগের দুঃসহ যন্ত্রণার ভিতর তাঁর কানে ধ্বনিত হয়েছিল পরপারের ডাক। একদিন তাঁর সব ছিল—ধন, সম্পত্তি, গৃহ, সুন্দরী পতিপ্রাণা স্ত্রী, স্নেহময়ী কন্যা। আজ তারা কোথায়? যারা আপন ছিল তারা ছেড়ে গেছে। যারা পর তারা দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর মৃত্যুর অপেক্ষায় আছে। এই তো সংসার! এই তো মানুষ আর এই তো মানুষের জীবন!

রাত্রিটা যেন বড় হয়ে গেছে। দুঃখের রাত্রি শেষ হতে চায় না। শিবনাথ ক্লান্ত ভীত বিভ্রান্ত। রোগীর প্রাণশক্তি যেন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। কি করবে সে ঠিক করতে পারছিল না। এমন সময় তরুণবাবুর কথা তার মনে পড়ল। ভোর হয়ে এসেছে। একটু পরে শোনা গেল নিকটবর্তী

গাছের ডাল থেকে কা কা রব, বৌবাজারের রাস্তায় ট্রামের ঘড় ঘড় শব্দ আর ঘণ্টাধ্বনি। রোগীর মুখে আর এক পুরিয়া ওষুধ ঢেলে দিয়ে শিবনাথ ছুটল শ্যামবাজারে তরুণবাবুর মেসে। তার ডাক শুনে তরুণবাবু ঘুম থেকে উঠে বসলেন। শিবনাথের কথা শুনে বললেন, সারারাত্রি একা কলেরা রোগীর শুশ্রূষা করে তোর চোখ বসে গেছে। তুই এখানে থেকে বিশ্রাম কর। কাপড় ছেড়ে হাতমুখ ধুয়ে কিছু খেয়ে আমার বিছানায় ঘুমো। তুই চিন্তা করিস্ নে। আমরা চার-পাঁচ জন এখনি যাচ্ছি। দেখি কি করতে পারি।

এই বলে চার-পাঁচ জন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র সঙ্গে নিয়ে তিনি কলুটোলার বাসায় উপস্থিত হলেন। রোগীর অবস্থা খুব খারাপ। এখনি স্যালাইন দেওয়া দরকার। তাঁরা রামচরণবাবুকে বার বার অনুরোধ করলেন তাঁদের সঙ্গে হাসপাতালে যেতে। তাঁদের কলেজের হাসপাতাল। ডাক্তার ওষুধ সেবা শুশ্রূষার কোন ত্রুটি হবে না। রামচরণবাবু কপালে হাত ঠেকিয়ে জানালেন, যা হয় এখানেই হোক্। তিনি হাসপাতালে মেথরের হাতে জল খেয়ে মরতে চান না। ছেলেরা নিরুপায়। তাদের সঙ্গে যা কিছু ওষুধ ছিল তা দেওয়া হল। কিছুই হল না। ঘণ্টা দুই-এর মধ্যেই তাঁর জীবন-প্রদীপ নিভে গেল। শেষকৃত্য সমাপন করে তারা মেসে ফিরে এল বিকেল বেলা।

॥ তেরো ॥

রামচরণবাবুর মৃত্যুর কয়েক দিন পরে গ্রীষ্মের ছুটিতে শিবনাথ বাড়ি গেল। মৃত্যু-সংবাদ ইতিপূর্বেই সেখানে পৌঁচেছিল। এর জন্য ও-বাড়ির কেউ শোক বা দুঃখ করেনি। শোক করবেই বা কেন ? মানুষের জন্ম-মৃত্যু তো একটা অতি সাধারণ ব্যাপার। অতি সামান্য ঘটনা। প্রতি মুহূর্তে পৃথিবীতে কত লোক আসে আর চলে যায়। এরা তো সকলে জায়স্ব ম্রিয়স্বের দলে। গাদার মড়ার জন্যে কে শোক করে ? এদের জন্যে দুঃখ কেন ? কিন্তু ভালবাসার কাছে কি তাই ? বাপের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে শিবানীর কি মনে হয়েছিল কেউ জানে না। জানবার বিশেষ কোন প্রয়োজন ছিল না। হয়তো রাত্রির অন্ধকারে নির্জন ঘরের ছেঁড়া মাদুরের বিছানায় শুয়ে সে

উদয়াস্ত গৃহস্থালির কাজে নিজেকে আরও বেশী ডুবিয়ে দিয়ে তার তপ্ত অশ্রুস্রোত নিরুদ্ধ করে দিয়েছিল। হয়তো দুঃখের দাবদাহে অশ্রু-নির্ঝর শুকিয়ে গিয়ে তার স্বভাব-কোমল হৃদয়খানাকে শুষ্ক কঠিন মরুভূমিতে পরিণত করেছিল। কে তার খোঁজ খবর রাখে?

কিন্তু নিয়তির এ কি নিষ্ঠুর পরিহাস! বিধির দুর্জ্ঞেয় বিধানে অজ্ঞাতসারে দুজনের মধ্যে যেন স্থান বিনিময় হয়েছিল। ঘটনাচক্রের আবর্তনের ধাক্কায় তারা দুজন যেন দুদিকে ছিট্‌কে পড়েছিল। আলো-ঝলমল জনবহুল মহা-নগরীর বুক থেকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে শিবানী পড়েছিল মেদিনীপুর জেলার সুদূর পল্লীর অকরুণ পরিবেশে। পল্লীর সুপরিচিত বেষ্টনী থেকে শিবনাথ পড়েছিল কলকাতার জনারণ্যে, আনন্দমুখর ঐশ্বর্য-পরিবেষ্টিত অভাবের মধ্যে। নিজের বলতে কেউ ছিল না শিবানীর। সেখানে সঙ্গী হয়েছিল তার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, তীব্র কটু বকুনি। কলকাতায় শিবনাথের সাথী হয়েছিল অভাব-দারিদ্র্য আর ছেলে-পড়ানোর একঘেয়ে কাজ। ভগবান কি দুঃখকে তুলাদণ্ডে ওজন করে তাদের দুজনের মধ্যে সমান অংশে ভাগ করে দিয়েছিলেন? তাদের মধ্যে স্থান বিনিময় হয়েছিল মাত্র। দুঃখভোগে তারা ছিল সমধর্মী।

কিন্তু অতি বড় দুঃখের মধ্যেও মানুষ দেখতে পায় আশার ক্ষীণ রশ্মি-রেখা। পৃথিবীর সবটাই তো আর শুষ্ক নয়! এখানে মরুভূমির বুক চিরে স্নিগ্ধ স্রোতের ধারা নির্গত হয়। ঊষর প্রান্তরের মধ্যে উদ্যান রচিত হয়। এক দিকে শোক-দুঃখ, অন্য দিকে সুখ-আনন্দ। এক দিকে ক্রন্দন-ধ্বনি, অন্য দিকে আনন্দ-কলরোল। জীবন একটানা সুখ নয়, আবার নিরবচ্ছিন্ন দুঃখও নয়। সুখ-দুঃখের, হাসি-কান্নার, অভাব-প্রাচুর্যের অপরূপ মিলনের দুর্বোধ্য রূপ এই জীবন। কলকাতায় ছাত্র-জীবনের দুঃখ-দারিদ্র্যের কঠোর তাড়নার মধ্যে শিবনাথ পেয়েছিল তরুণবাবুর মতো আরও দু একটি অকৃত্রিম বন্ধুর অযাচিত সহানুভূতি, দরদ, অর্থ-সাহায্য, প্রাণ-ঢালা ভালবাসা। তা কোনও দিন ভুলবার নয়।

শ্বশুরঘর করতে যাওয়ার কিছুদিন পরে শিবানীরও একটি সঙ্গিনী জুটেছিল। তার নাম চঞ্চলা। শ্যামাচরণের মেয়ে। শিবানীর চাইতে এক বছরের ছোট। বউদিদির সুপারিশের জোরে তাঁর ছোট ভাই-এর সঙ্গে সে নিজের মেয়েটির বিয়ে দিয়েছিল। শিবানীর চেয়ে চঞ্চলার রঙ ফরসা। দেহের গড়ন শক্ত। দেখতে নেহাৎ মন্দ নয়। খাঁটি পাড়াগাঁর দুরন্ত মেয়ে। গাছ-কোমর

বেঁধে বেটা ছেলের মতো দৌড়ঝাঁপ করে। পুকুরের জলে সাঁতার কাটে। শালুক ফুল তুলে আনে। গাছে উঠে। ফল পাড়ে। দাপাদাপিতে পাড়া কাঁপিয়ে তোলে। অমন দজ্জাল মেয়েকে বউ করতে রামজয় প্রথমে রাজি হননি। কিন্তু অর্থনীতি ও বাস্তব দৃষ্টি তাঁর অনিচ্ছার প্রতিকূল হয়েছিল। তিনি বড় মেয়ের অনুরোধ এড়াতে পারেন নি।

চঞ্চলা নামে যেমন প্রকৃতিতেও তেমনি ছিল। সে মনে মনে শিবানীকে ঘৃণা করত। তার বাপের বাড়ি নেই। আপনার বলতে তার কেউ ছিল না। সে গরীবের মেয়ে। এ কথা চঞ্চলা জানত এবং জানত বলে সে শিবানীকে কৃপার চক্ষে দেখত। চঞ্চলার মা বাপ জ্যাঠা জ্যাঠাই ভাই ছিল। তার বাপের বাড়ির অবস্থা ভালো। তার জ্যাঠার বাসায় থেকে, খেয়ে এক ভাই পাস করে কলেজে পড়ছে। এখনও আর এক ভাই সেখানে থাকে। তার বাপের বাড়ির ফেন চেটে তারা মানুষ। এই হীন ধারণা এইটুকু মেয়ের মনে স্থান পেয়েছিল। এই মনোভাব তাকে গর্বিত আর শিবানীর প্রতি অহেতুক ঈর্ষান্বিত করে তুলেছিল। ছোট বউ-এর কথা উঠলে রামজয় চুপ করে থাকতেন। ভবতারিণী উচ্চবাচ্য করতেন না। টুঁ শব্দটি শুনলে তার মা দৌড়ে আসত। বেয়ানের সঙ্গে কোমর বেঁধে ঝগড়া করত। যা-তা বলে অপমান করত। শ্যামাচরণ হৈ-চৈ করে গাঁ মাতিয়ে তুলত।

চঞ্চলা কাকেও ভয় করত না। কারোর তোয়াক্কা রাখত না। মুখরা ডানপিটে মেয়ে। শিবানীর স্বভাব ঠিক উল্টো। নিরীহ ভালো মানুষ। গোবেচারী। তবে ধীর স্থিরবুদ্ধি ভীরু। সে সকলের কথা শুনত। সকলের আদেশ মেনে চলত। মুখে রা ছিল না। যেন বোবা। দশ বছর বয়সে এই সংসারে আসা অবধি দুঃখের যে ঝড় তার মাথার উপর দিয়ে বয়ে চলেছে, তার ফলে এবং শোকের হিমশীতল পাথরের চাপে তার হৃদয়ের বালিকা-সুলভ আনন্দ-ধারা নির্গমনের পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে।

দিন যায়, রাত আসে। সূর্য উঠে আর ডোবে। শীতের পর বসন্ত আসে। কিন্তু তার দিন সমানে চলে। তার রাত সমানে কাটে। তার ঋতুর পরিবর্তন ছিল না। সে যে-তিমিরে, সে সেই তিমিরেই ছিল।

তবু এ বাড়িতে ছোট বউ-এর আসার পর শিবানী একটি সমবয়সী সঙ্গী পেয়েছিল। কথা বলার একটি মানুষ পেয়েছিল। এতদিন সে নিঃশব্দে কাজ করে গেছে। শুধু কাজ আর কাজ। সকালে দুপুরে বিকেলে সন্ধ্যায়

তার কাজ ছাড়া ছিল না। কথা বলবার দরকার ছিল না। সে বোবা হয়ে গিয়েছিল। যেন কথা বলতে ভুলে গিয়েছিল। রামজয় ছোট বউ-এর কথা মুখে আনতেন না। ভবতারিণী তাকে ভয় করতেন। কোন কাজ করতে বলতেন না। বড় লোকের বেটী। ঝগড়াটে মা। কুচক্রী বাপ। বাপের বাড়ির গর্বে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করত। সে তো বউ নয়। কথা শুনবে কেন? গৃহস্থালির কাজ-কর্ম করবে কেন? গরীব শ্বশুরের সেবা-যত্ন করবে কেন? এ বাড়ির কারোর কাছে সে মাথা হেঁট করবে কেন? রামজয় তো ভেবে ভেবে কাঠ হয়ে গিয়েছিলেন। জোঁকের মুখে নুন পড়ার মতো ভবতারিণীর অবস্থা।

একদিন ভবতারিণী রামজয়কে বললেন, কি বউ নিয়ে এলে? একে নিয়ে ঘর করা চলে না।

রামজয় বললেন, জেনে-শুনে বাধ্য হয়েই এনেছি। দারিদ্র্য মহাপাপ। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা তো চাই।

—এর চেয়ে বড় বউ ঢের ভালো। মুখে কথাটি বলে না। মাথা গুঁজে কাজ করে যায়। আজকাল কিছু বলতে হয় না, বক্‌তে হয় না। দশ বছরের একরত্তি মেয়ে নিজেই সব করে।

—এখন বোঝ। তার বাপ স্ত্রীর অসুখের সময় মেয়ের দু থান গয়না বিক্রি করেছিল বলে তুমি বড় বউকে কত গঞ্জনা দিয়েছ। এমন কি বেচারীকে মারতেও ছাড়নি। তার দোষ কোথায়? বাপ গয়না নিল, আর মেয়ে মার খেল! উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে। ষাঁড়ে ধান খেল, আর মুচি বাঁধা পড়ল।

—বাপ মেয়ের গয়না বিক্রি করে দিয়েছে, এমন লোক তো আমি দেখিনি!

—'আতুরে নিয়মো নাস্তি'। বিপদের সময় মানুষ কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। রামচরণবাবু বেঁচে থাকলে তিনি মেয়ের গয়না নিশ্চয় গড়িয়ে দিতেন। তাঁকে আমি চিনতাম। অমন নিরীহ ভালো লোক খুব কম দেখেছি।

ভবতারিণী নিরস্ত হলেন। ইদানীং শিবানীর উপর তাঁর মায়া পড়ে গিয়েছিল। শাশুড়ীপনার ঝাঁজ কমে গিয়েছিল। মা-বাপ-হারা মেয়েটিকে তিনি আর গালমন্দ দিতেন না। তাকে নিজের মেয়ের মতো দেখতে লাগলেন।

॥ চৌদ্দ ॥

পাহাড়ের সানুদেশ বেয়ে আসে স্রোতের ধারা। প্রবল জলোচ্ছ্বাসের তাড়নায় এবড়োখেবড়ো ছুঁচপানা তীক্ষ্ণ-মুখ ছোট বড় অসংখ্য নুড়ি পরস্পর ঘষাঘষি করে মসৃণ হয়। শিবানী ও চঞ্চলার প্রকৃতির মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ থাকলেও কাঁচা বয়সের গুণে আর ঘনিষ্ঠ মেলামেশার টানে তাদের প্রকৃতি কতকটা গড়ে উঠতে লাগল সমভাবে।

দুপুরে রামজয় কোন দিন ঘুমোতেন না। গৃহস্থালির টুকিটাকি কাজে ব্যস্ত থাকতেন। বৈশাখের অলস বেলায় ভবতারিণী ঢেঁকিশালের দাওয়ায় মাছুরের উপর বালিশ মাথায় দিয়ে শুয়ে পড়তেন। শিবানী তাঁর মাথার পাকা চুল তুলে দিত, আর বেগুন বাড়িতে পাহারা দিত। একঘেয়ে কাজে ক্রমে তার চোখের পাতা ছুটি ঘুমে জড়িয়ে আসত। তখন সে নিদ্রিতা শাশুড়ীর পাশে স্থান করে নিত। ছোট বউ-এর আসা অবধি তার চোখে আর ঘুম আসে না। পাকা চুল তোলার আরামে ভবতারিণী যখন নাক ডাকিয়ে অঘোরে ঘুমিয়ে পড়তেন, তখন শিবানী তাঁর পাশ থেকে সুড়সুড় করে উঠে পা টিপে টিপে জামরুল গাছের তলায় চঞ্চলার কাছে হাজির হত। গাছ-কোমর বেঁধে চঞ্চলা গাছে উঠে পাকা পাকা জামরুল পেড়ে নিচে ফেলত। ফল কুড়িয়ে শিবানী কোঁচড় ভর্তি করত। তারা আঁকশি দিয়ে নোনা আতা পাড়ত। বাঁশের লগি দিয়ে খেজুর ঝাড়াত। নুন আর কাঁচা লঙ্কা মেখে টোকো আম আর আমড়ার চাটনি খেত। পাশে পোড়ো ভিটার ভাঙ্গা কাঁথড়ার এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করত। আইলের সীমায় মোটা তেঁতুল গাছটার পিছন দিয়ে, পুকুরপাড়ের বাঁশবাগান পেরিয়ে, আর শেয়াকুল ঝোপের পাশ কাটিয়ে তারা চোর চোর খেলত। তাদের মাথার আর বুকের কাপড় খুলে যেত। চুলগুলি এলোমেলো হয়ে ঝুলত। মুক্তার মতো বিন্দু বিন্দু ঘাম তাদের গাল বেয়ে ঝরে পড়ত।

কোন দিন তারা ঘোড়ার খেলা করত। মালকোঁচা বেঁধে দু হাত আর দু হাঁটুর উপর ভর দিয়ে শিবানী ঘোড়া সাজত। চঞ্চলা তার পিঠের উপর বসে চাবুক মারতে মারতে ঘোড়া চালাত। শক্ত মাটিতে লেগে শিবানীর হাঁটু আর হাতের তালু কেটে যেত। কখনও তারা বর-কনে খেলা করত। শিবানী কনে সাজত। সে কাঠমল্লিকা ঘেঁটু কুড়চি আর কল্কে ফুলের মালা

পরত। খোপায় টগর ফুল গুঁজে দিত। উপর আর নিচের হাতে বেল ফুলের গয়না পরত। গলায় বন-ফুলের মালা, কপালে আর গালে চন্দনের ছিটে দিয়ে চঞ্চলা বর সাজত আর পিঁড়ির উপর বসে বিড় বিড় করে মন্ত্র পড়ত।

তখন রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। খেলা শেষ করে চঞ্চলা বলল, দিদি! বড় গরম লাগছে। চল, ভট্চাযদের পুকুরে সাঁতার কেটে আসি। স্বভাব-ভীরু শিবানী সাঁতার জানত না। জলকে সে ভয় করত। সে ইতস্ততঃ করছে দেখে চঞ্চলা বলল, তোকে জলে নামতে হবে না, তুই শুধু দাঁড়িয়ে দেখবি আমি কেমন সাঁতার কাটতে পারি। বনফুলের ঝোপ, টোপা কুলের গাছ, বনকচুর বন, আনারসের ঝাড়ের ভিতর দিয়ে কাঁটা বাঁশের কঞ্চির বেড়া ফাঁক করে তারা এল জলের ধারে। 'এখানে তুই দাঁড়া', এই কথা বলে চঞ্চলা ঝাঁপিয়ে পড়ল সেই এঁদো পুকুরের কালো জলে। কলমীর লতা সরিয়ে আর কচুরীপানার বেগুনী রঙের ফুলগুলোর ভেতর দিয়ে এগিয়ে চলে চঞ্চলা মাঝ পুকুরের দিকে। কি চমৎকার ডুব সাঁতার দেয় চঞ্চলা! একরাশ কোঁকড়া কোঁকড়া চুলশুদ্ধ মাথাটা সমেত জলের তলায় লুকিয়ে পড়ে। শিবানী অবাক হয়ে দেখে! চঞ্চলাকে মনে মনে তারিফ করে।

একটা অদ্ভুত আনন্দের রেশ নিয়ে বাড়ি ফিরে এল তারা। উঠনে পা দিয়েই কেমন একটা অস্বস্তির মধ্যে পড়ে গেল। চারদিকে যেন একটা থমথমে ভাব। বড় ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলেন রামজয়। রান্নাঘরের দাওয়ায় দাঁড়িয়েছিলেন ভবতারিণী। ভয়ে ভয়ে তাঁর পাশে দাঁড়াল শিবানী। চঞ্চলার দিকে তাকিয়েই ভবতারিণী বললেন, ও কি গো? জলে পড়ে গিয়েছিলি নাকি?

শিবানী ভবতারিণীকে রান্নাঘরের ভিতরে ডেকে নিয়ে কি যেন বলতে চঞ্চলা শক্ত গলায় বললে, কি হয়েছে তাতে?

তিনি রেগে গরগর করতে লাগলেন। রামজয় বাইরে চলে গেছেন।

ভবতারিণী বললেন, অত বড় ধেড়ে মেয়ে জলে পড়ে গেলি? ডুবে মরলে যে আমার হাতে দড়ি পড়ত। চঞ্চলার উগ্র মূর্তি দেখে ভবতারিণী চুপ করে গেলেন। তাঁর মুখের কথা মুখেই রয়ে গেল।

রাত্রে তারা এক বিছানায় শুত। চঞ্চলা বলত, দিদি! এখন তুই পাখার বাতাস কর। আমার পালা শেষ রাত্রে। শেষ রাত্রে বাতাস খাওয়ার লোভে শিবানী তাকে বাতাস করত। তারপর দুজনে ঘুমিয়ে পড়ত।

কে আর কাকে বাতাস করবে ? এই ভাবে রোজ তাদের খেলা চলত। খেলার ভিতর চঞ্চলার হুষ্টু বুদ্ধির খেলা চলত। শিবানী তা বুঝতে পারত না। সে নির্বিবাদে সব সয়ে যেত।

চঞ্চলার উর্বর মস্তিষ্ক রোজ নতুন খেলা উদ্ভাবন করত। একদিন হুপুর বেলা তারা ঘোষালবুড়ীর রান্নাঘরের বাঁশের আগড় খুলে তার হাঁড়ির পান্তা ভাত আর মোরলা মাছের অম্বল চচ্চড়ি খেয়ে এসেছিল। বুড়ী পাড়া বেড়িয়ে বাড়ি ফিরে এসে রান্নাঘরের আগড় খোলা দেখে আঁত্‌কে উঠেছিল। ঘরে ঢুকে দেখে কে তার হাঁড়ির পান্তা ভাত আর শিকেয়-তোলা মালসার মাছের টক খেয়ে গেছে। একটু আগেই চোর হুটি পগারপার হয়েছিল। মুখ মুছে হাত-পা ধুয়ে কাপড়-চোপড় গোছ-গাছ করে নিতান্ত ভালো মানুষের মতো তারা খিড়কি দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকেছিল। শিবানী ভিতরের উঠন ঝাঁট দিতে লেগে গেল। চঞ্চলা কি একটা কাজে ব্যস্ত ছিল। ঘোষালবুড়ীর চিৎকারে ভবতারিণীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন। ঘোষালবুড়ীকে সামনে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে, মকর ? অত চেঁচাচ্ছ কেন ?

—আর কি হয়েছে ? আমার সর্বনাশ হয়েছে ! আমার রান্নাঘরের বাঁশের আগড় খুলে তোর বউরা হাঁড়ি উজাড় করে পান্তা ভাত খেয়ে গেছে। শিকে থেকে খোলা নামিয়ে মাছের অম্বল-চচ্চড়ি শেষ করেছে। কাঁচা তেঁতুল দিয়ে মোরলা মাছের টক-চচ্চড়ি রেঁধে রেখেছিলাম। হায় ! হায় ! আমার কি হল ! চাষীপাড়ার বিপিন সাউ-এর বউ মোরলা মাছ দিয়েছিল। টক-চচ্চড়ি দিয়ে পান্তা ভাত খাওয়ার জন্যে তাকে নেমন্তন্ন করেছিলাম।

ঘোষালবুড়ী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। ভবতারিণী ধীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, আমার বউরা যে খেয়েছে তা তুমি কি করে জানলে ?

—বিকেল বেলা পান্তা ভাত খেতে চোর কি বিদেশ থেকে রেল ভাড়া করে এসেছিল ? এ ভাই, তোর ছোট বউ-এর কাজ। এক গলা গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে হলফ করে বলতে পারি, তোর ছোট বউ ছাড়া এ আর কোন চোর নয়। কই, তোর বড় বউ তো এত দিন ঘর করছে। তার নামে কেউ কোন দিন কিছু বলতে পারেনি। শ্যামার ঐ ধিঙ্গী মেয়ে ছাড়া এমন ছিষ্টিছাড়া কাজ কে আর করবে বল ?

ভবতারিণীর কাছে ঘোষালবুড়ীর নালিশ, তর্জন-গর্জন শুনে শিবানীর বুক

ভয়ে দুর্‌দুর্‌ করছিল। তার হাতের ঝাঁটা হাতেই রইল। জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দেবে ঠিক করতে পারছিল না। চঞ্চলার কিন্তু হেলদোল ছিল না। ঘোষালবুড়ী বলল, ডাক না ওদের, ওই তো ওদের উঠনে দেখতে পাচ্ছি! ভবতারিণী তাদের ডাকলেন। চঞ্চলা এগিয়ে এসে বলল, শকুনি মাগী নালিশ করতে এসেছে? বামুন-ঘরের বিধবা মাছ খেয়ে মরে, তার আবার নালিশ! লজ্জা করে না এ কথা লোকের কাছে বলতে?

ঘোষালবুড়ী রাগে গরগর করতে করতে বলল, আমি মাছ খাই কি না খাই, তোর বাবার কি লা ছুঁড়ি? উনি আমার শাসনকর্তা এসেছেন! আ মলো। চঞ্চলা সমানে উত্তর দিতে লাগল। বলল, আমাকে বড় বউ পাসনি যে, আমার নামে যা-তা লাগিয়ে মার খাওয়াবি। আমি এই গাঁয়ের মেয়ে। তোর গুণ-বিত্তের কথা আর জানতে বাকি নেই। যা, যা, বেশী বাড়াবাড়ি করলে হাটে হাঁড়ি ভেঙ্গে দেব।

চঞ্চলার কথা শুনে ঘোষালবুড়ী একটু সংযত হয়ে বলল, শুনলি ভাই, তোর ছোট বউ-এর কথা? তারপর চঞ্চলার দিকে চোখ পাকিয়ে বলল, ঐটুকু মেয়ে, নাক টিপলে দুধ বেরোয়। তার কথা শোন। যত বড় মুখ, তত বড় কথা! চুপ কর, হারামজাদী। শিবানীর হাত থেকে খপ করে ঝাঁটাটা কেড়ে নিয়ে চঞ্চলা ঘোষালবুড়ীকে তাড়া করে ছুটে এসে বলল, দাঁড়া তো, বুড়ী, ডাইনী মাগী! ঝাঁটা মেরে বিষ ঝেড়ে দেব।

ঘোষালবুড়ী ছুটে পালাতে পথ পেল না। একরত্তি মেয়ের বিক্রম দেখে ভবতারিণী অবাক। শিবানী ভয়ে জড়সড়। তার বুক ঢিপ ঢিপ করছিল। চঞ্চলা ঝাঁটাটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে মায়ের কাছে ছুটে গেল।

॥ পনরো ॥

শিবনাথ এখন স্কটিশ চার্চ কলেজের বি. এ. ক্লাসের ছাত্র। মাইনে ছ টাকা। এক ভদ্রলোক প্রতি মাসে এই টাকা সাহায্য করতেন। তাঁর বাংলা নাম অমূল্য বসু। চাকরি স্থলের ইংরেজী নাম এ. ভোস্‌। এঁর বাড়ির পুরোহিতের সুপারিশে ইনি শিবনাথের কলেজের মাইনেটি দিতেন।

এ. ভোস্‌ ছিলেন একখানি ইংরেজী পত্রিকার সম্পাদক। সাহেবী

পোষাক। এণ্টালির ফিরিঙ্গী পাড়ায় বাসা। ফিরিঙ্গী নামেই পরিচিত। অন্দরে মেয়েরা শাড়ি পরত, গাউন পরে ফিরিঙ্গীদের বাড়িতে যেত, আর বিকৃত টানে ইংরেজীতে কথা বলত। এদের খোলস বিদেশী। হাড়ে হাড়ে বাঙ্গালী হিন্দু। এরা ঘরে ডাল-চচ্চড়ি-ভাত খেত। ষষ্ঠী, মাকাল, শীতলা, সরস্বতী, শালগ্রাম ঠাকুরের পূজায় উপোস করে থেকে পুষ্পাঞ্জলি দিত।

ট্যাশ পরিচয় দিয়ে এ বাড়ির ছেলেরা রেলে, ডকে, পোর্ট কমিশনারের অফিসে মোটা মাইনের চাকরি জুটিয়ে নিত। এদের বাড়িতে প্রতি পূর্ণিমায় সত্যপীরের শিন্নি হত। কর্তা বি.এ. পাস। ছেলেরা সাহেবদের স্কুলে সাহেবী কেতা আদব-কায়দা শিখত। ইংরেজীতে অনর্গল কথা বলতে পারত। তারা পাস-পুষার ধার ধারত না। ইংরেজের যুগে আদব-কায়দা আর ট্যাশ উপাধির জোরে এদের চাকরি হত। এরা মিথ্যা আবরণ টেনে জাত ও ধর্ম চাপা দেওয়ায় সুকঠিন কৌশলটা এমন নিখুঁতভাবে আয়ত্ত করেছিল যে, তা দেখে শিবনাথ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল!

শিবনাথ তখন ফোর্থ ইয়ারে পড়ে। একদিন সকালে হঠাৎ তরুণবাবু শিবনাথের কাছে উপস্থিত হলেন। বললেন, দ্যাখ্ শিবু, আর. জি. করের কলেজ থেকে তো ফাইন্যাল পরীক্ষায় পাস করলাম। পাড়াগাঁয়ে ডাক্তারি করা আমার পোষাবে না। অমন রোগীর বাড়ির লাউ-কুমড়ো, কলা-মূলো বেগুনটা নিয়ে চিকিৎসা করতে পারব না। জানিস তো প্রতি গ্রামেই দু একজন হাতুড়ে ডাক্তার আছে। তাদের হাতে রাখতে না পারলে পাস-করা ডাক্তারের 'কল' পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। চার বছর পড়াশুনা করার পর ভেরেণ্ডা ভাজতে পারব না। আমি কলকাতায় ডাক্তারি করতে চাই। বিলিতী টাইটেল না থাকলে কোন ডাক্তার কলকাতায় কল্কে পায় না। আমাকে বিলেত যেতেই হবে। এডিনবরা থেকে এম. আর. সি. পি. উপাধি নিতেই হবে।

শিবনাথ বলল, তা তো হবে। ওখানকার খরচ চালাবেন কি ভাবে? আপনার বাবা টাকা দেবেন?

—না, তিনি সাফ জবাব দিয়েছেন। টাকা দেবেন না।

—তাহলে?

—কি আর করব? মেজদা অতি কষ্টে শ পাঁচেক টাকা যোগাড় করেছেন।

—পাঁচ শ হলে চলবে ?

—পাঁচ শ টাকা হলে আপাততঃ চলবে।

—তারপর ?

—ডেক প্যাসেঞ্জার হয়ে যাব। এডিনবরোয় থাকা ও খাওয়ার খরচ মাসে পঁচাত্তর টাকা। মাস ছয়েক তো চলবে। ইতিমধ্যে একটা কিছু চাকরি-বাকরি যোগাড় করে নিলে হবে। বিলেতে চাকরি করতে করতে অনেক ছেলে পড়াশুনা করে।

—তা তো করে। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের উপর এতখানি নির্ভর করে বিদেশে যাবেন ?

—উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে হলে কপাল ঠুকে কাজ করতে হয়। No venture, no gain.

—বাবাকে জানিয়ে যাবেন তো ?

—না।

—তিনি কি বলেছেন ?

—তিনি বলেছেন, বিলেত গেলেই কি গরু মানুষ হয় ? দেখ না, তোর মেজদা ব্যারিস্টারি পাস করে এসে হাইকোর্টে ভেরেণ্ডা ভাজছে। আমি ওকালতি ছেড়ে দিয়েছি। আমার এত পয়সা নেই যে, তোমাদের খেয়াল মেটাবার জন্যে খরচ করতে পারি। ওসব কথা থাক। আমি আর কিছু টাকা যোগাড়ের একটা উপায় ঠিক করেছি। আমাদের দেশের অনেক ছেলে কলকাতায় মেসে থাকে। তাদের মধ্যে অনেকের অবস্থা ভাল। ইচ্ছে করলে ওরা প্রত্যেকে আমাকে বিশ-পঞ্চাশ টাকা ধার দিতে পারে। আর শ তিনেক টাকা হলেই চলবে।

—ধার শোধ করবেন কবে ও কি রকমে ?

—আমার চলে যাওয়ার পর বাবাকে বললে তিনি নিশ্চয় ওদের ধার শোধ করবেন, আর যদি নাই-ই দেন, আমি বিলেতে চাকরি করে ওদের টাকা পাঠিয়ে দেব। যদি তুই ওদের বলিস যে আমি চলে গেলে তুই বাবার কাছ থেকে টাকা নিয়ে ওদের দিয়ে দিবি, তাহলে ওরা নিশ্চয়ই টাকা দেবে। তোকে বাবা ভালবাসেন আর বিশ্বাসও করেন।

তরুণবাবু শিবনাথের পরম হিতৈষী। সুতরাং তাঁর এই অনুরোধ রক্ষা করে শিবনাথ তাঁর ঋণ কতকটা শোধ করতে চেয়েছিল। দুজনে বেরিয়ে

পড়ল। মেসে মেসে ঘুরে ছেলেদের সঙ্গে দেখা করল। মাসের প্রথম। সকলের কাছেই টাকা ছিল। অনেকেই বিশ-পঁচিশ টাকা ধার দিল। দু-চারজন আরও বেশী দিল। প্রায় পাঁচ ছ শ টাকা যোগাড় হল। শিবনাথ খুশী। তরুণবাবু কৃতজ্ঞ। তাঁর জীবনের সাধ পূর্ণ হওয়ার উপায় হল।

তরুণবাবুকে বিদায় দেবার জন্য ছেলেরা চাঁদপাল-ঘাটে উপস্থিত হল। গঙ্গার ধার থেকে একটু দূরে ইংলণ্ডগামী জাহাজখানি নঙ্গর করে দাঁড়িয়েছিল। তার বড় বড় দুটি চোঙ থেকে কৃষ্ণবর্ণ ধূমরাশি কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছিল। মাঝে মাঝে তার বাঁশির গম্ভীর হুঙ্কার যেন বরুণ রাজার নীল রাজ্য আক্রমণের সূচনা করছিল। অন্য যাত্রীদের সঙ্গে তরুণবাবু জেটিতে বাঁধা ছোট স্টীমারখানিতে উঠলেন।

স্টীমারের উপরের তলায় রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে তিনি নদীর তীরে ছেলেদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। ছোট স্টীমারখানির কাছি খুলে গেল। চাপা সংযমের শাসন ভেদ করে দর্‌দর্‌ ধারে অশ্রুস্রোত তাঁর গণ্ডস্থল প্লাবিত করে দিল। হাত তুলে তরুণবাবু বন্ধুদের শেষ অভিবাদন জানিয়ে রুমালে মুখ-চোখ মুছতে লাগলেন।

কলকাতা আর লণ্ডনের মধ্যে যত বন্দরে জাহাজ ধরেছে, সেখান থেকে তিনি শিবনাথকে চিঠি দিয়েছেন। হুগলী পয়েণ্ট, ডায়মণ্ডহারবার, কলম্বো, এডেন প্রভৃতি স্থান থেকে পোস্টকার্ডে এবং লণ্ডন এডিনবরো থেকে তরুণবাবু পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বহু চিঠি লিখতেন। সে চিঠিগুলিতে শিবনাথের প্রতি ভালবাসা ও অন্য ছেলেদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেন। তাঁর বাবা তাঁর ঋণ শোধ করেছেন কিনা, যদি না দিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি ঋণ শোধের ব্যবস্থা করছেন ইত্যাদি নানা কথা ও কুশলবার্তা ফলাও করে লিখতেন।

যত দিন যেতে লাগল, তত তাঁর চিঠি কম আসতে লাগল। ক্রমে চিঠি আসা বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর আর কোন খোঁজখবর পাওয়া গেল না। তাঁর যাওয়ার বছর দুই পরে দেশের দু-একজন বন্ধু ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেত গিয়েছিল। তারা শিবনাথের কাছ থেকে তরুণবাবুর ঠিকানা জেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেষ্টা করেছিল। কেউ তাঁর কোন হদিস না পেয়ে নিরস্ত হয়েছিল। তারা লিখেছিল, তরুণবাবু ইংলণ্ডে নেই। তখন প্রথম মহাযুদ্ধ চলছিল। তাঁর স্ত্রী বলল, তিনি যুদ্ধের ডাক্তার হয়ে ফ্রান্সে চলে গেছেন।

তরুণবাবু ডাক্তারি পাস করে বিলেতে চাকরি করেছেন। একটি ইংরেজ

মহিলাকে বিয়ে করেছেন। যুদ্ধের বাজারে প্রচুর পয়সা রোজগার করেছেন। ফ্রান্স থেকে ফিরে এসে লীড্‌স্‌-এ প্র্যাক্‌টিস করেছেন। দুবার ডার্বি সুইপে প্রায় লাখ পাঁচেক টাকা পেয়েছেন। কিন্তু কি আশ্চর্য! পূর্বের কথা তিনি সব ভুলে গেলেন। দেশে বুড়ো বাপ ভাই আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখলেন না! দু-পাঁচ শ টাকা ঋণ শোধের কথা মনে এল না! এমন কি স্ত্রীকে দিয়ে মিথ্যা বলিয়ে দেশের ছেলেদের সঙ্গে দেখা করলেন না। মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আত্মগোপন করে মানুষ এত অকৃতজ্ঞ ও বেইমান হতে পারে, শিবনাথ স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি।

॥ ষোল ॥

শিবনাথ প্রেসিডেন্সী কলেজের ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারে পড়ছে। ছোট ভাই ম্যাট্রিকুলেশন পাস করে কলকাতার একটা কলেজে ভর্তি হয়েছে। শিবনাথের টিউসনির মাত্রা বেড়ে গেছে। হিন্দু হোস্টেলের মাসিক খরচ সাড়ে দশ টাকা। ছোট ভাই-এর মেসের খরচ পনরো টাকা। মাসে পঞ্চাশ টাকার কমে দুজনের খরচ কুলোয় না। শিবনাথের একমাত্র সম্বল অস্থায়ী দুবেলা টিউসনির অনির্দিষ্ট আয়।

একদিন টিউসনি করে রাত্রি নটায় শিবনাথ নেবুতলা দিয়ে আসছিল। ফুটপাথের ধারে খোলার বাড়ির সামনে কয়েকটি মেয়ে সেজেগুজে দাঁড়িয়েছিল দেখে শিবনাথ রাস্তার মাঝখান দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছিল। সে শুনতে পেল, একটি মেয়ে একটা লোকের উপর অকথ্য ভাষা প্রয়োগ করছে। কুৎসিত ইঙ্গিত করছে। রাতের কলকাতা। কী বীভৎস তার রূপ! শিবনাথের বুকটা ভয়ে ছমছম করে উঠল। সে আরও দ্রুত চলতে লাগল।

সিক্সথ্‌ ইয়ারে পড়ার সময় শিবনাথ হিন্দু হোস্টেল ছেড়ে একটি মেসে এসেছিল। তার ঘরখানি তিন দিকে কাঠের তক্তা দিয়ে ঘেরা। ছাউনিও তক্তার। সুতরাং সকল ঋতুতে কষ্টকর। ভাড়া দেড় টাকা। ঐ মেসের একখানি বড় ঘরে থাকতেন ভূপেনদা, শ্যামবাবু আর বুড়োদা। বুড়োদা একটা অফিসে চাকরি করতেন। বয়স প্রায় চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। সাদাসিদে ঢিলেঢালা দিলখোলা লোক। একটু খেপাটে। শ্যামবাবু ছিলেন শিবনাথের

বন্ধু। সে-বছর বি. এ. পরীক্ষা দেবেন। ভূপেনদা সাতবার বি. এ. ফেল করেছিলেন। শেষবারের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বয়স সাতাশ-আঠাশ। এক সময় অবস্থা ভাল ছিল। চব্বিশ পরগনায় বাড়ি। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে। চেহারার উপর আভিজাত্যের ছাপ ছিল। তিনি বলতেন, দেখ শিবু, ইংরেজীতে এম.এ. পাস করতে হলে সেক্সপীয়র ভাল করে পড়তে হয় জানবি। আমি তোকে সেক্সপীয়র বুঝিয়ে দেব। সেক্সপীয়র আমার স্পেশাল স্টাডি।

শ্যামবাবু বললেন, তবে এতবার ডিগবাজি খাচ্ছেন কেন?

—আমার একটা দোষ আছে। আমি ইংরেজী পড়ি ভালো, বুঝিও ভালো ; কিন্তু প্রশ্নের উত্তর ইংরেজীতে লিখতে গেলে আমার মাথায় বজ্রাঘাত হয়। বাংলায় লিখতে দেনা, দেখবি ফাটিয়ে দেব। আমি বুঝতে পারিনে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যাদিগ্‌গজরা ইংরেজী লেখার স্টাইলের উপর অত জোর দেন কেন? আমাদের দেশের ছেলেরা ইংরেজী বা অন্য কোন ভাষায় শ্রেষ্ঠ বই পড়ুক, কিন্তু ভাব প্রকাশ করুক মাতৃভাষায়। আমি ভুক্তভোগী। আমার মতো কত ছেলে অন্য সব বিষয়ে ভালো নম্বর পেলেও শুধু ইংরেজীতে বছরের পর বছর ফেল হয়।

শিবনাথ বলল, যে-ভাষা পড়ব, সে ভাষায় যদি মনের ভাব প্রকাশ করতে না পারি বা লেখার যদি ভালো স্টাইল না হয়, সে ভাষা বা সাহিত্য পড়ায় সার্থকতা কোথায়?

ভূপেনদা ভ্রূকুঞ্চন করে বললেন, কেন আমরা মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষার সাহিত্য পড়ি, সে কি বিদেশী ভাষায় সাহিত্য রচনার জন্যে? এই দেখ না, এন. ঘোষ তো এত ভালো ইংরেজী লেখেন। মাইকেল, তরু দত্ত, আজকাল সরোজিনী নাইডু ইংরেজীতে ভালো ভালো কবিতাও লিখেছেন। তাঁরা কি ইংরেজী সাহিত্যে স্থান পেয়েছেন? 'বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা?' অন্য ভাষা শেখ, তার সাহিত্য পড়। সেই সাহিত্যের ভাব ধারণা ও চিন্তা গ্রহণ করে মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধ করে তোল। বিদেশী ভাষায় শ্রেষ্ঠ সাহিত্য পড়ার সার্থকতা তো এইখানে।

আলোচনার মোড় ফিরিয়ে দিয়ে শ্যামবাবু বললেন, সেদিন রাত্রে যে ভদ্রলোকটি জুড়ি হাঁকিয়ে আমাদের এই পচা গলিতে এসেছিলেন, তিনি কে? আপনি তাঁর সঙ্গে কোথায় গিয়েছিলেন?

ভূপেনদা বললেন, আর বলো না ভাই, বলো না। সে আমার

ভায়রা-ভাই। বড়লোক। বড়লোক আত্মীয় ভীষণ চীজ। আমি আগের মতো আছি ভেবে সে আমাকে টানাটানি করে বেলঘরিয়ার একটা বাগানবাড়িতে নিয়ে গেল। সুন্দর বাগান। বাগানের মাঝখানে পুকুরের পাড়ে একখানি ছোটখাটো সজ্জিত দোতলা বাড়ি। গাড়িতে বসেই তো এক বোতল সাবাড় করলে। সুতরাং বাবুর কি অবস্থা বুঝতে পেরেছ নিশ্চয়ই। গাড়ি থেকে নেমে টলতে টলতে সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠলেন। আমি পিছনে আছি। দেখলাম হল-ঘরে একটা বিশ্রী ব্যাপার চলেছে। পাঁচ-সাতটা পেত্নী, আর আট-দশটা ছোঁড়া বাজনার তালে তালে নাচছে, ঢুক ঢুক করে মদ খাচ্ছে, আর জড়াজড়ি করে পাশের ঘরে ঢুকছে। ভায়া তাদের দলে যোগ দিলেন। উন্মত্তের মতো বুড়ো মিন্‌সেটা ধিন-ধিন করে নাচতে লাগল। আমার অবস্থাটা ভেবে দেখ।

শিবনাথ জিজ্ঞাসা করল, আপনাকে দেখে ওদের লজ্জা হল না?

—তুই বড় ছেলে মানুষ। ওদের সকলের তখন লাল চোখ।

—এক সময় আপনিও তো ঐ রকম ছিলেন। আপনি নিস্পৃহ দ্রষ্টার মতো চুপ করে রইলেন?

—ওরে, ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। আগুন দেখলে তো কথাই নেই। আমি একটু পরেই কেটে পড়লাম।

—আপনি সামলে নিলেন কি করে?

—সাধে কি লোক বাবা বলে, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়!

—এখন আপনি সাধু হয়ে গেছেন?

—এক্কেবারে ঋষি জামদগ্ন। বাবা ছিলেন মজিলপুরের জমিদার। আমি ফার্স্ট ডিভিজনে এনট্রান্স পাস করে প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলাম। পাছে ছেলের কষ্ট হয়, এজন্য বাবা মাসে মাসে এক শ টাকা পাঠাতেন। এত কাঁচা টাকা হাতে পড়লে কি মাথা ঠিক থাকে? অনেক বন্ধু জুটল। আমি কাপ্তেন বনে গেলাম। উঠতি বয়সে মেয়ে মানুষের নেশা বিষম নেশা জানবি। সেই নেশায় মশগুল হয়ে গেলাম।

শ্যামবাবু বললেন, ওর আনুষঙ্গিক বস্তুটাও ছিল?

—তা কি আর না ছিল? তবে মাত্রাটা কম। দুবার ফেল করে কুঁতিয়ে কুঁতিয়ে এফ. এ. পাস করলাম। বি. এ. পড়তে আরম্ভ করলাম। তবে হাল ছাড়িনি। আমাকে বি. এ. পাস করতেই হবে।

—কেন ?

—বাবা মারা গেছেন। জমিদারির আয় কমে গেছে। বিরাট সংসার। বি. এ. পাস করলে পাড়াগাঁর স্কুলে একটা হেড্‌মাস্টারিও তো জুটবে।

—হাঁ, আদর্শ হেড্‌মাস্টার হবেন !

—ওরে, সংসারে সব বেটাই আদর্শ স্থানীয়। যে যত সাধুগিরি করুক, সকলেই আবরণ টেনে আত্মগোপন করে চলে। এই দেখ না, আমার ভায়রা ভাইকে। সে তো পাবনার জমিদার। বি. এ. পাস। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী। ওখানকার মিউনিসিপ্যালিটি ও জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান। অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট। অপরাধীর বিচার করে। দণ্ড দেয়। আর এদিকে কলকাতায় এসে বাঁদরামি করে। লোকের চোখে ধুলো দিয়ে তো জীবনটা কাটিয়ে দিলে। যে মেয়েকে না দেখেছি, সে বড় সুন্দরী। যার হাতে খাইনি সে বড় রাঁধুনী, আর যাকে না চিনি, সে বড় ভালো লোক।

শিবনাথ বললে, ভূপেনদা আপনি misanthrope হয়ে গেছেন। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো মহাপাপ।

—না, বিশ্বাস হারাই নি। তবে পুরুষের ভিতর দেবতা আছে, আর শয়তানও আছে। মেয়েদের ভিতর দেবী আছে, আবার পিশাচীও আছে। অগ্নি-পরীক্ষা পার না হলে কিছু বোঝা যায় না। মানুষের চরিত্র জটিল।

বুড়োদা এতক্ষণ চুপ করে সব শুনছিল। সে বললে, অনেকক্ষণ তো জ্বালাচ্ছ। এখন একটু ঘুমুতে দাও। কাল অফিস আছে। তোমরা এখনও বাপের হোটেলে আছ। ভাবনা কি ? লক্ষ্মী ছেলের মতো ঘুমিয়ে পড়।

বুড়োদা বিরক্ত হচ্ছে দেখে তারা আলোচনার উপর যবনিকা টেনে দিয়ে নিদ্রাদেবীর কোলে আশ্রয় নিল।

॥ সতরো ॥

শ্রাবণ মাস। মেঘমেদুর আকাশ বর্ষণমুখর। শিবনাথ বাড়ি এসেছে। চঞ্চলা বাপের বাড়ি গেছে। আপদ যত দূরে থাকে ততই ভালো। তার মনের কোণে যে চাপা হিংসা আর ঘৃণার ক্রূর সর্পটা লুকিয়ে থাকত, আজকাল তার বিষাক্ত নিশ্বাসের জ্বালা প্রকাশ পেত তার প্রতিটি কাজে ও কথায়।

তার বেহায়াপনা, তার মা-বাপের বাক্যবাণ ভবতারিণীর পক্ষে যত অসহ্য হয়ে উঠছিল, ততই তিনি চঞ্চলাকে দূরে রাখতে আর শিবানীকে কাছে টেনে নিতে চেয়েছিলেন, ততই তিনি এই মা-বাপের স্নেহহারা মেয়েটির শূন্য হৃদয়ে আসন পাততে সমর্থ হয়েছিলেন, ততই তিনি নিজের ছোট মেয়ে মন্দাকিনীর মতো শিবানীকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন।

মন্দাকিনী চঞ্চলাকে দেখতে পারতেন না। গঙ্গাস্নানের জন্যে কলকাতায় গেলে রামজয়ের থাকবার কোন স্থান ছিল না। এজন্য আট বছর বয়সের বালিকা মন্দাকিনীকে হাটখোলার এক গৃহস্থ পরিবারে বিয়ে দিয়ে মাঝে মাঝে গঙ্গাস্নান করে পুণ্যার্জনের রাস্তা প্রস্তুত করতেন।

সে সময় হাটখোলা ছিল পাটের বড় আড়ৎ। পূর্ববঙ্গের বহু পাট-ব্যবসায়ী মহাজন, আড়ৎদার, দালাল, ফড়ে এখানে বাস করতেন। অসংখ্য পাটের গুদাম ছিল। পাট-বোঝাই বহু নৌকা, ভড়, গাধা বোট গঙ্গার ঘাটে ভিড়ত, ছাড়ত, বাঁধা থাকত। মাঝীমাল্লা, গাড়োয়ান, গাড়ি, কুলিমজুর স্থানটাকে সরগরম করে রাখত। বেশ্যা মদ গাঁজা গুলি জুয়াখেলা প্রভৃতি অনাচারের স্রোত পুরাদমে বয়ে যেত দু-চার ঘর স্থায়ী গৃহস্থ বাসিন্দার ছেলেমেয়েরা এই দূষিত আবহাওয়ার মধ্যে মানুষ হত।

মন্দাকিনীর স্বামী কালীচরণের বাবা তার বিয়ের বছর দুয়ের মধ্যে মারা যান। স্বামীর মৃত্যুর পর কালীচরণের মা পৈত্রিক কালীবাড়ির স্বল্প আয় থেকে চারটি ছেলের ভরণ-পোষণের ব্যয় নির্বাহ করতেন। অভিভাবকহীন কালীচরণ অল্প বয়সেই মাতাল ও চরিত্রহীন হয়ে ওঠে। ক্রমে তার উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে উঠেছিল। মায়ের প্রবল প্রতিবাদ সত্ত্বেও সে একটি পতিতা মেয়েকে নিয়ে স্বগৃহে বাস করতে থাকে। উপপত্নীর প্ররোচনায় মাতাল নষ্ট-চরিত্র কালীচরণ যুবতী স্ত্রী মন্দাকিনীর উপর অকথ্য অত্যাচার করত।

তার সেজভাই দাদার পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। সে ত্রিপলের কারবার করত। সন্ধ্যার সময় দোকানের কাজকর্ম সেরে সে সারা রাত যে কোথায় থাকত, কেউ জানত না। ভোরবেলা গঙ্গাস্নান করে গরদের কাপড় পরে খড়ম পায়ে খটাখট শব্দ করতে করতে বাড়ি ফিরত। হাতে থাকত কমণ্ডলু। স্ত্রীর শোবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে তিন বার 'ওঁ হ্রীং' শব্দ জোরে উচ্চারণ করে স্ত্রীর ঘুম ভাঙ্গাত। স্ত্রী দরজা খুলে দিলে কম্বল আসনের উপর বসে ভক্তি ভরে গীতা পাঠ করত।

সেজভাই কুলিদের কাছে চোরাই পাট কিনে বিক্রি করে অর্থ সঞ্চয় করেছিল এবং পরে পাটের ব্যবসায়ী হয়ে লক্ষ টাকার মালিক হয়েছিল। সেও রাত্রিতে বাড়িতে থাকত না, গঙ্গাস্নান করত, গীতাপাঠ করত, দেব-দ্বিজে ভক্তি করত। ছোটভাই তাদের কাজকর্মে সাহায্য করত, আর চোরাই পাট বিক্রি করে যে পয়সা পেত, তাতে রাত-খরচা চালাত। এ বাড়ির বউরা রাত্রে দরজায় খিল দিয়ে চোখের জল ফেলত। আর কর্তারা নিশাচর-বৃত্তি অবলম্বন করে যে যার প্রণয়িনীর কুঞ্জে রাত কাটাত।

এইরূপ একটি অদ্ভুত পরিবারে প্রকৃত শুচিতা, পবিত্রতা ও ধর্মভাব ছিল না, তবে অজ্ঞতাসূচক হিন্দুয়ানী ছিল। কালীপূজায় দিন পাঁঠা ও মেষ বলি হত। পূর্ণিমার দিন দেড় শ টাকা খরচ করে ঘটা করে সত্যনারায়ণের শিন্নি দেওয়া হত। পুরোহিত সুর করে পাঁচালী পড়তেন।

মন্দাকিনী ছিলেন পাড়াগাঁর আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে। রামজয় দরিদ্র হলেও নিরীহ ও সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন। জ্ঞান হওয়া অবধি এই অদ্ভুত পরিবারের চালচলন, পুরুষদের প্রকৃতি রুচি ও দুর্ব্যবহার তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। পতি-দেবতার হাতে মার খেয়ে মন্দাকিনী এক-এক দিন অজ্ঞান হয়ে পড়তেন। কোন্ দিন হাতে দড়ি পড়বে ভেবে তাঁর শাশুড়ী বেয়াইকে লিখলেন—আপনার মেয়ের মারাত্মক অসুখ। শীগ্গীর না এলে হয়ত আর দেখা হবে না। পত্রপাঠ চলে আসুন।

মেয়ের সঙ্গে শেষ দেখা করার জন্য রামজয় পত্রপাঠ ছুটে গেলেন। মাতাল চরিত্রহীন জামাতার কীর্তি-কাহিনী আর মন্দাকিনীর উপর দারুণ অত্যাচারের কথা শুনে বেয়ানের অনুরোধে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে দেশে চলে আসেন। সেই অবধি মন্দাকিনী পিতৃগৃহে বাস করতে লাগলেন। এর মাস কয়েক আগে তাঁর একমাত্র মেয়ে কৃষ্ণভামিনী মায়ের কোল শূন্য করে চিরকালের মতো চলে গিয়েছিল।

যৌবনে স্বামী-পরিত্যক্তা মন্দাকিনীর বেদনা-বিধুর বুভুক্ষু মাতৃহৃদয় মাতা-পিতৃহীনা শিবানীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। দুজনের ভিতর ননদ-ভাজের অহি-নকুল সম্পর্কের পরিবর্তে মা-মেয়ের মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

ছুটির সময় বাড়ি এলে শিবনাথকে মার কাছে এক বিছানায় শুতে হত। তিনি বলতেন, ছেলে লেখা-পড়া শিখছে। তাকে অন্যদিকে মন দিতে দেওয়া ভালো নয়। মাথা খারাপ হয়ে যাবে যে। শুনে মন্দাকিনী বলেছিলেন—

বউ বড় হয়েছে। শিবুও তো নেহাৎ ছেলে-মানুষ নয়। আজ বাদে কাল এম. এ. পাস করবে। ওরা কি রক্ত-মাংসের মানুষ নয়? তুই কি চিরকাল বুড়ী ছিলি, মা? তোর ভয়, রাত্রে কার্টেন-লেক্‌চার শুনে পাছে ছেলে বউ-এর ভেড়ো হয়ে যায়!

ভবতারিণীর দোষ ছিল না। ও দেশের প্রথা এমনই ছিল। বউ-এর কাছে যেতে দিলে পাছে ছেলে পর হয়ে যায়, এজন্য সেকালের পাড়াগাঁর মায়েরা এ বিষয়ে একটু বেশী সচেতন ছিলেন। ভালবাসা প্রতিদ্বন্দ্বী সহ্য করে না। সে চায় তার প্রিয়কে পুরামাত্রায় অধিকার করতে। বাইরের কেউ তাতে ফাটল ধরিয়ে দেবে, তা সে চায় না। ছেলের বিয়ের আগে সকল মা চান ঘরে টুকটুকে রাঙ্গা বউ আনতে, কিন্তু রাঙ্গা বউ এনে তাঁর মনে ঈর্ষা পরে দেখা দেয়।

ভবতারিণী মন্দাকিনীকে বললেন, তুই অমন আস্কারা দিস্ না বলছি। ওদের চোখ ফুটিয়ে দিলে কি আর রক্ষে আছে!

—চোখ ফোটাতে হবে না। অনেক দিন আগে চোখ ফুটে গেছে।

—শিবু আমার তেমন ছেলে নয়।

—তা তো নয়ই। তোমার ছেলেটি এত ভালো মানুষ যে, ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না! তুই অমন করে আগলে রাখবি ক' দিন? ঘি আর আগুন এক সঙ্গে থাকলে জ্বলে উঠবেই জানবি।

তিনি মন্দাকিনীর কথা বিশ্বাস করলেন না। সেকালের মায়েরা এই ধরনের একটু ভালো মানুষ গোছের লোক ছিলেন।

শিবনাথ এম. এ. পাস করেছে। শুনে শশীবাবু ছাড়া আর সকলে আনন্দিত হল। শশীবাবু বলেছিলেন, ওকালতি করতে হলে এম. এ. পাস করে কি হবে? শুধু সময় নষ্ট করা বৈ তো নয়? বি. এল. পাস তো দূরের কথা পি. এল. পাস করে শীগ্‌গীর বেরিয়ে এলে ভালো হতো। আমি আর কতদিন ধুনি জেলে বসে থাকব। নিজের কেউ একটা তাঁর সেরেস্তায় বসলে তাঁকে আর অন্য উকিলের কাছে যেতে হয় না। শিবনাথ এত বোকা কেন? সে এলে তো দুদিনেই তার পসার হয়ে যাবে! শীগ্‌গীর আসছে না কেন?

শিবনাথ ভেবেছিল, পাড়াগাঁর কোন স্কুলে হেড্‌মাস্টারি করার চেয়ে কলকাতার কোন কলেজের অধ্যাপক হওয়া ভালো। শশীবাবুর জিদ তাকে উকিল হতেই হবে। এজন্য বি. এ. পাস করার পর আর দশ জন ছেলের

মতো সে আইন কলেজে ভর্তি হয়েছিল। সে এখন আইন কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। রামজয় ওকালতি পছন্দ করতেন না। বলতেন, ওকালতিতে পয়সা থাকলে কি হয়? ওকালতির মতো জঘন্য কাজ আর নেই। জীবনে টাকাই তো সব নয়। ওকালতি ব্যবসায় জেনে শুনে মিথ্যা বলতে হয়। অপরকে মিথ্যা শেখাতে হয়। তার চেয়ে মাস্টারি ভালো, ধর্মের কাজ। তাতেও তো মাসে এক শ টাকা হবে। এক শ টাকা কি কম? বেশী টাকা কি হবে? তাঁর বাবাও তো অধ্যাপক ছিলেন। পয়সা কম পেতেন বটে কিন্তু তাঁর মান-সম্ভ্রম কি কম ছিল? জেলার পণ্ডিতসমাজের কোন্ লোকটি তাঁকে চিনত না? না, না, শশী যা বলে বলুক। শিবনাথের উকিল হয়ে কাজ নেই।

সেদিন সন্ধ্যায় যাত্রাগান শোনার জন্যে গাঁয়ের সকল বাড়ির কর্তা গিন্নী ঝিউড়ীরা কালীতলায় গিয়েছিল। রামজয়, ভবতারিণী ও মন্দাকিনী গিয়েছিলেন। শিবানী যায় নি। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় নি। কোন বাড়ির বউ আসে নি। বউরা সকলের সামনে বসে নির্লজ্জের মতো কি গান শোনে? লোকে বলবে কি! যাত্রা শুনতে না গেলে পাছে গ্রামের কর্তা-গিন্নীরা ভাবে এম. এ. পাস ছোকরাটা সাহেব হয়ে গেছে, এই অপবাদের ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও শিবনাথকে যেতে হয়েছিল। আসরের এক ধারে বসে সে যাত্রা শুনছিল। তার উচ্চ শিক্ষিত মন ভিতরে ভিতরে অন্যায় দেশাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। সে জানত—Discretion is the best part of valour—সুবিবেচনাই সৎসাহস। স্থান কাল ও পাত্র বিবেচনা না করে কাজ করলে হিতে বিপরীত হয়। সে তো আর বিদ্যাসাগর বা রামমোহন নয় যে, দেশজোড়া কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার লৌহ-কপাট ভেঙ্গে দিয়ে সমাজকে সম্মুখ সমরে আহ্বান করবে! সে জানত পারিবারিক প্রথা ও দেশাচারের উৎকট অত্যাচার দিনের পর দিন, বছরের পর বছর সেই মাতাপিতৃহীনা অসূর্যম্পশ্যা উদ্গতযৌবনা বধূটির ক্ষুদ্র হৃদয়খানিকে অবদমিত করে দিচ্ছিল। সে দেখত কেমন ভাবে অচলায়তন সমাজের নির্যাতন গ্রামের বালিকা বধূগুলির কুসুম-কোমল-মনকে ক্লিষ্ট ও সঙ্কুচিত করে দিয়েছিল। কলকাতার কলেজে পড়ার সময় দুঃখের জালায় যখন সে সকালে শ্যামবাজারের একটি গৃহস্থ বাড়িতে এবং সন্ধ্যায় নেবুতলার আর একটি গৃহস্থ বাড়িতে গৃহ শিক্ষকের কাজ করে মাত্র ত্রিশটি টাকা উপার্জনের জন্য পায়ে হেঁটে যাতায়াত

করত, যখন বর্ষার সময় মেছোবাজারের রাস্তায় এক কোমর জল ভেঙ্গে আর শীতকালে একটা পাতলা শার্টের উপর সুতীর চাদর জড়িয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাজবাড়ির শ্বেতপাথরে বাঁধানো কন্কনে মেঝের উপর উবু হয়ে বসে জলভরা চুমকি ঘটীর উপর থালাটি চাপা দিয়ে কাঙ্গালের মতো এক মুঠো অন্ন এবং জলো ডালের জন্য হাপিত্তেস করে প্রতীক্ষা করত, তখনও দূরে অকরুণ গ্রাম্য পরিবেশে গৃহকর্মে ব্যস্ত অবগুণ্ঠনবতী বালিকা বধূটির মলিন মুখচ্ছবি তার মনের উপর ভেসে উঠত, আর তার ভাবী কল্যাণী মাতৃমূর্তির কল্পনা তার আপাত দুঃখ-কষ্টকে ভুলিয়ে দিত। ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তার দেহের লাবণ্য শতদলের মতো বিকশিত হয়ে তার মনকে অপরূপ রসে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল।

যাত্রাশালায় বহু নর-নারীর সমাগম শিবনাথের কাছে অরণ্যের মতো মনে হয়েছিল। সদর দরজায় খিল দিয়ে ভিতরের দাওয়ায় দোলায় শিবানী আনমনা হয়ে বসেছিল। শ্রাবণের বর্ষাস্নাত জ্যোৎস্নায় তার দেহ প্লাবিত হয়েছিল। শিবনাথের সাড়া পেয়ে সে দরজার খিলটা খুলে দিয়ে মাথায় কাপড় টেনে দোলায় বসল। শিবনাথ জোর করে তার ঘোমটা সরিয়ে দিয়ে দেখল তার দুটি চোখ জলে ভরে গেছে। বললে, এ কি ? কাঁদছ কেন ? তারপর শিবানীর মুখখানিকে নিজের মুখের কাছে টেনে নিল।

—ছি, ছি, ও কি করছ ? শীগ্‌গীর সরে যাও। মা, ঠাকুরঝি এখনই এসে পড়বেন, বলে তাকে ঠেলে দিয়ে উঠে পড়ল। স্থান ত্যাগ করার আগে শিবনাথ একটিবার দুটি শক্ত বাহুর মধ্যে তার গলাটা জড়িয়ে ধরল। রাগের ভান করে শিবানী নিজের মুখখানিকে হস্তমুক্ত করে বলল—যাত্রাগান ভেঙ্গে গেছে। মা, ঠাকুরঝি এসে পড়বেন। রাস্তায় লোকের কথা শোনা যাচ্ছে।

শিবনাথ দ্রুতপদে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল। শিবানী দরজার ভিতর দিকের খিল দিয়ে এসে আবার দোলায় বসল।

॥ আঠারো ॥

দু বছর কলকাতার জীবনে দুঃখ-কষ্ট, অভাব, দারিদ্র্য উদয়াস্ত হাড়ভাঙ্গা খাটুনির ফলে শিবনাথ মুষড়ে পড়েছিল। সে পরিত্রাণের উপায় খুঁজছিল। এমন সময় একদিন তার আবাল্য বন্ধু ও সহপাঠী মতি তাকে বলল, দেখ শিবু,

আমি সেদিন দাদামশাই-এর বাড়ি গিয়েছিলাম। তাঁর কাছে শুনলাম যে, ওখানকার জমিদারের স্কুলে হেড্‌মাস্টারের পদ খালি হয়েছে। দাদামশাই স্কুলের সেক্রেটারী। আমি জানি কলকাতায় বড় কষ্ট হচ্ছে তোর। তোকে জানাবার সময় ছিল না। এজন্য তোর নাম দিয়ে আমি একখানা দরখাস্ত লিখে দিয়ে এসেছি। তোর চাকরি হয়েই গেছে জেনে রাখিস। মফঃস্বলের স্কুলে হেড্‌ মাস্টারি করতে তোর আপত্তি নেই তো? বেতন পাবি এক শ টাকা আর কোয়ার্টার ফ্রি।

তার কথা শুনে শিবনাথ অকূলে কূল পেল। সে বলল, আপত্তি তো দূরের কথা, এই চাকরির জন্য আমি চিরকাল তোর কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। বাবার বয়স সত্তরের উপর। সংসারে অভাবের জ্বালা। কলকাতায় দু ভাইয়ের খরচ চালিয়ে তাঁর হাতে একটা টাকাও দিতে পারি নি। চব্বিশ বছর বয়স হয়ে গেল। সংসারের কোন উপকার করতে পারলাম না। আমি বাবার বড় ছেলে। বিয়ে হয়েছে। যা হোক কতকটা তো লেখাপড়া শিখেছি। শুধু বিদ্যের জাহাজ হয়ে লাভ কি? বুড়ো মা-বাপ, স্ত্রী, ছোট ভাই ও তার স্ত্রী বড় বোন আমার মুখ চেয়ে আছে। তাদের দুঃখ-কষ্ট আর দেখতে পারছি না। বিশেষ করে কলকাতার এই কষ্টকর জীবন আর সহ্য করতে পারছি না। এক শ টাকা মাইনে, ফ্রি কোয়ার্টার আর মফঃস্বলে জিনিসপত্র সস্তা পাব। এমন সুখের চাকরি আমি ছাড়ব না। তোর দাদামশাইকে লিখে দে, আমি পূজার পরেই কাজে নিশ্চয় যোগ দেব। পূজোর ছুটি হতে তো আর দশ-বারো দিন বাকি। ইতিমধ্যে আমি সমস্ত ঠিকঠাক করে নিচ্ছি।

মতি বলল, আচ্ছা, আমি দাদামশাইকে এখুনি লিখছি। দেখিস্‌ আমাকে যেন অপ্রস্তুত হতে না হয়! এই বলে মতি তার মেসে চলে গেল।

পূজোর ছুটি। আনন্দময়ীর আগমন প্রতীক্ষায় লোকের মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছে। বাতাসে মধু বইছে। আকাশ থেকে মধু ঝরছে। জলভরা কংসাবতী তীরে শুভ্র কাশ ফুলের বরণডালা সাজিয়ে শারদলক্ষ্মীর আবাহনের জন্য যেন প্রস্তুত হয়েছে। শিবনাথ ও তার ছোট ভাই দেশে এসেছে। সকল বাড়ির বউরা বৎসরান্তে বাপের বাড়ি যাওয়ার আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছে। সকল পূজো বাড়িতে আত্মীয় কুটুম্বদের আসার ভিড় লেগে গেছে। চঞ্চলার

বাপের বাড়িতে পূজা। সে চলে গেছে। শিবানীর কোথাও যাওয়ার স্থান ছিল না। প্রতি বৎসর পূজোর সময় শশীবাবু শিবুকে একখানি ব্লু রঙের কালো পাড়ের ধুতি দিতেন। বিয়ে হওয়ার পর তার পরিবর্তে তিনি শিবানীকে একখানি ভাল চওড়া পাড়ের শাড়ি দিতেন। তিনি বলতেন, আহা, ওর বাপের বাড়ি নেই। তিনি জানতেন বড় বউকে নতুন কাপড় কিনে দেওয়ার সামর্থ্য রামজয়ের ছিল না। শিবানী একখানি নতুন শাড়ি পাওয়ার প্রত্যাশায় সারা বছর অপেক্ষা করে থাকত। কবে পূজো আসবে এজন্য মাস হিসেব করত।

শিবনাথ এক শ টাকা মাইনের মাস্টারির চাকরি পেয়েছে শুনে রামজয়ের আনন্দের সীমা ছিল না। বাবা লক্ষ্মীজনার্দন এবার বোধ হয় মুখ তুলে চাইলেন। তিনি ভাবতেই পারেন না যে তাঁর শিবু মাসে এক শ টাকা রোজগার করবে। মাসে মাসে এত টাকা কি হবে? ভবতারিণী বলেছিলেন, ওগো, এবার তুমি টাকা দিয়ে রেলের বাঁধ তৈরি করবে। শিবানী শুনেছে। বিশ্বাস করতে পারে না। তার পাথর-চাপা কপালে এমন অঘটন কি ঘটবে? এক একবার ভাবে কথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। সকলেই কি মিথ্যা বলছে? ভাবে বাঁড়ুয্যে-বাড়ির বউদের মতো সেও এবার তার বরের চাকরি-স্থলে যাবে। দুঃখের কালো মেঘ কেটে যাবে। পর মুহূর্তে মনে সন্দেহ জাগে, এরা কি পাঠাবে? এরা বলে, গেরস্ত বাড়ির বউ কি বিদেশে যায়? স্বামীর ধুতির খুঁটে বাঁধা হয়ে বউ কি সাত ঘাটের জল খেয়ে বেড়ায়?

বউ সঙ্গে নিয়ে যারা চাকরি-স্থলে থাকে গাঁয়ের লোক তাদের নিন্দে করে। বলে, যে মেয়েরা বিদেশে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ায়, তাদের কি আর আব্রু আছে—তারা নষ্ট হয়ে গেছে। মা-বাপের মত না হলে কি শিবনাথ তাকে বাসায় নিয়ে যাবে—সে কি এই জেলখানা থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে?

শিবনাথের মাস্টারি চাকরির গুহ্য সংবাদটি রামজয় গোপন রেখেছিলেন। লোকে জানলে প্রকাশ হয়ে পড়বে। শশিভূষণের কানে যাবে। সে একটা অনর্থ বাধিয়ে বসবে। মদের মুখে শ্বশুরকে উচ্চবাচ্য করবে। সৌদামিনী জানতেন। তিনিও চুপ করে ছিলেন। নিজের স্বামীকে তিনি চিনতেন। যে কথা তাঁর মনঃপূত হত না এবং স্বাভাবিক অবস্থায় বলতে চক্ষু-লজ্জা বোধ করতেন দু এক গ্লাস মদ পেটে পড়ার পর মাতলামির অছিলা করে তা প্রকাশ

করে তিনি গায়ের ঝাল ঝাড়তেন। শিবনাথের চাকরিতে যোগ দেওয়ার পর পর্যন্ত এই সংবাদটি সকলে চেপে রেখেছিল।

ভ্রাতৃ-দ্বিতীয়ার পর বড়দিদির কাছে গোটাকয়েক টাকা নিয়ে শিবনাথ বেরিয়ে পড়ল। সেকালের হেড্‌মাস্টারদের কোট-প্যাণ্ট পরতে হত। মহকুমা শহরের একটা দর্জির দোকানে পনরো টাকা দাম দিয়ে একটা ইটালিয়ান সার্জের স্যুট তৈরি করে নিয়ে শিবনাথ চাকরি-স্থলে উপস্থিত হল। তাকে বাসাটি দেখিয়ে দেওয়া হল।

একতলা পাকা বাড়ি। সেকেলে ধরনের। এত নীচু যে মনে হয় যেন বাড়িখানা মাটির তলায় নেমে গেছে। দুখানি বড় শোয়ার ঘর। সামনে ছোট একখানি বৈঠকখানা আর পাশে রান্নাঘর। শোয়ার ঘরের মেঝে নিচু। মেঝে থেকে ছ ফুট উপরে জানালা। গবাক্ষ বললেও চলে। মনে হয় ইচ্ছা করে বায়ু চলাচলের পথ বন্ধ করার ব্যবস্থা হয়েছে। বাড়ির সামনে ফুটবল খেলার মাঠ। অদূরে একটা কাটা খালের উঁচু বাঁধের ধারে দোতলা সুন্দর স্কুল বাড়ি। স্কুলের মালী রঘু জিনিসপত্র গোছ-গাছ করে দিল। জমিদারদের স্কুলের কুড়ি বৎসরের নাতিদীর্ঘ জীবনে সে দুজন হেড্‌মাস্টারকে পার করেছে। সুতরাং মাস্টারদের প্রকৃতি ও মনোবৃত্তি সম্বন্ধে তার অভিজ্ঞতা নেহাৎ অবজ্ঞার বস্তু ছিল না।

নতুন জায়গা। নতুন বাড়ি। নতুন চাকরি। শিবনাথের জীবনের নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল। সেদিন রাত্রে তার ঘুম ধরে না। একখানা নিচু তক্তাপোশের উপর শুয়ে তার কত কথা মনে এসেছিল। একাকিত্বের শূন্যতা মনের খোরাক যোগায়। কত খুঁটিনাটি ঘটনা, কত ছোটখাটো কথা মনের পর্দার উপর ভিড় করে আসে। কত এলোমেলো অসংবদ্ধ অনাহূত চিন্তা ও ভাবনা, একটার পর একটা এসে হাজির হয়। অনেক রাত হয়ে গেছে। বৈঠকখানায় রঘুমালীর নাকের ডাক শোনা যাচ্ছে। শিবনাথের হিংসা হয়। ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে খোলা বারান্দায় পায়চারি করতে লাগল। গৃহ নিস্তব্ধ। পল্লী প্রকৃতি ঘুমন্ত। সামনের অশথ গাছের ডাল থেকে মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছিল পাখির ডানার ছট্‌ছট্‌ শব্দ। জমিদার-বাড়ির বাইরের ফটক থেকে শোনা গেল ঘণ্টাধ্বনি। তখন রাত্রি দুটো।

মতির কথা মনে পড়ল। সে বলেছিল, ছাখ্‌ শিবু, পূর্বের হেড্‌মাস্টার

বেশ ভাল মাস্টার ছিলেন শুনেছি। তুই নতুন মাস্টার। নিজে পড়াশুনা করে ক্লাসে যাবি। ছোট ছেলেদের পড়ানো বড় কঠিন কাজ। বিদ্যের জাহাজ হলে ভাল মাস্টার হয় না। নিজে বোঝা আর অপরকে বোঝানো আসমান জমিন তফাত। ক্লাসে মাঝারি ধরনের ছেলে থাকে। সকলের বুদ্ধিবৃত্তি সমান নয়। সকলকে সন্তুষ্ট করা শক্ত। তবে তোর ছেলে পড়ানো অভ্যাস আছে। প্রাইভেট মাস্টারি করেছিস। একটু চেষ্টা করলে ভাল মাস্টার হতে পারবি। নাম করতে পারবি। তবে জানিস একটি দুটি ছেলেকে বাড়িতে পড়ানো আর ক্লাস পড়ানো সমান নয়। আমি একবার কলকাতার একটা স্কুলে মাস কয়েকের জন্যে মাস্টারি করতে গিয়েছিলাম। পয়সা রোজগার করবার জন্যে নয়। আমার একটি মাস্টার বন্ধু মাস তিনেক ছুটি নিয়েছিল। তারই অনুরোধে পড়াতে যাই। ফোর্থ ক্লাসে অঙ্ক কষাতে গিয়ে কি বিপদে না পড়লাম। প্রথম দিন তো গলদ্‌ঘর্ম হয়ে গেলাম। অবিশ্যি দুচার দিন পরে অনেকটা সামলে নিলাম। যা হোক মাস তিনেক কাজচলা গোছের পড়িয়ে নিস্তার পাই। হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। দ্যাখ, যেমন কবিতা লিখলেই কবি হয় না, তেমনি ছেলে পড়ালেই মাস্টার হওয়া যায় না। ঘষে-মেজে কতকটা হয় বটে কিন্তু ভাল কবির মতো ভাল মাস্টার জন্মায়, তৈরি হয় না। মতির কথাগুলি সে ভাবতে লাগল।

তখন ঘুমে তার চোখ জড়িয়ে এসেছিল। চোখের পাতাগুলি ভারি হয়ে গিয়েছিল। শিবনাথ বিছানার উপর শুয়ে পড়ল। যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। রাত্রে অনিদ্রার জন্যে সারাদিন তার শরীরটা ম্যাজ-ম্যাজ করেছিল।

॥ উনিশ ॥

স্কুলের কাজে যোগ দেওয়ার পরদিন বিকেলে শিবনাথ গেলেন ছোট জমিদারবাবুর সঙ্গে দেখা করতে। তখন তিনি সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে টেনিস খেলছিলেন। টেনিস কোর্ট সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো। চারদিকে উঁচু জাল দিয়ে ঘেরা। জোর খেলা চলছিল। কয়েকটা বাচ্চা ছেলে টেনিস বলগুলি কুড়িয়ে আনছিল। শিবনাথ খেলার মাঠের বাইরে হেলান-দেওয়া বেঞ্চিতে বসে খেলা দেখতে লাগলেন। পাশে খান দুই গদি-আঁটা আরাম চেয়ার পাতা

ছিল। জমিদারবাবু একটা বল মারেন আর একটি কোট-পেণ্টালুন-পরা ভদ্রলোক চিৎকার করে বলেন, ওয়েল ডান্। মাঝে মাঝে ভেরি গুড্, এক্সেলেণ্ট, বলে বিপুল উৎসাহে লাফিয়ে উঠেন। পরে শিবনাথ শুনেছিলেন ভদ্রলোকটি জমিদারবাবুদের হাসপাতালের বড় ডাক্তার। এল. এম. এস. পাস। কোন শিক্ষিত ভদ্রলোক এত নির্লজ্জভাবে নিছক খোশামোদ করতে পারে তা শিবনাথ ধারণা করতে পারেননি। এইভাবে অহেতুক খোশামোদ করার অভিনয় দেখে শিবনাথের ভয় হয়েছিল। হয়ত বা জমিদার-বাড়ির চাকরির এই নিয়ম। খেলা শেষ হল। জমিদারবাবু একখানি চেয়ারে আর একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক আর একখানি চেয়ারে বসলেন। দুপাশ থেকে দুজন খানসামা দুখানি বিরাট তালপাখা চালাতে লাগল। পরে শিবনাথ শুনেছিলেন ওই ভদ্রলোকটি ওখানকার ক্ষুদে হাকিম অর্থাৎ সাবরেজিষ্ট্রার। গভর্নমেণ্টের স্থানীয় বড় অফিসার হিসেবে জমিদার-বাড়িতে তাঁর খুব প্রভাব প্রতিপত্তি। তিনি ছোট জমিদার-বাবুর বন্ধু, উপদেষ্টাও বটে। একজন খানসামা এক গ্লাস আইসক্রীম সোডা জমিদারমশাই-এর হাতে দিল। পান করার পর আর একটি নাদুসনুদুস গোছের খানসামা তাঁর কানে কানে কি কথা বলল। তিনি শিবনাথের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারই নাম কি শিবনাথবাবু?

শিবনাথ নমস্কার করে বললেন, আজ্ঞে হাঁ।

—আপনার বাড়ি?

—এই জেলায়।

—ও, আপনি এই জেলার লোক আর ব্রাহ্মণ? ভালোই হল।

জমিদাররা ছিলেন ব্রাহ্মণ। তাঁদের আদি পুরুষের বাস ছিল এলাহাবাদের নিকটে। শাস্ত্রীয় ক্রিয়াকর্ম ছাড়া অন্য সকল বিষয়ে তাঁরা পুরামাত্রায় বাঙ্গালী ছিলেন।

—আপনার কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

শিবনাথ উত্তর দিতে না দিতে ডাক্তার বললে, আজ্ঞে হুজুর, আপনাদের আশ্রয়ে যারা আছে তাদের কি কোন অসুবিধে হয়? অবিশ্যি উনি নতুন লোক। অপরিচিত স্থানে প্রথম প্রথম একটু আধটু অসুবিধা হতে পারে। থাকতে থাকতে সব সয়ে যাবে। হুজুরদের আশ্রয়ের যে কত সুখ-সুবিধা তা ক্রমে বুঝতে পারবেন।

একটু পরেই জমিদারবাবু উঠলেন। সকলে তাঁর পিছনে চলতে লাগল। দেউড়ির কাছে এসে শিবনাথ তাঁকে নমস্কার করে সেদিনের মতো বিদায় নিলেন। অন্য সকলে দেউড়ির ভিতর ঢুকল।

সিংহগড়ের জমিদাররা দু ভাই। ছোট জমিদারবাবু জমিদারি চালাতেন। কাজকর্ম ভাল বুঝতেন। বেশ লম্বা চওড়া চেহারা। পরণে প্রায় ছ ইঞ্চি চওড়া কালো পাড়ের ফরেসডাঙ্গায় ফরমাশী চোদ্দ হাত ধুতি। গায়ে আদ্দির পাঞ্জাবী। গায়ের দুধে আলতায় গোলা ফরসা রঙ পাঞ্জাবীর ভিতর থেকে ফুটে বেরোচ্ছে। বুদ্ধিমান চতুর লোক। নিজে সাহেবী পোষাক পরতেন না। তাঁর আদেশে পঁচিশ টাকা বেতনের কর্মচারীকেও কোট-প্যাণ্ট পরে জমিদারি সেরেস্তায় যেতে হত। মোটা মাইনে দিয়ে সেকালের শ্রেষ্ঠ ওস্তাদ রেখে গান-বাজনা শিখেছিলেন। বেশী মাইনে দিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড় নিযুক্ত করে টেনিস খেলা শিখেছিলেন। দাবাখেলায় হাত পাকিয়েছিলেন। বাঁয়া তবলা সেতার ও পাখোয়াজ বাজাতে পারতেন। প্রতিদিন টেনিসখেলার পর সন্ধ্যার সময় আট-দশজন লোক নিয়ে বৈঠক-খানায় বসতেন। এই সকল চাটুকার মাসে মাসে মাইনে পেত। কর্মচারীদের মেসে বিনা খরচায় ভাত জলখাবার খেত। সারা দুপুর পড়ে পড়ে ঘুমোত। সন্ধ্যার পর ঘণ্টা দুই তিন হুজুরকে আজগুবী গল্প শুনিয়ে আর তাঁর বিদ্যা বুদ্ধির তারিফ করে মনোরঞ্জন করত। এইভাবে তারা চাকরি বজায় রাখত।

জমিদারবাবু নিজেদের স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন। প্রতি মাসে পাঁচ-সাতখানি বিলেতী মাসিক পত্রিকা কিনিয়ে আনতেন। রাত্রি এগারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত পত্রিকাগুলি পড়তেন। কটমটে লম্বা-চওড়া ইংরেজী শব্দ আর ল্যাটিন ফ্রেজগুলি নোটবুকে লিখে রাখতেন। জমিদারি সেরেস্তায় বাংলানবিস বা থার্ডক্লাস বিদ্যের কর্মচারীদের কাছে তাদের দুর্বোধ্য ভাষায় আদেশ ও মন্তব্য লিখে বিদ্যাবত্তা জাহির করতেন। বেলা আটটা পর্যন্ত ঘুমোতেন। তারপর দুঘণ্টা বাস্তু দেবতার মন্দিরে বিগ্রহের সামনে পাঁয়তারা কষে ঠাকুর প্রণামের অভিনয় করতেন। তারপর প্রকাণ্ড চৌবাচ্চায় ঈষদুষ্ণ জলে তিন চার ঘণ্টা গা ডুবিয়ে বসে থাকতেন। সেখানেই দাঁত মাজতেন, দাড়ি কামাতেন, চিঠিপত্র লিখতেন, জমিদারির কাগজপত্রে সহিসাবুদ করতেন, ম্যানেজারদের ডাকিয়ে এনে জরুরি কাজের আদেশ বা উপদেশ দিতেন।

চৌবাচ্চা থেকে উঠে ভেজা কাপড় ছেড়ে খাবার ঘরে যেতেন। পুরু দামী গালিচার আসনের সামনে প্রকাণ্ড রূপার বগি থালায় সুগন্ধ জিরের মতো মিহি চালের দুধের মতো সাদা ভাতের ক্ষুদ্র একটি স্তূপ সাজানো থাকত। থালার চারধারে হরেক রকমের নিরামিষ তরকারিপূর্ণ কুড়ি-পঁচিশটি রূপার বাটি আর জলভর্তি রূপার গ্লাস। দু-চারটি দানা ভাত মুখে তুলতেন, দু-একটা বাটি থেকে একটু-আধটু তরকারি আস্বাদন করতেন। দু-তিন বোতল আইসক্রীম সোডা গলাধঃকরণ করে উঠে পড়তেন। এইভাবে ভোজন পর্ব সেরে টেনিসমাঠে যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়তেন। কুশাগ্রবুদ্ধি সুরসিক কৌতুকপ্রিয় লোক ছিলেন তিনি। জমিদারি চালানো ব্যাপারে তিনি ছোট-খাটো ধরনের চাণক্য ছিলেন।

বড় ভাই একটু ধার্মিক প্রকৃতির ভালো মানুষ গোছের লোক ছিলেন। 'মেদ মৈনাক'। ওজনে প্রায় সাড়ে তিন মণ। কিন্তু দেহে অমিত শক্তি ছিল তাঁর। দুআঙ্গুলে কড়ি টিপে গুঁড়িয়ে দিতেন। এক ইঞ্চি মোটা লোহার গরাদ বেঁকিয়ে দিতেন। আকাশে উড়ন্ত পাখিকে বন্দুকের গুলিতে ধরাশায়ী করতেন। সকালে চার ঘণ্টা আর রাত্রে তিন ঘণ্টা গোলাপ জলে ধোওয়া কোমটে বসে ডিটেকটিভ নভেল পড়তেন। অর্শ হওয়ার ভয়ে মলনিঃসরণের জন্য বেগ দিতেন না। সাত-আট জন বলিষ্ঠ বাঙালী যুবক পার্শ্বচর ছিল তাঁর। তারা মাসে মাসে বেতন পেত। মেসে বিনা পয়সায় খেত, সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোত। বিকেলে জমিদারবাবুর সঙ্গে কুস্তি করত। তিনি তাদের কুস্তির প্যাঁচ শেখাতেন। দু হাতে দুটো আধমণ ওজনের গদা ভাঁজতেন। চার-পাঁচ শ বার ডনবৈঠক করতেন। সন্ধ্যার পর বৈঠকখানায় বসে বিখ্যাত কুস্তিগীর এবং সাধুসন্তদের অলৌকিক গল্পে মশগুল থাকতেন। বছরের পাঁচ-সাত মাস লটবহর সমেত ভারতের বিভিন্ন তীর্থক্ষেত্রে বা স্বাস্থ্যকর স্থানে বায়ু সেবন করতেন। এঁদের একটু সামান্য অসুখ করলে মোটা ফি দিয়ে কলকাতা থেকে বড় ডাক্তার আনাতেন।

এঁরা পুরুষানুক্রমে ইংরেজের কাছে 'রাজা' খেতাব পেয়ে এসেছিলেন। খেতাবের শূন্যগর্ভ অহমিকায় ধরাকে সরা জ্ঞান করতেন। গরীব প্রজাদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলা অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতেন। জমিদারির ভিতর এখানে একটা জলাশয়, ওখানে একটা খাল-নালা কাটিয়ে দিতেন। কোথাও একটা শিবমন্দির বা মেটে রাস্তা নির্মাণ করতেন। ইস্কুল ও পাঠশালা

বসাতেন। এই ভাবে আয়ের কিছুটা অংশ জনহিতকর কাজে ব্যয় করে প্রজাদের সন্তুষ্ট রাখতেন। ইংরেজের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়ে এঁরা তাদের উপর চোখ রাঙ্গাতেন। এঁদের বিষ ছিল না, কুলোপানা চক্র ছিল।

এঁদের ধার-করা ক্ষমতার চটক ছিল। এঁদের বাড়িটা ছিল যেন একটা বিরাট প্রতিষ্ঠান। এতে ছিল খানসামা খিদমতগার মশাল্‌চী বেয়ারা দারোয়ান পুরোহিত বরকন্দাজ মেথর মালী আর পার্সোনেল স্টাফ অর্থাৎ খোশামুদের দল। এদের ভিতর দুটো ভাগ—বড় তরফ আর ছোট তরফ। ভৃত্যতন্ত্রের প্রধান ব্যক্তি দামু খানসামা ছিল ছোট তরফের বিশ্বস্ত তাঁবেদার। সে ছিল একাধারে গোয়েন্দা, মন্ত্রণাদাতা, গিন্নী, ঐতিহ্যের চালক, বাহক ও ধারক। তারই কৃপায় ছোট জমিদারবাবু শ্রবণেন্দ্রিয় দিয়ে দর্শনেন্দ্রিয়ের কাজ চালাতেন। কর্মচারীদের ঘরের হাঁড়ির খবর তার জানা ছিল।

দিনের পর দিন বছরের পর বছর বয়ে চলত সিংহগড়ের জমিদারদের জীবন-স্রোত এক ভাবে একই খাতে। তাঁরা দারোগা থেকে জেলার জজ ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত গভর্নমেণ্টের বড় মেজ ছোট কর্মচারীদের খুব খাতির করতেন। খাতির সম্মান এবং চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়ের লোভে তাঁরা প্রায়ই জমিদার-বাড়ির আতিথ্য গ্রহণ করতেন। জমিদারদের কাছে মাছ মাংস অস্পৃশ্য ছিল। বড় বড় দীঘিতে এক মণ সোওয়া মণ ওজনের মাছ পোষা থাকত। লোকে বলত মাছের গায়ে না কি চুল গজিয়েছে! গায়ে পোকা হয়ে মাছ মরে ভেসে উঠত। তাকে তুলে এনে ফলের গাছের গোড়ায় পুতে সার দেওয়া হত।

প্রথমে শিবনাথ চাকরি-স্থলে একাই এসেছিলেন। বিদেশ-বিভুঁইয়ে বাড়ির বউকে পাঠানো উচিত নয় ভেবে রামজয় শিবানীকে বাসায় পাঠান নি। তাকে নিজের কাছে আনার জন্য শিবনাথের মন অস্থির হয়ে উঠলেও দেশাচার ও বাবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কিন্তু নতুন চাকরিতে তাঁর মন বসতে পারছিল না।

স্কুলের ভিতরের অবস্থা শোচনীয় ছিল। হেড্‌মাস্টার হলেও শিবনাথ ছিলেন সকল মাস্টারের চেয়ে বয়সে ছোট। তাদের মধ্যে অনেকে ছিল বুড়ো ঝানু স্থানীয় লোক। স্কুলে অনিয়ম অব্যবস্থা আর স্বৈরাচারের রাজত্ব চলছিল। দু-একজন ছাড়া কোন মাস্টার সময়ে আসত না, নির্দিষ্ট সময়ে ক্লাসে যেত না, পড়াত না। কেউ টেবিলের উপর পা তুলে দিয়ে নাক ডাকাত। একজন বুড়ো মাস্টারের মুখে মদের গন্ধ পাওয়া যেত। তাদের

ভিতর দু একজন জমিদারদের মাস্টার ছিল। একজন মাস্টার পরীক্ষার সময় গার্ড দিতে গিয়ে ঘোড়ার মতো দাঁড়িয়ে ঘুমোবার কৌশল আয়ত্ত করেছিল।

হেড্‌মাস্টারির টেক্‌নিক শিবনাথের জানা ছিল না। জ্যোতিষবাবুর আদর্শ তাঁর সামনে ছিল। জ্যোতিষবাবু ছিলেন হিমালয়ের মতো গম্ভীর। নিচের ক্লাসের মাস্টারদের সঙ্গে হেসে কথা বলতেন না। কারোর সঙ্গে মিশতেন না। বই আর এস্রাজ তাঁর সঙ্গী ছিল। তিনি ছিলেন কর্তব্যে অটল, অধ্যাপনায় নিষ্ঠাবান, ঘড়ির কাঁটার মতো সময়ানুবর্তী, পোষাক-পরিচ্ছদে নিখুঁত। জমিদারবাবুরা প্রকৃতপক্ষে মাস্টারদের উপর সন্তুষ্ট ছিলেন না। তবে চক্ষু-লজ্জার খাতিরে কিছু বলতেও পারতেন না। শিবনাথবাবুর কড়াকড়িতে তাঁরা মনে মনে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। ফাঁকিবাজ মাস্টাররা নতুন হেড্‌মাস্টারের জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়ল। প্রথমে একটু বিদ্রোহের ভাব দেখা দিয়েছিল। ছোট জমিদারবাবুর কাছে প্রশ্রয় না পেয়ে সকলে ঢিট হয়ে গেল। দু-তিন মাসের মধ্যে স্কুলে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতা দেখা দিল। নিয়মের দাপট সহ্য করতে না পেরে কয়েকজন বাস্তুঘুঘু বিদায় নিল। দু-এক-জন বৃদ্ধ জরদ্গবকে কিছু টাকা দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হল। তিন জন তরুণ শিক্ষক নিযুক্ত হল। শিক্ষায়তনের মরচে-পড়া যন্ত্রটিকে ঘষে-মেজে ঠিক করে দেওয়া হল। স্কুলের জীর্ণ দেহে নতুন রক্তের সঞ্চার হল। লোকে বলতে লাগল, আমাদের নতুন হেড্‌মাস্টার ছেলেমানুষ হলে কি হয়, সে স্কুলের চেহারা পাল্‌টে দিয়েছে।

মান্ধাতার আমল থেকে এই স্কুলের হেড্‌মাস্টারের বেতন এক শ আর সেকেণ্ড মাস্টারের বেতন ষাট টাকা চলে এসেছিল। সেকেণ্ড মাস্টার শচীনবাবু অঙ্কের ভালো মাস্টার। তাঁর আমলে কোন ছেলে অঙ্কে ফেল হত না।

সরল প্রাণখোলা আমুদে প্রৌঢ় লোক। বাড়ি কোন্নগরে। তাঁর উপর মা ষষ্ঠীর অকৃপণ কৃপা বর্ষিত হয়েছিল। ডজনখানেক ছেলেমেয়ে। দশ বছরে একটি টাকাও মাইনে বাড়ে নি। তবে সিংহগড়ে জিনিসপত্র খুব সস্তা ছিল। এস্টেট থেকে বিদেশী কর্মচারীরা এক টাকা মণে ধান পেত। বাজারে এক পয়সায় দেড় সের বেগুন, ছ পয়সায় এক সের গোল আলু, এক টাকায় চারটে ইলিশ মাছ, চার আনায় এক সের পোনা মাছ, দু পয়সায় এক সের দুধ, সরষের তেল চার আনায় এক সের, আর এক টাকায় চোদ্দ ছটাক খাঁটি গাওয়া ঘি পাওয়া যেত। ডাক্তারের ফি লাগত না। জমিদারদের

হাসপাতাল থেকে বিনা পয়সায় ওষুধ পাওয়া যেত। মাইনে কম পেলেও মাস্টাররা সন্তুষ্ট ছিল। অভাবের তাড়নায় বেতন বাড়ানোর জন্য তাদের ধর্মঘট বা মিছিল বের করে ধ্বনি দিয়ে রাস্তায় বেরোতে হত না। শচীনবাবু শিবনাথকে ছোট ভাই-এর মতো ভালবাসতেন। তিনি শিবনাথের ডান হাত ছিলেন। এক জোড়া চটি জুতো ও একটি গলাবন্ধ কালো কোট তাঁর সম্বল ছিল। সেকালে স্কুল ইনস্‌পেক্টারেরা সাহেব ছিল। স্কুল পরিদর্শনের সময় উঁচু ক্লাসের মাস্টারদের কোট পেণ্টালুন পরে আসতে হত।

দশ বছর আগে এখানে প্রথম চাকরি করতে আসার সময় শচীনবাবু প্যাণ্ট কিনতে চাঁদনিতে যান। তিনি পাঁচসিকে দামের একখানি জিনের প্যাণ্ট বেছে নিলেন। দোকানদার বলেছিল—বাবু, এই দেড় টাকা দামের প্যাণ্টখানা নিন। ছিঁড়ে-কুটে দু বছর পরবেন। আর পাঁচসিকে দামের প্যাণ্টটা টেনেটুনে এক বছর চলবে। শচীনবাবু রসিক লোক ছিলেন। তিনি হেসে বললেন, যাচ্ছি তো বাবু ষাট টাকা মাইনের মাস্টারি করতে। ইনস্‌পেক্টার এলে প্যাণ্ট পরতে হয়। ইনস্‌পেক্টার বছরে একবার আসে। পাঁচসিকে দামের প্যাণ্টটা তাহলে ৩৬০ বছর পরা চলবে। এই কম দামী প্যাণ্টখানা দিন। দোকানদার হাসতে লাগল।

শিবনাথের আসার কয়েক মাস পরে একজন সাহেব ইন্‌সপেক্টার স্কুল পরিদর্শন করতে এসেছিল। শচীনবাবু প্যাণ্টখানি কাচিয়ে তুলে রেখেছিলেন। ক্রমাগত ব্যবহারের জন্য তাঁর কালো কোটের ঘাড় ও হাতার রঙ ফিকে হয়ে গিয়েছিল। শচীনবাবু এ-বাড়ি ও-বাড়ি ঘুরে কোন রকমে এক জোড়া বুট জুতো এবং একখানি ভালো কোট যোগাড় করলেন। কোথাও একখানি শার্ট পাওয়া গেল না। বুট জুতো তাঁর পায়ের চেয়ে বড় ছিল। তিনি ন্যাকড়া গুঁজে জুতো পরলেন আর তাঁর রঙ-চটা কালো কোটটির উপর ধার করা ভাল কোটটি চড়িয়ে দিয়ে স্কুলে উপস্থিত হলেন।

ইনস্‌পেক্টার ফার্স্ট ক্লাসে ঢুকে দেখলেন শচীনবাবু বিপুল উদ্যমের সঙ্গে বোর্ডে অঙ্ক কষে ছেলেদের বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

সাহেব জিজ্ঞাসা করল, হোয়াট্ আর ইউ টিচিং?

শচীনবাবু বললেন, আই অ্যাম টিচিং অ্যাল্‌জেবরা, স্যার।

সাহেব শচীনবাবুকে আপাদমস্তক দেখতে লাগলেন। পরে আশ্চর্য হয়ে

বললেন, হোয়াট্! আর ইউ ওয়েরিং এ কোট আপন এ কোট? ভেরি ফানি, ইনডিড্!

শচীনবাবু তখনই উত্তর দিলেন, ইয়েস, বিকজ আই হ্যাভ নো শার্ট স্যার।

সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। দ্যাটস্ অল রাইট, বলে অন্য ক্লাসে চলে গেলেন।

শচীনবাবুর বড়মেয়ের ডাক নাম ছিল নেড়ী। তিনি শতমুখে নেড়ী মার গল্প করতেন। শচীনবাবু পৃথিবীতে আর নেই। তাঁর প্রাণখোলা হা হা হাসি এবং অমায়িক ব্যবহার শিবনাথ জীবনে ভুলতে পারেনি।

শিবনাথের সিংহগড়ে আসার একমাস পরে শশিভূষণ তার মাস্টারির কথা শুনে রামজয়কে বলেছিলেন শিবু কাজটা ভাল করেনি। আর একটা বছর নাককান গুঁজে কাটিয়ে আইন পরীক্ষায় পাস করে ওকালতি করলে তার ভবিষ্যৎ ভালো হত। এত পড়াশুনা করে শেষে কিনা মাস্টারি! মাস্টারির মতো বাঁজা চাকরির আয় নেই। এক শ টাকায় আরম্ভ আর এক শ টাকায় শেষ। আমার সেরেস্তায় বসে ওকালতনামায় সই করেও হেলা-ফেলা করে রোজ পাঁচ-ছ টাকাও তো হত! আরে ছি-ছি! এমন চাকরিও মানুষে করে? এখন এক শ টাকা খুব বেশী মনে হচ্ছে কিন্তু দুদিন পরে ছেলে-পুলে হবে, সংসার বাড়বে, তখন কি আর ঐ টাকায় চলবে? চিরকাল কি জিনিসপত্রের দাম এত সস্তা থাকবে?

—জীবনটা দুঃখেই কাটবে। এখন বড় হয়েছে। লেখাপড়া শিখেছে। যা ভাল বোঝে করুক। আমার কি? আমি আর কদিন!

রামজয় জামাইকে ভয় করতেন। আর কোন উচ্চবাচ্য না করে চুপ করে রইলেন।

॥ কুড়ি ॥

শিবনাথের খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা শুনে রামজয় প্রথমে মন্দাকিনীকে সিংহগড়ের বাসায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। গৃহস্থবাড়ির বউ শিবানীকে কি বিদেশে পাঠানো উচিত? সিংহগড়ে আসার কিছুদিন পর থেকে মন্দাকিনীর শরীর খারাপ হয়েছিল। মাঝে মাঝে ম্যালেরিয়া জ্বর হত। সংবাদ পেয়ে রামজয় অগত্যা বড় বউকে বাসায় পাঠিয়ে দিতে মনস্থ করলেন।

শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসব দেখতে গিয়ে কলেরায় চঞ্চলার মায়ের মৃত্যু হয়েছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর কয়েকমাস মূর্ছা রোগে ভুগে শ্যামাচরণও মারা গেছে। তার ছেলে দুর্গাচরণ কটক ক্যাম্বেল কমপাউণ্ডারি পড়তে গিয়েছে। ওদের দেশের বাড়িতে এখন আর কেউ থাকে না। রামজয় চঞ্চলাকে নিজের কাছে এনেছেন। দুষ্টু হলেও সে তো ঘরের বউ। তাকে ফেলবেন কেমন করে? একটার পর একটা আঘাতে চঞ্চলা এখন অনেকটা মুষড়ে গিয়েছে। এখন তার আর সে ঝাঁজ নেই। সে এখন আর নেহাৎ ছেলেমানুষ নয়। সংসার যে কত বিচিত্র সে এখন কতকটা বুঝতে পেরেছে। তার বালিকাসুলভ দুরন্তপনা অন্তর্হিত হয়েছে। সে এখন গৃহস্থালির কাজে মন দিয়েছে। শ্বশুর-শাশুড়ীকে মেনে চলেছে।

রামজয়ের চিঠি পেয়ে শিবনাথ সেদিন বিকেলে দেশের বাড়িতে উপস্থিত হয়েছেন। শিবানী শুনেছে তাকে বাসায় নিয়ে যাওয়া হবে। শিবনাথকে আসতে দেখে তার বুকখানা দুরু দুরু করে উঠেছিল। সে তখন উঠনে বসে দুটি প্রকাণ্ড মাটির হাঁড়িতে ধানসিদ্ধ করছিল।

পরদিন সন্ধ্যার পর খেয়েদেয়ে তারা গরুর গাড়িতে রওনা হল। বিদায় দেবার সময় ভবতারিণী আঁচলে বার বার চোখ মুছতে লাগলেন। রামজয় বলেছিলেন, আজ আমাদের বড় সুখের দিন। আশীর্বাদ কর ওরা সুখী হোক। চোখের জল ফেলে ওদের অকল্যাণ ডেকে এনো না।

প্রথমে ধান-কাটা মাঠের উঁচুনিচু 'নিক' ধরে, তারপর সেই জেলা-বোর্ডের বুকউঁচু এবড়ো-খেবড়ো রাস্তায় গাড়ি চলতে লাগল মন্থরগতিতে। কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশীর রাত্রি। জনমানবহীন রাস্তা। ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝে মাঝে দু-একখানা চলন্ত গরুর গাড়ির বলদের গলায় ঘুন্টির টুনটুন শব্দ। এখানে ওখানে পথ-কুকুরের আর্তনাদ। ঝিল্লীরব। পেঁচার কর্কশ ডাক। শিবানী দু-একটা কথা বলেন। শিবনাথ বিরক্ত হন। বলেন, এত লজ্জা কেন? লজ্জা কাকে? গাড়োয়ানটা তো বসে বসে ঝিমোচ্ছে। গরু আপন মনে গাড়ি টেনে চলেছে। শিবানীর ভয় পাছে চোর-ডাকাত জিনিসপত্র কেড়েকুড়ে নেয়। মারধোর করে। শিবনাথ তো একলা মানুষ। কি করবেন তিনি এই আঁধারে তেপান্তরের মাঠে? শিবানীর ঘুম হয় না। গা ছম ছম করে। শিবনাথ সাহস দেন। শিবানী বলেন, বাবা লক্ষ্মী-জনার্দনের ইচ্ছায় ভালোয় ভালোয় রাত কাটুক চুপ করে পড়ে থাক। ভোর হোক। কথা বলার অনেক

সময় আছে। আগে প্রাণে বেঁচে বাসায় যাই। তারপর দিনরাত এত কথা বলব যে তোমার কান ঝালাপালা হয়ে উঠবে। আট বছর প্রায় বোবা ছিলাম। এবার স্বদেশী বক্তার মতো এত কথা বলব যে তুমি বাড়ি ছেড়ে পালাতে পথ পাবে না। সাত-আট বছরের কথা। অনেক অফুরন্ত রকমারি সুখ-দুঃখের কথা। দুঃখেরই বেশী, সুখের অল্প। এখন চুপটি করে পড়ে থাক। তোমার দুটি পায়ে পড়ি লক্ষ্মীটি আমার! ঠাকুর-ঠাকুর করে রাতটা কাটুক। তারপর কথা হবে। এখন বিরক্ত কর না।

দীর্ঘ ছটি বছর কেটেছে তাদের নির্বাক আলাপে। এই একটি দিনও তাদের বিশ্রম্ভালাপের সুযোগ হল। এই রাত্রিতে শিবানীকে এত কাছে পেয়েও কথা বলবার সুযোগ পাচ্ছে না দেখে শিবনাথ বললেন, আগে তুমি আমার একটা কথার উত্তর দাও, তারপর চুপ করব বিরক্ত করব না। কতদিন কতবার ভেবেছি জিজ্ঞাসা করব। সুযোগ হয়নি। এখানে আর কেউ নেই। শুধু তুমি আর আমি। শিবানী প্রশ্ন শোনার জন্য উৎকর্ণ হয়ে রইলেন। শিবনাথ বললেন, আমাদের দরিদ্রের সংসার। অভাব অভিযোগ লেগেই ছিল। দশ থেকে ষোল বছর বয়স পর্যন্ত এই ছ বছর তুমি কত কষ্ট পেয়েছ, কত নির্যাতন ভোগ করেছ তা আমি জানি। বাপের বাড়ি নেই, কোন আত্মীয়-স্বজন নেই যে দুদিন হাড় জুড়োতে যাবে। কি আশা তোমার মনে সান্ত্বনা দিয়েছিল?

গাড়ির ভিতর বিছানার উপর তাঁরা পাশাপাশি বসেছিলেন। শিবনাথ একটা সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই জ্বাললেন। দেশলাই কাঠির স্বল্পালোকে শিবনাথ দেখলেন, শিবানী ষোলটি বসন্তের উদার প্রাচুর্যভরা যৌবনোজ্জ্বল ঢলঢলে চোখের আবিষ্ট চাহনি স্বামীর মুখের উপর মেলে দিয়েছেন। আবেগ কুণ্ঠিত স্বরে শিবানী ধীরে ধীরে বললেন, শ্বশুরঘর করতে আসার পর প্রথম দু-তিন বছর যেন আমার দম বন্ধ হয়ে আসত। তুমি মাঝে মাঝে বাড়িতে আসতে, থাকতে, খেতে, শুতে, চলে যেতে। কথা বলতে ইচ্ছে হত কিন্তু কোথায় বলব, কি বলব, কখন বলব ভেবে পেতাম না। তুমি ছাড়া ওখানে আমার আপনার কেউ ছিল না জানতাম। বয়স বাড়ার সঙ্গে ভেবেছিলাম একদিন না একদিন তুমি আমাকে চাইবে। আমি তোমাকে আপনার করে পাব। এই জ্ঞানটুকু হওয়ার পর থেকে ভবিষ্যতের সুখচিন্তায় আমার কষ্ট অনেকটা লাঘব হতে লাগল। ভাবতাম, আরও দু-একটা বছর

সহ্য করে যাই। তোমার পড়া শেষ হবে, তুমি চাকরি করবে। তুমি নিশ্চয়ই আমাকে তোমার কাছে নিয়ে যাবে। আমার সব দুঃখ শেষ হবে। মাঝে মাঝে তোমার উপর অভিমান যে না হত তা নয়। তবে সেটা ক্ষণিক মেঘের মতো কোথায় মিলিয়ে যেত। আমার কথা শোনা হল তো? তারপর হাসতে হাসতে বললেন,

আমার কথাটি ফুরোলো,
নটে গাছটি মুড়োলো।

শিবনাথ বললেন, এত শীগ্‌গীর নটে গাছটা মুড়োলে কেন? গরুর গাড়িতে তো ছাগল নেই। নতুন রসে আজ থেকে শুকনো গাছটা গজিয়ে উঠল যে।

শিবানী কাতর কণ্ঠে বললেন, দেখ, আমার বড় ভয় করছে। নির্বান্ধব পুরীর অন্ধকারের ভিতর দিয়ে আমাদের এই একখানা মাত্র গাড়ি ঢুকঢুক করে চলছে। ভালোয় ভালোয় রাত পোহালে বাঁচি। এখন তুমি লক্ষ্মী ছেলেটির মতো চুপচাপ শুয়ে পড় দেখি। আর বিরক্ত করো না।

শিবনাথ শুয়ে পড়লেন। ভয়ে শিবানীর বুক কাঁপে। কান খাড়া করে জেগে বসে থাকেন। চারদিক নিঝুম। মাঝে মাঝে রাস্তার পাশের গাছের ডালে ঘুমন্ত পাখির ডানার ছটছট শব্দ শুনে তিনি চমকে ওঠেন। মাঝে মাঝে গাড়োয়ানটা জেগে ওঠে। গরুর পিঠের উপর সপাৎ সপাৎ চাবুক মারে। পরক্ষণেই নাক ডাকায়। ঘুমে শিবানীর চোখ জুড়ে আসে। শিবনাথের পাশে শুয়ে পড়েন। ঘুমের ঘোরে তিনি শিবানীকে জড়িয়ে ধরেন। শিবানী নিঃশব্দে আত্মসমর্পণ করেন। বাহুবন্ধনে ধরা দেন। যে নিগূঢ় প্রেম এতকাল নেপথ্যে লুকিয়েছিল তার পর্দা উঠে গেল। কখন সকাল হয়ে গেছে তাঁরা জানতে পারেন নি। সুখনিদ্রা ভেঙে গেল। দুজনেই উঠে বসলেন। নবোদিত সূর্যের আলো তাঁদের মনে যেন সোণা মাখিয়ে দিল। তাঁদের চোখে আজ পৃথিবী সুন্দর। আকাশ মধুময়। জীবনের তুচ্ছতা দুঃখ অন্তর্হিত— চারদিকের গাছপালা, পশুপক্ষী, পথচারী লোকজন অপরূপ রূপে দেখা দিল। বিশ্ব নতুন হয়ে উঠল। গাড়ি এসে থামল বাসার সামনে খেলার মাঠের ধারে। মন্দাকিনী আনন্দে ছুটে এলেন। দুজনকে নিয়ে বাসার ভিতরে গেলেন।

নতুন ঘরকন্না পাতার নিস্তব্ধ আনন্দে শিবানীর হৃদয় ভরপুর। নতুন জীবনের রসাস্বাদে উভয়ের হৃদয় শান্তিতে ডুবে গেল। সংসার খরচের টাকা মন্দাকিনীর হাতে থাকে। বাড়িভাড়া লাগে না। সস্তাগণ্ডার বাজার।

কুড়ি টাকায় সুখে স্বচ্ছন্দে তিন জনের সংসারটি চলে। কলকাতায় ছোট ভাইয়ের পড়ার খরচ দিতে হয়। দেশে টাকা পাঠাতে হয়। তা সত্ত্বেও প্রতি মাসে কিছু টাকা উদ্বৃত্ত হয়।

ননদ-ভাজ যেন মা ও মেয়ে! শিবানী মন্দাকিনীর মাতৃহৃদয়ের শূন্য স্থান জোড়া করেছিলেন। তাঁর কৃষ্ণা বেঁচে থাকলে সেও তো শিবানীর মতো এত বড় মেয়ে হত। তার মুখখানিও তো শিবানীর মুখের মতো। তার গায়ের রঙ, মাথার চুল, ভ্রূ, নাক, চোখ দুটি, সবই তো শিবানীর মতো। একদিন মন্দাকিনী শিবানীকে জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, তোর ভিতর আমার কৃষ্ণা বেঁচে আছে। স্বামী থাকতেও আমি স্বামীহারা, গৃহ থাকতেও গৃহহারা। তিনি আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন। শিবানীর চোখ জলে ভেসে গিয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, ঠাকুরঝি, ন বছর বয়সে আমি মা-বাপ হারিয়েছি। আপনার বলতে পৃথিবীতে কেউ ছিল না আমার। আমি একা। অনেক সময় ভেবেছি। ভগবান কি আমাকে আকাশ থেকে পৃথিবীর উপর ফেলে দিয়েছিলেন? তোমার ভিতর আমার হারানো মাকে ফিরে পেয়েছি। এইভাবে তাঁদের মধ্যে একটি মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

সুখে আনন্দে ও শান্তিতে তাঁদের প্রথম জীবনের দিনগুলি ধীরে ধীরে অতিবাহিত হতে লাগল। শিবানীর একটি খোকা হয়েছে। দেশের বাড়িতে চঞ্চলার একটি মেয়ে হয়েছে। ভগবানের এ কি বিচার! একই পরিবারের বড় ভাই একটির পর একটি পাস করেছে, টাকা রোজগার করছে। আবার একটি ছেলের বাপ হয়েছে। আর ছোট ভাই দাদার পয়সায় পড়ছে। বার বার ফেল হচ্ছে। টাকা রোজগারের নামগন্ধ নেই। কবে উপায় করবে আর কত উপায় করবে তা ভগবান জানেন। আবার প্রথমে মেয়েও হয়েছে! পোড়া কপাল আর কি!

রামজয়ের আনন্দের অন্ত ছিল না। তাঁর দুঃখের সংসারে সুখের আলো দেখা দিয়েছে। ভবতারিণীর আনন্দ ধরে না। রামজয় বলেছিলেন, লক্ষ্মী-জনার্দনের দয়ায় খোকা বংশের নাম উজ্জ্বল করবে। ভবতারিণী বলেছিলেন, মা-ষষ্ঠীর কৃপায় খোকা চিরজীবী হবে। তার সোণার দোয়াত কলম হবে। গাঁয়ের লোক বলেছিল—

সুখের হদ্দ নাতি
ধনের হদ্দ হাতি।

॥ একুশ ॥

প্রথম মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসর। দেশে নিরাপত্তা রক্ষার জন্যে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট হাজার হাজার যুবককে আটক রেখেছে। জেলার গোয়েন্দা বিভাগের লোক সাদা পোষাকে আত্মগোপন করে আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অপরিচিত কোন ভদ্রলোককেও মানুষ সন্দেহ করে। গোয়েন্দা বিভাগের এক সাব ইন্‌স্‌পেক্টর ঘন ঘন যাতায়াত করত। সকলেই তাকে চিনে রেখেছিল। ছেলেরা তাকে 'মামা' বলত। মামা এসেছে রে, বললে সকলেই সাবধান হত। পূর্ববঙ্গের কোন ছেলে স্কুলে পড়লে তার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা হত। সে কার কাছে থাকে, কেন থাকে, তার সঙ্গে সম্বন্ধ কি, তার সঙ্গে কোন্ ছেলে ঘোরে, বেড়ায়, তার বন্ধু কে ইত্যাদি সংবাদ পুলিসের লোক জিজ্ঞাসা করলে হেড্‌মাস্টারকে বলতে হত। প্রায় প্রতিদিন শোনা যেত পুলিস বোর্ডিং সার্চ করবে। স্কুলের বোর্ডিং-এ প্রায় কুড়ি-পঁচিশটি ছেলে থাকত। শিবনাথ বোর্ডিং-এ গিয়ে ছেলেদের বই খাতা ট্রাঙ্ক খুঁজে দেখতেন। তাদের আত্মীয় বন্ধুদের চিঠিপত্র পুড়িয়ে দিতেন। পুলিস এমন কি গীতার মধ্যেও রাজদ্রোহিতার গন্ধ পেত। দেশের যুবকরা সশঙ্কিত থাকত। স্কুলের উপর ক্লাসের ছেলেরা গ্রেপ্তারের জন্যে প্রস্তুত থাকত। সর্বত্র ভয়, সন্দেহ, শঙ্কা। পুলিস কখন কাকে ধরে নিয়ে যাবে, এই চিন্তায় সকলে উদ্বিগ্ন থাকত।

মাঘ মাসের প্রথম। ভোরে কুয়াশায় চারদিক আচ্ছন্ন। শিবনাথ বেড়িয়ে বাড়ি ফিরছেন। রাস্তায় লোকজন ছিল না। দূরে কুয়াশার ধূম্রজালের ভিতর দিয়ে তিনি দেখলেন, একটি অস্পষ্ট মানুষের আকৃতি তাঁর দিকে এগিয়ে আসছে। দু-তিন মিনিটের মধ্যে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি তাঁর সামনে উপস্থিত হল। ডান হাতে কমণ্ডলু। বাঁ হাতে দণ্ড। পায়ে খড়ম। পরনে গেরুয়া। গায়ে গৈরিক চাদর। ওষ্ঠাধরে ঈষৎ হাসির বিদ্যুৎ রেখা। ক্রমে কুয়াশা অন্তর্হিত হল। নবোদিত সূর্যের সোনালি আলোর বন্যায় আকাশ, মাঠ, গাছপালা ভেসে গেল। শিবনাথের মন

নানা প্রশ্নে আন্দোলিত। কে এই সন্ন্যাসী? ইনি তো সাধারণ সন্ন্যাসী নন! জমিদারদের অতিথিশালায় মাঝে মাঝে কাঁটা-চিমটেধারী ভস্মমাখা সন্ন্যাসী আসে। সামনে ধুনি জেলে বসে থাকে। গাঁজায় দম দেয়। ডাল রুটি খায়। তারপর চলে যায়। কিন্তু এঁর দেহে স্বর্গীয় দ্যুতি। এঁর মুখের উপর পবিত্রতার চিহ্ন, শুচিতার ছাপ। কে এই মহান পুরুষ? ইনি কি কোন দেবদূত? ধূলিমলিন পৃথিবীতে নেমে এসেছেন অমরাপুরী থেকে? শিবনাথ মৌন, নিস্তব্ধ।

সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করলেন, আপনার নাম শিবনাথ বাবু? আপনি তো এখানকার স্কুলের হেড্‌মাস্টার। আমি আপনার কথা শুনেছি।

শিবনাথের চমক ভেঙ্গে গেল। তাঁকে প্রণাম করে বললেন, আজ্ঞে হাঁ, আমার নাম শিবনাথ। সিংহগড় তীর্থস্থান নয়। এখানে কোন প্রসিদ্ধ দেবমন্দির নেই। কোন পবিত্র নদী নেই। এখানকার সাধারণ মানুষ খায়-দায়, মাঠে খাটে। এখানকার জমিদাররা প্রজাদের নিকট খাজনা আদায় করে, রাজস্ব দেয়। বাকি টাকা নিয়ে বিলাসিতায়, দেশ ভ্রমণে, সত্য বা কাল্পনিক রোগের চিকিৎসায় ব্যয় করে। এখানে আপনার মতো সন্ন্যাসী আসবেন কেন তা বুঝতে পারছি না।

সন্ন্যাসী বললেন, পরিচয় পরে পাবেন। আমি একজন ডেটিনিউ। এখন যাই। দেরি হয়ে যাচ্ছে। রোজ দুবেলা থানায় হাজিরা দিতে হয়। শিবনাথ প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিলেন। তিনি থানার দিকে দ্রুত চলে গেলেন। তাঁর চোখে কি এক মোহিনী শক্তি ছিল।

স্কুলের মাস্টার ও ছাত্রদের সঙ্গে ডেটিনিউদের মেশা বা কথা বলা নিষিদ্ধ থাকলেও শিবনাথ তাঁর সঙ্গে রাস্তায় দেখা করতেন। প্রতিদিন ব্রাহ্মমুহূর্তে সন্ন্যাসী খালের জলে স্নান করতেন। তারপর থানায় হাজিরা দিয়ে বাসায় ফিরতেন। আবার বিকেল পাঁচটায় থানায় যেতেন। শিবনাথ তাঁর সঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে নানা বিষয়ের আলোচনা করতেন। তিনি দেখলেন সন্ন্যাসী খাঁটি অদ্বৈতবাদী। আচার্য শঙ্করের পরম ভক্ত। একদিন কথায় কথায় তিনি বললেন, শিবনাথবাবু! আপনি বেদান্ত পড়েন না কেন? শিবনাথ বেদান্তের নাম শুনেছিলেন মাত্র। তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, শুনেছি, বেদান্ত দুরূহ শাস্ত্র। সংস্কৃত ভাষায় আমার জ্ঞান অল্প। এই সামান্য বিদ্যে নিয়ে কি বেদান্ত পড়া সম্ভব?

—নিশ্চয়ই সম্ভব। আপনি রোজ ভোরে আমার কাছে আসুন। আমি আপনাকে বেদান্ত পড়াব।

কালীবর বেদান্তবাগীশের শঙ্কর ভাষ্য সমেত বেদান্ত সূত্রের বঙ্গানুবাদ চারখণ্ড যোগাড় করা হল। শিবনাথ আগ্রহের সঙ্গে বেদান্ত পাঠ করতে লাগলেন। পুলিসের লোক স্বামিজীকে শ্রদ্ধা করত। তাঁর সঙ্গে মেলামেশার জন্যে তারা কোন দিন আপত্তি করে নি।

জেলার গোয়েন্দা বিভাগের বড়বাবু কলেজে শিবনাথের সহপাঠী ছিলেন। তাঁর কাছে শিবনাথ স্বামিজী সম্বন্ধে শুনেছিলেন যে তাঁর পূর্বাশ্রম ছিল পূর্ববঙ্গে। স্বদেশী যুগে তিনি একজন বড় কর্মী ছিলেন। পরে তিনি সক্রিয় আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। ব্রহ্মচারী অবস্থায় একটি স্কুলে মাস্টারি করতেন। তারপর কাশীতে গিয়ে সন্ন্যাস নিয়ে একটি আশ্রমে বাস করছিলেন। গভর্নমেণ্ট তাঁকে সেখান থেকে গ্রেপ্তার করে এনেছিল, ভেবেছিল, তিনি অন্য প্রদেশে গিয়ে বিপ্লবের পথ রচনা করছেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ইংরেজ গভর্নমেণ্ট বাংলা দেশের হাজার হাজার যুবককে অন্তরণ করে রেখেছিল। যে সকল ছেলে দামোদরের বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে নিজেদের জীবন বিপন্ন করে অসংখ্য দেশবাসীকে বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিল, অথবা স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল, তার পুরস্কার স্বরূপ গভর্নমেণ্ট তাদের গ্রেপ্তার করে বাংলা দেশের অস্বাস্থ্যকর স্থানে ডেটিনিউ করে রেখেছিল। বাংলা মায়ের সুসন্তান এই সব সোনার চাঁদ ছেলে। তাদের উপর পুলিস যে অকথ্য অত্যাচার করত, তা বিদেশী শাসকদের পক্ষেই সম্ভব। অন্তরণ অবস্থায় ম্যালেরিয়া টাইফাস যক্ষ্মা প্রভৃতি উৎকট ব্যাধিতে কত বলিষ্ঠ যুবকের জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়েছিল, কত বুদ্ধিমান হীরের টুকরো ছেলে পাগল হয়ে গিয়েছিল, তার হিসাব কে রাখে? পুলিস যাকে সন্দেহ করেছে তাকেই গ্রেপ্তার করেছে, আটক করে রেখেছে। তার উপর কত রকমের কঠোর নির্যাতনের মই চালিয়েছে। যুদ্ধ আরও কিছুদিন চললে বাংলা দেশের কোন তরুণ জেলখানার বাইরে থাকত না।

॥ বাইশ ॥

রথযাত্রা উৎসব। জমিদার-বংশের প্রধান উৎসব। এ অঞ্চলের সেরা পার্বণ। সাতটি চূড়াযুক্ত দারুময় বিরাট রথ। স্তরে স্তরে সজ্জিত ষোলটি চূড়া। সর্বোচ্চ স্থানে সপ্তদশ চূড়ার অভ্যন্তরে সমাসীন নানালঙ্কার-ভূষিত ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু বাস্তু-দেবতার সুদৃশ্য বিগ্রহ ওই পুণ্যদিবসে সহস্র সহস্র নরনারীকে মুক্তি দান করতেন।

প্রায় চার ইঞ্চি মোটা দু শ হাত লম্বা আটখানি কাছি রথের সঙ্গে শক্ত করে বাঁধা। বড় জমিদারবাবু কাছি ছুঁয়ে দিলে হাজার হাজার লোক কাছি ধরে রথ টানত। একবার কয়েকজন লোক রথের চাকার তলায় পড়ে পিষে গিয়েছিল। মেলার যত লোক মানুষখেকো রথের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে হুড়মুড় করে ছুটে পালিয়েছিল। রথ থামত প্রায় আধ মাইল দূরে গুঞ্জবাড়ির বাইরে। বিগ্রহকে নিয়ে বসানো হত গুঞ্জবাড়ির ভিতরে ঠাকুর দালানে। সামনের আটচালায় আট দিন ধরে যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা হত।

জমিদাররা বসতেন প্রায় এক হাত উঁচু গদির উপর। তার চেয়ে একটু নিচু গদি নির্দিষ্ট ছিল জমিদারবাড়ির ছেলেমেয়ে আর প্রথম শ্রেণীর কর্মচারীদের জন্যে। দ্বিতীয় শ্রেণীর কর্মচারী আর স্কুল মাস্টাররা বসতেন সাদা চাদর পাতা ফরাশের উপর। অল্প বেতনের কর্মচারী এবং সাধারণ শ্রোতাদের জন্যে ছিল শতরঞ্জি বা মাদুরের ফরাশ। চিকের আড়ালে জমিদার-গিন্নীদের এবং অন্য ভদ্র মহিলাদের জন্যে অনুরূপ ব্যবস্থা ছিল। জমিদার-বাড়ির উৎসব বা ক্রিয়াকর্মের সময় আসনের তারতম্য প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল।

রথের মেলায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগম হত। খোলা জায়গায় থাকত আনারস আম ও কাঁঠালের পাহাড়। হোগলার ছাউনিতে থাকত ফুল ও ফলের গাছের অসংখ্য চারা, কাপড়ের দোকান, টিনের বাঁশি, মাটি ও মোমের পুতুল টুকিটাকি জিনিসের বহু মনিহারী দোকান। আর একদিকের খোলা জায়গায় বিক্রির জন্যে প্রস্তুত থাকত

লাঙ্গলের ফাল, কাটারি, কুড়ুল, কাস্তে প্রভৃতি লোহার যন্ত্র ও হাতিয়ার, ঝোড়া, চুপড়ি, ধুচনি প্রভৃতি গৃহস্থালির জিনিস, মিষ্টি ও পাঁপর ভাজার স্টল। তাছাড়া বহু গাঁটকাটা জুয়াচোর গাঁজাখোর তেড়েল ও মাতালের আমদানি হত। আশপাশের গ্রামগুলির গৃহস্থ বাড়িতে দশ দিন ধরে লেগে থাকত মেলা-দর্শনার্থী আত্মীয়-কুটুম্বের ভিড়।

বোর্ডিং-এর উপর তলার একখানা ঘরে থাকতেন বোর্ডিং সুপারিনটেনডেন্ট নতুন সেকেণ্ড মাস্টারমশাই। বাড়ি বর্ধমান জেলায়। মাইনে বাঁধাধরা সেই ষাটটি টাকা। সমস্ত টাকাই বাড়ি পাঠাতেন। টিউসনির টাকায় বোর্ডিং-এর খরচ চালাতেন। বঁড়শিতে মাছ ধরার বাতিক ছিল তাঁর। রবিবার বা ছুটির দিন বঁড়শি মশলা চারকাঠি প্রভৃতি মাছ ধরার সাজসরঞ্জাম নিয়ে তিনি বেরুতেন কোন ছাত্রের বাড়ির পুষ্করিণীর সন্ধানে। কোন দিন সামান্য কিছু জলযোগ করে বা না খেয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত বকের মতো জলের ধারে বসে থাকতেন ফাতনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে। চোখের জল শুকিয়ে যেত। কোন দিন ফিরে আসতেন রিক্তহস্তে মলিন মুখে, আবার কোন দিন বা দু-একটা মাছ শিকার করে বিজয়ী বীরের মতো সদর্পে। মাছটা পাঠিয়ে দিতেন উপরে শিবানীর কাছে। অবশ্য নৈশ ভোজন বউদিদির ঘরেই হত। শিবনাথ বলতেন, আপনি মাস্টার মানুষ, ছুটির দিনটা এমন ভাবে না কাটিয়ে বই পড়লে তো হত। তিনি বলতেন, কি আর হত? ঐ তো ষাট টাকা, পুরুষানুক্রমে সেকেণ্ড মাস্টারের বাঁধা মাস মাইনে।

—আচ্ছা, বঁড়শিতে মাছ ধরলে কি সত্যি আনন্দ হয়, না নিছক সময় কাটানোর উপায়? নেই কাজ খৈ ভাজ তো?

—মাছ ধরার আনন্দ আছে বই কি। কাঁটায় গেঁথে মাছ খেলানোর কি মজা তা আপনি বুঝবেন না। দেশ জয়ের আনন্দ কেবল আলেকজান্দারের ভালো লাগত।

—বেশ আনন্দ! একটা প্রাণী যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে ছুটছে, আর আপনি তাতে সুখ পাচ্ছেন! স্বামিজী সেদিন বলেছিলেন, আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি হৃদয়হীনতা। পুরা কালের গ্রীক সভ্যতার ভিত্তি ছিল দাস। দাসত্বের উপর সে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। তার পতন অনিবার্য হয়ে পড়ল। আধুনিক রাষ্ট্রের বিলাস যুদ্ধ। আধুনিক সভ্য মানুষের

প্যাস্‌টাইম্‌ পশু শিকার আর বঁড়শিতে মাছ ধরা। সৈন্যরা ছুটে বন্দুক নিয়ে মানুষ মারতে, অসামরিক ভদ্রলোক ছুটে বন্দুক ঘাড়ে নিয়ে পশু শিকার করতে, আর বঁড়শির কাঁটায় মাছ গাঁথতে। স্বামিজী বলেন, দুটোই নৃশংস কাজ।

—স্বামিজীরা অমন অনেক কথা বলেন। এই জন্যেই তো স্বামিজীকে এড়িয়ে চলি। একবার ওঁদের খপ্পরে পড়লে আর রক্ষে নেই।

শিবনাথ হেসে বললেন, ও, তাই বুঝি আপনি আমাদের দলে ভিড়েন না?

—হাঁ, কি হবে ওসব দর্শন আর তত্ত্বকথার ঘ্যানঘ্যানানি শুনে? খাড়া-বড়ি-থোড় আর থোড়-বড়ি-খাড়া। সেই মামুলী কথা—সেই গীতা বেদান্ত সাংখ্য। তার টীকা-টিপ্পনী, ভাষ্য, ব্যাখ্যা বা অপব্যাখ্যা। মুক্তি আত্মা জীবাত্মা পরমাত্মা ধর্ম। পাপপুণ্যের দুর্বোধ্য প্যানপ্যানানি আর শুষ্ক তর্কের কচ্‌কচানি। শুধু কথার মারপ্যাচ। Mere words, words, words. সংসারে সংসারী হতে হবে। দু নৌকায় পা দিলে ডুবে মরতে হয়।

—তাহলে সংসারীর পক্ষে উচ্চ আদর্শ, সৎ চিন্তা বা ভাবের আলোচনার কোন প্রয়োজন নেই?

—প্রয়োজন যে নেই তা নয়। তবে প্রয়োজনটা দেশ কাল ও পাত্র হিসেবে।

—সে কেমন?

—এই দেখুন না হোমিওপ্যাথ অবিনাশ চাটুজ্যেকে। ভদ্রলোক যখন প্রথম হরিনাভি থেকে এসে এখানে ডাক্তারি করতে স্থরু করেছিলেন, তখন তাঁর ভিতর ধর্মের বাতিক ঢোকেনি। ভাল পসার হল। বেশ দু পয়সা উপায়-স্থপায় হতে লাগল। গৌড়ীয় মঠের এক বাবাজীর পাল্লায় পড়ে তাঁর কি হালটা হয়েছে দেখুন। মন্ত্র নিলেন। কণ্ঠি ধারণ করলেন। গলায় মোটা তুলসীর মালা ঝুলালেন। সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ মেরে চিতাবাঘ সেজে বসলেন। কলেরা রুগীকে দেখতে গিয়ে বলেন, ওষুধে কি মানুষ বাঁচে? ওষুধ দিতে হবে না। হরি-নাম কর। রোগের এমন মহৌষধ আর নেই। ফলে রোগ-রুগী উভয়েই সাবাড় হয়ে গেল। ঐ পাগলটাকে এখন আর কেউ ডাকে না। হরিনাম শোনার জন্যে মানুষ কি ফি দিয়ে

ডাক্তার ডাকে? আবার এই উৎকট হরিভক্তের উপর মা ষষ্ঠীর কৃপা আছে। পাঁচ গণ্ডা ছেলেপুলে। দুর্দশার সীমা নেই। ওঁকে দেখলে আমার রাগ হয়। ওঁর লম্বা চৈতনটা ধরে দু গালে দু থাপ্পড় বসিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। এর নাম কি ধর্ম, না উচ্চচিন্তা? আরে, বাবা, আগে সংসার ধর্ম পালন কর। তারপর অন্য ধর্ম।

—আমি ও রকম ধর্মের কথা বলিনি। উচ্চচিন্তা বা ধর্মকে বাদ দিলে মানুষের জীবনটা নিছক ভোগের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। সংসারে সমতা রক্ষা করে চলা চাই। নইলে দুর্দশা। জলন্ত দৃষ্টান্ত অবিনাশ চাটুজ্যে।

খাওয়ার ঠাঁই হয়েছে শুনে তাঁরা উঠে গেলেন। বোর্ডিং-এর বুড়ো উড়ে ঠাকুর তাঁদের পরিবেশন করছিল। কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ এই বৃদ্ধটি শিবানীর খুব প্রিয়পাত্র হয়ে উঠেছিল। তা দেখে শিবনাথ বললেন, ওই অকেজো লোকের উপর তোমার অত টান কেন?

শিবানী বললেন, আহা, ওর আপনার বলতে কেউ কোথাও নেই।

বুড়ো শিবানীর তিনটি ছেলেমেয়েকে কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছিল। তাঁর কাছে বুড়োর সাত খুন মাপ ছিল। লোকটির জন্ম বালেশ্বর জেলায়। ভিক্ষা করতে করতে এদেশে এসে পড়েছিল। মাসিক পাঁচ টাকা বেতনে বোর্ডিং-এর রান্নার কাজ জুটিয়ে নিয়েছিল। বুড়ো রোজ এক সিকি আফিং খেত। তার শিবানী-মা লুকিয়ে আফিং-এর খরচ যোগাতেন। বোর্ডিং-এর ছেলেদের খাওয়ার পর তেল মেখে গামছা কাঁধে দিয়ে দশটি পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে সে ছুটত আফিং দোকানের দিকে খড়মের ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে করতে। তারপর স্নান করে খেত ঠাণ্ডা ঢাকা ভাত। শিবানী রোজ একটু দুধ পাঠিয়ে দিতেন। বলতেন, আহা, আফিংখোর মানুষ। একটু দুধ না পেলে মরে যাবে যে। একসের দুধের দাম দু পয়সা হলেও এদের কাছে দুধ দুষ্প্রাপ্য।

বুড়ো ভাত খেত, আর তার সামনে বসে থাকত শিবানীর তিন বছরের মেয়ে কল্যাণী একখানি ছোট পিঁড়ির উপর। কল কল করে সে কত কথা বলত বুড়োর সঙ্গে। বুড়োই তার ভাষা বুঝত। ঐটুকু মেয়ে, তার কথা, তার হাসি বুড়ো শুনত আর হাসত। খাওয়ার পর কটকী জাঁতিতে কট্ কট্ শব্দে সুপুরি কেটে পান সাজত। দু তিনটে পান ও দোক্তা গালে পুরে দিয়ে খুকীকে বুকের উপর চড়িয়ে দড়ির খাটটায়

শুয়ে পড়ত। ঘুম থেকে উঠে তাকে কাক চিল বক দেখিয়ে দুধ খাওয়াত, আর জামা কাপড় পরিয়ে চলত ধীরে ধীরে খুকীর আঙ্গুল ধরে রাস্তায় বেড়াতে। চলতে না পারলে সে তাকে কোলে তুলে নিত বা কাঁধে বসিয়ে দিত।

মেয়েটা তার সমস্ত অন্তর মন জুড়ে বসেছিল। বুড়োর কাছে সে যে কি রস পেয়েছিল তা সেই জানত। সন্ধ্যার পর দুধ খেয়ে সে বসে থাকত একটা পিঁড়ির উপর; বোর্ডিং-এর রান্না ঘরে বুড়ো রাঁধত, সে খেলা করত, ঘটি-বাটি টানত, ছুঁড়ে ফেলত উঠনে। বুড়ো বিরক্ত হত না, হাসত। জিনিসগুলি কুড়িয়ে এনে তার কাছে রাখত। সে আবার ছুঁড়ত, বুড়ো আবার কুড়িয়ে আনত। তার বিরক্তি ছিল না। খেলা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লে তাকে কোলে তুলে নিয়ে শিবানীর কাছে দিয়ে আসত। ভোর হতে না হতেই সে এসে হাজির হত। বুড়োর মশারি তুলে তার দড়ির খাটিয়াটার উপর উঠে বসত। বুড়োর ঘুম কোথায় চলে যেত। আবার আরম্ভ হত তাদের সারাদিনের কাজ। এই ভাবে বুড়োর শুষ্ক নীরস জীবনের মরু-উদ্যানে দেখা দিয়েছিল ছোট্ট একটি ফুলের কুঁড়ি।

ওখান থেকে শিবনাথের চলে আসার পাঁচ বছর পরে বুড়ো এসেছিল তার খুকীকে দেখতে কিছু গুড়ের পাটালি নিয়ে। তখন তার শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে, আরও কুঁজো হয়ে পড়েছে। শিবানী তাকে অনুরোধ করেছিলেন তাঁর খুকীর কাছে থাকতে। সে বলেছিল, না, মা! আমি থাকব না। বুড়ো মড়া আমি। আপনাদের গলগ্রহ হতে চাইনি। আমি ওখানে পঁচিশ বছর আছি। ওখানকার মাটি আমার কেনা আছে। খুকী আমার সুখী হোক। আমি তার সঙ্গে শেষ দেখা করতে এসেছিলাম। আমার দিন এসে গেছে। শিবানীর কাছ থেকে দু-তিনটে টাকা আর দু-একখানা নতুন জামা-কাপড় নিয়ে সে শেষ বিদায় নিল। এর মাস তিনেক পরে শিবানী শুনেছিলেন বুড়ো জমিদারদের হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে নিজেকে নিজে বলেছিল—তোর ভালো বর হোক। তোর ভালো ঘর হোক। তুই সুখী হ।

প্রথম মহাসমর শেষ হয়ে গেল। রাজবন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হল। স্বামিজীও নিষ্কৃতি পেলেন। তিনি শিষ্যদের অনুরোধে কলকাতায় বাস করতে লাগলেন। কলকাতা তাঁর ভালো লাগল না। তাঁকে সিংহগড়ে

আনা হল। এই সময় জমিদার-বাড়িতে এক বৃদ্ধ সাধু এসেছিলেন। তিনি নাকি পরকায় প্রবেশ করতে জানতেন। বড় জমিদারবাবুর একান্ত অনুরোধে স্বামিজী নির্জনে সাধুর সঙ্গে দেখা করলেন। ফিরে এসে তিনি শিবনাথকে বললেন, সাধুজী বুজরুক নন। তোমরা বিশ্বাস করতে চাও না।

There are more things in heaven and earth,

Than your philosophy can dream of.

তাঁর সঙ্গে কি কথা হয়েছিল তা বলা নিষেধ। তবে জেনে রেখো তাঁর বর্তমান দেহ তাঁর নিজের নয়। তিনি সন্ন্যাসী নন, ব্রহ্মচারী।

পাঞ্জাবে জালিনওয়ালাবাগে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন ভারতবর্ষে এক অভূতপূর্ব অবস্থা সৃষ্টি করে। স্বামিজী বললেন, পশ্চিম থেকে ফিরে এসে আমি এই আন্দোলনে আমার সকল শক্তি নিয়োগ করব। পরাধীন দেশে প্রকৃত ধর্ম হয় না। স্বদেশের পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। প্রকৃত সন্ন্যাসীই নিঃস্বার্থভাবে সমাজসেবা, লোকসেবা, দেশসেবা করতে পারে।

শিবনাথ বললেন, তাহলে সন্ন্যাস না নিয়ে যারা দেশসেবা বা দেশের কাজ করছে, তাদের দেশসেবা কি দেশসেবা নয়? ধরুন, মহাত্মাজীর কথা। তিনি তো আপনাদের মতো সন্ন্যাসী নন্, তিনি কি দেশসেবার অধিকারী নন?

স্বামিজী বললেন, দেশসেবায় কারোর একচেটে অধিকার নেই। মহাত্মাজীর কথা স্বতন্ত্র। তিনি মনেপ্রাণে সন্ন্যাসী। তাঁর বৈরাগ্য আছে, চরিত্র-বল আছে। তাঁর মতো ব্যক্তিই স্বাধীনতা-যজ্ঞের পুরোহিত হতে পারেন।

—ধরুন, দেশ স্বাধীন হল। দেশ স্বাধীন হওয়ার অর্থ দেশের শাসন ক্ষমতা হস্তগত করা, দেশের শাসন-কার্য পরিচালনা করা। যারা দেশ শাসন করবে, তারা কি সকলে সন্ন্যাসী হবে?

—হাঁ, তাদের মনে জ্ঞানে কর্মে—কায়মনোবাক্যে সন্ন্যাসী হতে হবে অর্থাৎ ত্যাগী হতে হবে।

—ইংরেজ একদিন না একদিন আমাদের দেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হবে। সেদিন আর বেশী দূরে নয়। তখন কি হবে?

—যারা নেতা, তারা শাসন-চক্রের বাইরে থেকে দেশের কাজ করবে। যারা প্রত্যক্ষভাবে শাসন-কার্য চালাবে, তাদের ঠিক পথে চলতে নির্দেশ দেবে।

পদ এবং অর্থের মোহ ত্যাগ করে রাষ্ট্র পরিচালনার শুচিতা রক্ষা করতে হবে। বহুকাল পূর্বে প্লেটো বলেছিলেন, The wise should rule. প্রকৃত জ্ঞানী কখনও অন্যায় করেন না। সুতরাং জ্ঞানীর শাসনই ন্যায়ের শাসন।

—পৃথিবীতে কি তাই হচ্ছে ?

—হচ্ছে না বলেই তো ক্ষমতা কাড়াকাড়ির দ্বন্দ্ব—দলাদলি আর শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ। অর্থের লোভ, ক্ষমতার মোহ থেকে আসে পাপ, আর পাপ থেকে আসে মৃত্যু। রাষ্ট্রের কর্ণধারকে লোভ ত্যাগ করতে হবে। সেবার মনোভাব নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে। শিবনাথ চুপ করে শুনতে লাগলেন। তারপর স্বামিজী বললেন, শিবাজী রামদাস স্বামীর প্রতিনিধি হয়ে রাজ্য শাসন করেছিলেন, নিজের জন্যে করেন নি।

॥ তেইশ ॥

বালেশ্বর জেলার প্রান্ত সীমায় বঙ্গোপসাগর। জোয়ারের সময় সমুদ্রে বড় বড় ঢেউ উঠে। ঢেউ-এর পর ঢেউ বেলাভূমি আক্রমণ করে নিষ্ফল ক্রোধে। ভাঁটার সময় মহাসমুদ্রের নীলাম্বুরাশি তিন চার মাইল দূর থেকে উঁচু শ্বেত প্রাচীরের মতো দেখায়। সমুদ্র-তীরে উত্তর ও দক্ষিণে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত অসংখ্য বালিয়াড়ি। একটা উঁচু বালিয়াড়ির উপর বসে শিবনাথ দেখছেন পূর্বাকাশে অরুণোদয়ের মনোরম দৃশ্য। দূরে, বহুদূরে অনন্ত বারিধির নীল জল যেখানে নীল আকাশকে ছুঁয়ে আছে, সেখানে থালার মতো চক্রাকার জবাকুসুমসঙ্কাশ দিবাকর রক্তবর্ণ উপাধানের উপর মাথা রেখে জলের উপর শুয়ে আছেন। তারপর ঘুমন্ত দুষ্ট ছেলে যেমন হঠাৎ বিছানা থেকে লাফিয়ে উঠে, তেমনি ভাবে বালসূর্য জল থেকে আকাশে লাফিয়ে উঠলেন। গলিত সোনার মতো লাল জল যেন যাদুকরের মায়াকাঠির স্পর্শে হঠাৎ নীল হয়ে গেল। মাথার উপর কিরণজাল বিস্তার করতে করতে সপ্তাশ্বযুক্ত রথে সূর্যদেব বিমান পথে যাত্রা শুরু করলেন। বেলা হয়ে গেছে দেখে শিবনাথ ফিরে এলেন চারুবাবুর বাসায়।

একদিকে সমুদ্রের বালিয়াড়ি, আর এক দিকে উড়িষ্যা খাল। মাঝখানে

বহু শত একর পতিত ভূমি। এক হাঁটু সবুজ ঘাসে ভর্তি। দলে দলে গরু আর মহিষ ঘাস খেতে খেতে চরের উপর বেড়াচ্ছে। জনমানবশূন্য প্রান্তর। মাঝে মাঝে দু-একটি খড়ে-ছাওয়া কুঁড়ে ঘর। রাখাল ছেলেদের রাত্রির আশ্রয় স্থল। গরু মহিষগুলোর জন্যে গোয়াল বা চালা নেই। তারা মাঠে চরে, মাঠের ঘাস খায়, আর রাত্রে মাঠেই শুয়ে থাকে। বর্ষাকালে সমুদ্রের জোয়ারের লোনা জল খাড়ি দিয়ে প্রবেশ করে মাঠ ডুবিয়ে দেয়। তখন তারা বালিয়াড়ির উপরে উঠে যায়।

দেশ থেকে এসে চারুবাবু স্থানীয় এক উড়িয়া জমিদারের কাছে প্রায় চার হাজার একর জমি অল্প খাজানায় বন্দোবস্ত নিয়েছিলেন। কিছু সেলামি নিয়ে অল্প লাভে জমি বিলি করছিলেন।

বিকেলে শিবনাথ ঘুরে ঘুরে জমি দেখেন। বালিয়াড়িতে উঠা-নামা করেন। বেলাভূমির উপর তরঙ্গ নিক্ষিপ্ত রঙ-বেরঙের শামুকের খোলা ছেলেমেয়েদের জন্যে সংগ্রহ করেন। উঁচু বালিয়াড়ির উপর বসে থাকেন। সামনে মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতো অকূল সমুদ্র। ভাবেন সে কত বিরাট, ভীষণ, সীমাহীন। মনে পড়ে তাঁর সেই প্রিয় শীর্ণকায়া কংসাবতীকে। সমুদ্রের সঙ্গে তুলনায় সে কত ক্ষুদ্র, কত সীমিত, কিন্তু সুন্দর!

প্রদোষের পাতলা আঁধার ভেদ করে চারুবাবুর বাড়ির মাঙ্গলিক শঙ্খধ্বনি রাত্রি সমাগমের বার্তা ঘোষণা করল। শিবনাথ শশব্যস্তে বালিয়াড়ি থেকে নেমে চারুবাবুর বাড়িতে ফিরে গেলেন।

পরদিন এক শ বিঘা জমি চিহ্নিত করে শিবনাথ সিংহগড়ে উপস্থিত হয়েই কলকাতা থেকে একখানি টেলিগ্রামে স্বামিজীর অসুখের সংবাদ পেলেন। সেখানে তাঁর পৌঁছবার আগেই স্বামিজী দেহরক্ষা করেছেন। ব্রহ্মচারীর কথা সত্য হল। তিনি বলেছিলেন, দণ্ডী সন্ন্যাসীকে এক স্থানে তিন দিনের বেশী থাকতে নেই। স্বামিজীর শবাধারের পাশে বসেছিলেন এক গৌরাঙ্গী সন্ন্যাসিনী। তিনি জনকয়েক যুবকের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করছিলেন। তাঁর পরনে গেরুয়া বস্ত্র, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, আলুলায়িত রুক্ষ কেশদাম। শুচিশুভ্র মুখশ্রী! যেন দিব্য জ্যোতির ঝর্ণাধারা নেমে এসেছে তাঁর দেহের উপর। তিনি ছিলেন স্বামিজীর ছোট বোন। স্বামিজীর অসুখের সংবাদ পেয়ে তিনি কাশী থেকে এসেছিলেন। সেই রাত্রেই শবাধার নিয়ে কয়েকজন

রওনা হয়েছিল, পূর্ববঙ্গে তাঁর মঠে। শূন্য মনে শূন্য হৃদয়ে শিবনাথ ফিরে এলেন সিংহগড়ে "বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে"।

সিংহগড়ের প্রধান আকর্ষণ ছিলেন স্বামিজী। এখানকার দ্বিতীয় আকর্ষণ ছিলেন ছোট ডাক্তার অনঙ্গবাবু। বাড়ি ফরিদপুর জেলায়। প্রৌঢ়ত্বের সীমারেখা অতিক্রম করেছিলেন। চল্লিশ বছর আগে সিংহগড়ের জমিদার বাড়িতে চাকরি করতে আসেন। তারপর আর কখনও দেশে যাননি। পনরো-ষোল মাইল দূরের গ্রাম থেকে তাঁর ডাক আসত। পাল্কি ও বেয়ারা সর্বদা মোতায়েন থাকত। গরীবের মা-বাপ ছিলেন তিনি। অনেক সময় ফি নেওয়া তো দূরের কথা রুগীর ওষুধ ও পথ্যের জন্যে নিজের পকেট থেকে টাকা দিয়ে আসতেন।

তিনি কিছু লিখতেন না বটে কিন্তু সমঝদার পাঠক ও সমালোচক ছিলেন। তিনি বলতেন, সকলেই যদি লেখে তাহলে পড়বে কে? আমাদের দেশে সাহিত্য বা সঙ্গীতের প্রকৃত সমঝদার লোক বিরল। কয়েকখানি বাংলা মাসিক পত্রিকা, ইংরেজী মেডিক্যাল জার্ণাল নিয়ে পালকিতে চড়তেন আর গুড়গুড়ির নল টানতে টানতে পড়তেন। চা খাওয়ার সময় পেয়ালা থেকে একটু চা টেবিলের উপর ঢেলে দিতেন। দুটি বড় টিকটিকি কোত্থেকে এসে চুকচুক করে চা খেয়ে অদৃশ্য হয়ে যেত। শিবনাথ বলতেন, ভালবাসলে কীটপতঙ্গও পোষ মানে। তিনি শিবানীকে মেয়ের মতো ভালবাসতেন। বলতেন, শিবানী-মার মতো আর কেউ নাকি এমন সুন্দর চা তৈরি করতে পারত না। তাঁর মতো এমন দরদী চিকিৎসক যে কোন যুগে বিরল। তাঁর মৃত্যুতে এ অঞ্চলের লোক পিতৃবিয়োগের ব্যথা অনুভব করেছিল এবং শিবানী শোকে ভেঙ্গে পড়েছিলেন।

একে একে নিভিল দেউটি—একটির পর একটি সত্যিকার মানুষ সিংহগড়কে আঁধারে ফেলে কোথায় চলে গেল। সিংহগড় শিবনাথের পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছিল। তিনি এখন প্রাণহীন কঙ্কালের মতো সিংহগড়ের শ্মশান-ভূমিতে বিচরণ করতে লাগলেন। এমন সময় স্থানটিকে ছেড়ে চলে যাওয়ার এক সুযোগ উপস্থিত হল।

॥ চব্বিশ ॥

সে সময় অসহযোগ আন্দোলন পুরামাত্রায় চলেছে। মহাত্মা গান্ধীর ডাক ভারতের দূরতম অংশে পৌঁচেছিল। ছেলেরা স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়েছিল। সিংহগড়ের স্কুলে দু-তিন মাস ছেলে ছিল না। ছেলেরা মাইনে দেয় না। মাস্টাররা বেতন পান না। শিবনাথ ছোট জমিদারবাবুর সঙ্গে বার বার দেখা করলেন। বিদেশী মাস্টারদের ঠিক সময়ে বেতন দেওয়ার জন্যে অনুনয়-বিনয় করে চিঠি লিখলেন। কিছুই হল না।

এই সময় নিকটবর্তী আর একটি স্কুলের হেড্‌মাস্টারের পদ এক বছরের জন্যে শূন্য হয়েছিল। সেখান থেকে নিয়োগ-পত্র পেয়ে তিনি সিংহগড়ের স্কুলের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন।

বড় ডাক্তারবাবু শিবনাথকে বলেছিলেন, ছোট জমিদারবাবুর অনুমতি বা মত না নিয়ে আপনি চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন বলে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এতে নাকি তাঁর প্রেস্টিজে আঘাত লেগেছে।

শিবনাথ বললেন, আমি চাকরি ছাড়লাম, আর তাঁর প্রেস্টিজে আঘাত লাগল? এ আবার কি কথা? ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকদের আবার প্রেস্টিজ কোথায়? ইংরেজদের সৃষ্ট এই সকল জীব ইংরেজ-শক্তির শ্রেষ্ঠ স্তম্ভ। এরা ধার-করা ক্ষমতার গর্বে স্ফীত। এরা পরিশ্রম করে না, বিলাস-ব্যসনে অর্থব্যয় করে। যখন কলকাতার বড়লোকেরা পুতুলের বিয়েতে লাখ লাখ টাকা নষ্ট করেছে, আর মফঃস্বলের জমিদাররা প্রজার অর্থ নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে, তখন অন্য প্রদেশের লোকেরা লোটাকম্বল সম্বল করে কলকাতায় এসে বাজার দখল করে নিয়েছে। এখন তারা কোটি কোটি টাকার মালিক। পঞ্চাশ বছর পরে গোটা কলকাতা অবাঙালীর হাতে চলে যাবে। বাঙালীর ছেলেরা ওদের কাছে বিশ-পঁচিশ টাকার চাকরি করছে, আর ওরা বড় বড় ব্যবসা চালাচ্ছে, গাড়ি বাড়ি জমিদারি কিনছে।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি। এঁরা এখন পদে পদে প্রেস্টিজ রক্ষা করতে ব্যস্ত। কোমরে শিল বেঁধে ওজনে ভারি হলে ভালো স্বাস্থ্য হয় না, আর পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হলে বড় হওয়া যায় না।

যা হোক আপনি দেউড়ির ভিতর যাবেন না। চাঁদির জোরে ওরা সব করতে পারে।

শিবনাথ সেকেণ্ড মাস্টারকে চার্জ বুঝিয়ে দিলেন। সিংহগড়ের মায়া কাটিয়ে নতুন কর্মস্থলে যাওয়ার জন্যে প্রস্তুত হলেন। বই-এর আট-দশটি বড় সেট, তিনখানি তক্তাপোশ, একখানি খাট, চেয়ার টেবিল, তিনটি আলমারি, বাসন-কোসনের চার-পাঁচটি বস্তা, তিন-চারটি ট্রাঙ্ক, সুটকেস প্রভৃতি লটবহর ভর্তি ছ-খানি, আর নিজেদের জন্যে তিনখানি গরুর গাড়ি মন্থর-গতিতে অগ্রসর হল এখানে থাকার শেষ দিনের রাত্রে। সকলের পিছনের গাড়িতে ছিল শিবানীর কয়েকটি প্রিয় জানোয়ার—আটটি হাঁস, কয়েকটি খরগোস, তিনটি ছাগল, দুটি বিড়াল ও একটি কুকুর। তার পিছনে বাঁধা ছিল বাচ্চা সমেত একটি ভাগলপুরী আর একটি দেশী গাই। এতগুলি গরুর গাড়ির শোভাযাত্রা দেখে সকালে রাস্তার লোক জিজ্ঞাসা করতে লাগল—সার্কাস পার্টি কোথায় খেলা দেখাবে গো? শুনে, শিবনাথ শিবানীকে বললেন, লোকগুলো সত্যি কথাই বলছে। স্ত্রী-পুত্র পরিবার নিয়ে সংসারে আমরা এক একটা সার্কাস পার্টি খুলে বসেছি, কত খেলা খেলছি আর কত খেলই না দেখাচ্ছি। শিবানী হাসতে লাগলেন।

ষোল বৎসর পূর্বে শিবনাথ এই স্কুল থেকে এনট্রান্স পাস করেছিলেন। স্কুলের সেই পুকুরটা যার জলে তিনি সাঁতার কাটতেন, ঘাটের ধারে সেই বাদাম গাছটা যার ছায়ায় বসে দুপুর বেলা সঙ্গীদের সঙ্গে গল্প করতেন, সেই ছোট মাঠ যেখানে সাথীদের সঙ্গে দৌড়তেন, লাফাতেন, খেলা করতেন, তারা সব ঠিক আছে, কেবল সঙ্গীরা নেই। তারা এখন কে কোথায় চলে গেছে। তাঁর মাস্টারদের ভিতর সিক্সথ মাস্টার ছাড়া আর কেউ বেঁচে নেই। ছাত্র এম. এ. পাস করে তাঁর স্কুলে মাস্টারি করতে এসেছে শুনে তিনি শিবনাথের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। আনন্দের সঙ্গে তিনি বললেন, কী বাবা! আমার গাঁট্টার কথা মনে আছে তো? শিবনাথ বৃদ্ধকে বললেন, আপনার গাঁট্টা খেয়েই তো আমরা লেখা-পড়া শিখেছি। শিবনাথ তাঁকে প্রণাম করলেন। এখন তাঁর সে হুঙ্কার ছিল না। তিনি শিবনাথকে আশীর্বাদ করে বিদায় নিলেন।

প্রাচীন শহর। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। হিউয়েন সাং-এর সময়ে ভারত মহাসাগরের লবণাম্বুরাশি এর পাদদেশ ধৌত করত। আরও এক

হাজার বৎসর আগে এখান থেকে প্রিয়দর্শী নিজের পুত্র কন্যাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে সিংহলে পাঠিয়েছিলেন। এর বন্দরে বড় বড় জাহাজ বাঁধা থাকত। নানা রকমের পণ্য নিয়ে দেশ-বিদেশে গমনাগমন করত। অসংখ্য শ্রেষ্ঠী বণিক এখানে বাস করত। এখানকার সংঘারাম চৈত্য ও মন্দিরের ভিক্ষু শ্রমণ ও পুরোহিতদের মুখোচ্চারিত উদাত্ত সঙ্গীতের স্বর সমুদ্র-তরঙ্গের গভীর গর্জনের সঙ্গে মিশে যেত। ধর্মপ্রচার এবং উপনিবেশ স্থাপনের জন্যে কত ভিক্ষু দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত করত। এখন সমুদ্র বহু দূরে সরে গিয়েছে। হৃতগৌরব নগর এখন একটি ছোট আধুনিক শহরে পরিণত হয়েছে। আধুনিক সভ্যতা ও রাষ্ট্রের উপযোগী অফিস আদালত স্কুল হাটবাজার মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হয়েছে।

এখানে শিবনাথের এক উকিল বন্ধুর বাড়ি। নাম চন্দ্রকান্ত চৌধুরী। সুন্দরবনে দু হাজার এবং দেশে পাঁচ শ বিঘা জমির মালিক ছিলেন তিনি। হিসেবী সাবধানী লোক। সস্তায় নাম কেনার লোভ ছিল না তাঁর। ব্যবসায় টাকা খাটাতেন। কারবার করার জন্যে বাঙালী যুবকদের বিনা সুদে হাজার হাজার টাকা ধার দিতেন। এই দুর্বলতা বা খেয়ালের সুযোগ নিয়ে অনেকে তাঁর টাকা ডুবিয়েছে। তিনি বলতেন, এরা প্রকৃত কারবারী নয়। সত্যিকার কারবারী টাকা ফাঁকি দেয় না। ব্যবসায় উন্নতি করতে হলে ধৈর্য সাধুতা এবং অক্লান্ত পরিশ্রম চাই। তবে তিনি একেবারে হাত গুটিয়ে নেন নি। লোক দেখে টাকা ধার দিতেন।

ছোট ভাই শ্যামকান্ত স্থানীয় ব্যাঙ্কের ম্যানেজার। দু শ টাকা মাইনে। দাদার কৃপণ নাম ছিল দেখে লোকের কাছে দানবীর বলে পরিচিত হওয়ার নেশা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। কার ছেলের পইতে হবে, কার মেয়ের বিয়ে হবে, কার মা-বাপের শ্রাদ্ধ হবে, কে ইলেকসনে দাঁড়াবে, ইত্যাদি ব্যাপারে অর্থসাহায্য করে দাদার উপর টেক্কা দিতেন। বাড়িতে যে কোন লোক দেখা করতে এলে তাকে ফল সন্দেশ রসগোল্লা জল খেতে দিতেন। দর্শনার্থীর সংখ্যা বেড়ে যেতে লাগল। জলখাবারের মাসিক খরচ পাঁচ শ টাকার উপর উঠে গেল। ব্যাঙ্কের বহু টাকা ভেঙ্গে ফেললেন। দু শ টাকার চাকরি গেল। বড় ভাই ব্যাঙ্কে বহু টাকা দিয়ে ছোট ভাইকে রক্ষা করলেন। তিনি লজ্জায় কোথাও বেরুতে পারেননি। ঘরেই বসে থাকেন আর রুগীদের বিনা পয়সায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ দান করেন।

রবিবার। বেলা দশটার সময় শিবনাথ এবং চন্দ্রকান্তবাবু বৈঠকখানায় বসে চা ও তামাক খাচ্ছেন এমন সময় একদল যুবক তাঁদের স্মুখ দিয়ে ছুটে পালাচ্ছে। তাদের পিছু পিছু তাড়া করছে জন দশেক পুলিস কনস্টেবল লাঠি উঁচিয়ে। দূরে শোনা গেল আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে গভীর নিনাদ, বন্দে মাতরম্। শিবনাথ তামাকের নলটা ফেলে দিয়ে উঠে পড়ছেন দেখে চন্দ্রকান্ত বললেন, ও আর কী দেখবি? পুলিস তো রোজ স্বদেশী ভলান্টিয়ারদের লাঠি পেটা করছে। দেখতে চাস, তো আমাদের গোলাঘরের পিছনে ভলান্টিয়ারদের ঘাঁটিতে যা। শিবনাথ তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে দেখলেন ঘরের দাবায় কলাপাতা ও ভাত ছড়ানো। ভলান্টিয়াররা খেতে বসেছিল, এমন সময় পুলিসকে আসতে দেখে ছুটে পালিয়েছে। পুলিস তাদের কলাপাতার ভাত ছড়িয়ে দিয়েছে, ভাতের হাঁড়ি ভেঙ্গে দিয়েছে, রান্নাঘরের জিনিস্-পত্র তচ্নচ্ করে দিয়েছে। একটি ছেলেকে ভীষণভাবে প্রহার করে অজ্ঞান করে দিয়ে স্ট্রেচারে করে পুলিস হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। পরদিন শোনা গেল সেখানে ছেলেটি মারা গেছে। এইভাবে স্বাধীনতা-যজ্ঞে কত দুর্জয় যুবক আত্মাহুতি দিয়েছে তার খোঁজখবর কে রাখে?

শিবনাথ ফিরে আসতে চন্দ্রকান্ত বললেন, দেশ যে জেগে উঠেছে তা আর অস্বীকার করা যায় না। গান্ধীজীর আন্দোলন আসমুদ্র হিমাচল ভারতকে এমন ভাবে নাড়া দিয়েছে যে, লাঠিবাজি করে ইংরেজ আর তাকে থামাতে পারবে না। আর দশ-পনরো বছরের মধ্যে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আসবে, আর ইংরেজ দেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হবে, জানিস্।

শিবনাথ বললেন, আজ যারা প্রাণ দিচ্ছে, তারা কি সে স্বাধীনতা ভোগ করবে?

—মানুষ কি নিজের ভোগের জন্যে সব কিছু করে? এরা সিঁড়ি গেঁথে যাচ্ছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে পরবর্তী কালের লোক উঠবে স্বাধীনতার রঙমহলে।

—ইংরেজের অমানুষিক অত্যাচারে এরা মুষড়ে পড়বে যে।

—অত্যাচার বাড়বে। ইংরেজ মরণ কামড় দেবে। এক ইঞ্চি জায়গার জন্যে আমরা হাইকোর্ট পর্যন্ত মামলা লড়ি। এত বড় জমিদারি কি তারা সহজে ছেড়ে যেতে চায়? জানবি, আদর্শের জন্যে যারা মরে তারা বৃথা মরে না। বৃহৎ চিন্তার মৃত্যু হয় না। ক্ষুদিরাম, কানাই প্রভৃতি কত যুবক দেশের জন্যে ফাঁসিকাঠে ঝুলেছে তা কি মিথ্যা হয়েছে?

—যেমন ওল তেমন বাঘা তেঁতুল না হলে কি কিছু হবে? গান্ধীজীর নপুংসক নীতিতে দেশ স্বাধীন হয় না।

—হাতে হাতে হয় না সত্যি, তবে হবে নিশ্চয়ই। গান্ধীজী আর কিছু না করুন, একটা বড় জিনিস করে যাচ্ছেন। তিনি রাজনীতিকে আকাশ থেকে নামিয়ে মাটিতে এনেছেন। আগে দেশপ্রেম ইংরেজী-জানা উঁচু-তলার লোকদের ছুটির ব্যসন ছিল। এখন সাধারণ লোক দেশকে চিনতে পেরেছে।

—বেঁচে থাকি তো দেখব।

শিবনাথ দেখলেন শুধু চ্যাংড়া ছোঁড়ারা নয়, চন্দ্রকান্তবাবুর মতো ধীর শান্ত বিষয়ী লোকেরাও ইংরেজকে আর চায় না। তবে ইংরেজ-শাসনের মূল শিকড়টা এত গভীরে চলে গেছে যে, তাকে উপ্ড়ে তুলতে বেশ কিছু জোর আর সময় লাগবে।

বেলা হয়ে গেছে দেখে চন্দ্রকান্ত বন্ধুকে ছাড়লেন না। একসঙ্গে খাওয়ার ব্যবস্থা হল। ইতিপূর্বেই খিড়কি দরজা দিয়ে শিবানী বাড়ি ঢুকে তাঁর স্ত্রী কমলাকে বললেন, কি লো, বন্ধু, আমার বর যে বাড়ি যেতে চায় না—ভেড়া বানালি না কি?

—কেন, আমার কি অভাব যে তোর বরকে হাত করে নেব? তোর ভয় নেই।

—ভরসাই বা কোথায়?

—বেলা একটা পর্যন্ত দুই বন্ধুতে বসে তামাক চা সিগারেটের শ্রাদ্ধ করতে করতে কত আষাঢ়ে গল্প হচ্ছিল। হঠাৎ খবর পেলাম দুই বন্ধু একসঙ্গে খাবেন।

—জোড়ে থাকাই তো ভালো। কেউ কারোকে হাত করতে পারবে না। আমি বাদ পড়ব? আমার জোড়টা ঠিক রাখা চাই।

—না না, তা কি হয়? ওঁরা দুই বন্ধুতে খাবেন—আমরা দুই বন্ধুও এক সঙ্গে খাব।

শিবানী বন্ধু-বাড়িতে খাওয়ার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ছেলেদের খবর পাঠানো হল।

বড়লোকের স্ত্রী কমলার কিছু দেমাক ছিল না, উঁচু মন। শিবানীকে তিনি বোনের মতো ভালবাসতেন। এক খিড়কি পুকুরের ঘাটে স্নান করতেন। অনেক সময় এক সঙ্গে খেতেন, চুল বাঁধতেন, গল্প করতেন। কমলা কোন দিন

ঘরের বাইরে যেতেন না। একেবারে অসূর্যম্পশ্যা। এমন কি ছোট দেওরের সঙ্গে কথা বলতেন না। ঝিকে দিয়ে তাঁর কথা জানতেন।

ওখান থেকে চলে আসার আগে আট-দশ দিন কমলা শিবানীকে এক দণ্ড ছেড়ে থাকেন নি। অনেক দিন পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে ভালবাসা পুরামাত্রায় বজায় ছিল।

তারপর ষোলটি মাস কেটে গেল। পূর্বের হেডমাস্টার কাজে যোগ দেওয়ার অভিপ্রায় জানালেন। অগত্যা সমস্ত আসবাব-পত্র সঙ্গে নিয়ে শিবনাথ গ্রামের বাড়িতে ছোট ভাই রামনাথের সংসারে উঠলেন।

রামনাথ কলকাতায় সওদাগরী অফিসে চাকরি করে। শনিবার বাড়ি আসে। সংসার খরচের টাকাকড়ি ছোট বউ-এর হাতে। দুবেলা আছাটা চালের লাল ভাত, খেসারির ডাল, কুমড়োর ঘণ্ট আর জলখাবার মুড়ির ব্যবস্থা। দিনের পর দিন এইভাবে চলে। শিবানী ছোট বউকে বলেন, একেই তো ম্যালেরিয়ার সময়, তাতে এই রকম খাওয়া। ছেলেগুলো যে মারা পড়বে, ছোট বউ। টাকা না থাকে বলতে পারিস তো!

ছোট বউ বলে, বলতে হবে কেন? দেখতেই তো পাচ্ছ।

তর্ক ও ঝগড়া বাঁধবার উপক্রম হচ্ছে দেখে শিবানী উঠে গেলেন।

পরদিন শিবনাথ গয়না বন্ধক দিয়ে এক শ টাকা এনে রাখলেন। শনিবার কলকাতা থেকে আসার পর রামনাথের হাতে লুকিয়ে ঐ টাকাটি দিয়ে শিবনাথ বললেন, রাম, এই টাকাটা রেখে দে। ছোট বউমাকে দিস্। এতগুলি লোকের খরচ চালাতে তাঁর কষ্ট হচ্ছে। রামনাথ না-না করতে করতে টাকাটা নিয়ে পকেটে পুরে দিল।

পূজোর বন্ধের পর শিবনাথ একটি স্কুলে চাকরি পেয়েছেন। অন্য জেলায় হলেও স্থানটি বাড়ি থেকে দূরে নয়। তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্যে স্কুলের সেক্রেটারি কেদারবাবুর ছেলে বিনয় স্টেশনে উপস্থিত ছিল।

স্কুলের পরিচালক সমিতির প্রেসিডেণ্ট ছিলেন সত্তর বৎসর বয়সের এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক। তিনি ছিলেন ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারক ও পুরোহিত। অনেক ব্রাহ্ম জজ, ম্যাজিস্ট্রেট তাঁর যজমান ছিল। বাইরে যাওয়ার সময় তিনি গেরুয়া পরতেন। রোজ ভোরে বাড়ির সামনে একটা বট গাছের ডালে বাঁশের মাচায় উঠে খঞ্জনি বাজিয়ে ভক্তি-গদগদ-চিত্তে হরিনাম

করতেন। একদিন ভাবের ঘোরে নাচতে নাচতে মাচার দড়ি ছিঁড়ে নিচে পড়ে গিয়ে তাঁর হাত-পা জখম হয়ে গিয়েছিল। তিনি পাথর-বসানো একটি কানা চোখ ঢেকে রাখার উদ্দেশ্যে নীল চশমা ব্যবহার করতেন। তিনি একাধারে সেক্রেটারি ও প্রেসিডেন্ট ছিলেন। প্রায় রোজ হেডমাস্টারের কাছে ইংরেজীতে লম্বা লম্বা চিঠি ঝাড়তেন। প্রতি রবিবার কমিটির মিটিং ডাকতেন। রেজোলিউশন লিখতেন। কমিটির মেম্বারদের ভিতর মাত্র একজন এনট্রান্স পাস ছিলেন। তিনি একখানি বাংলা দৈনিকের সংবাদদাতা ছিলেন। তাঁর নামের শেষে 'জার্নালিস্ট' কথাটি না লিখলে তিনি ক্ষুণ্ণ হতেন। খোদ সেক্রেটারি কেদারবাবু সদাশিব গোছের লোক ছিলেন। স্কুলের দরকারের সময় কিছু কিছু টাকা দিতেন, কিন্তু স্কুল নিয়ে মাথা ঘামাতেন না।

আট-দশদিন পরে শিবনাথ যখন ক্লাসে পড়াচ্ছিলেন তখন হঠাৎ দরজার দিকে তাকিয়ে দেখলেন, তাঁর চাকর গোপাল দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তিনি বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে রে, গোপাল? কাঁদছিস কেন? সে ডুকরে ডুকরে বলল, বাবা, ঠাকুমা নেই। শিবনাথ আশ্চর্য হয়ে বললেন, সে কি রে? মা কি দেশের বাড়িতে মারা গেছেন? কবে? কই, তাঁর অসুখের কোন সংবাদ পাইনি তো!

সে স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছিল না। শুধু বলেছিল, ঘর চল, সব শুনবে।

শিবনাথের মাথা ঘুরছিল। তিনি অফিস ঘরে ঢুকে একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে সামনের টেবিলের উপর মুখ গুঁজে বসলেন।

ফোঁটা-ছিটেকাটা পরম বৈষ্ণব পণ্ডিতমশাই শিবনাথের এই অবস্থা দেখে বললেন, কোথায় গেল আপনার বেদান্তের বুলি? এই দুর্বলতা কেন? বিচার তর্ক কোথায় গেল? ক্লৈব্যং মাস্ম গম পার্থ, ক্ষুদ্রং হৃদয়-দৌর্বল্যং তক্তোত্তিষ্ঠ পরন্তপ। উঠুন, এক্ষুণি বাড়ি যান।

শিবনাথ বাড়ি এলেন। রামজয় বললেন, যারা কারোর কথা শোনে না, তারা বিঠেকে মারা যায়। ওর মা'রও এই অবস্থা হয়েছিল।

শিবনাথ শুনলেন, কারোর নিষেধ না মেনে ভবতারিণী নবদ্বীপে তীর্থ করতে যান। তারপর হাটখোলায় জামাইবাড়িতে ফিরে এসে জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাঁর মৃত্যু হয়।

ভবতারিণীর শ্রাদ্ধাদি সেরে ছেলে-পুলেদের নিয়ে শিবনাথ এলেন চাকরি স্থলে। রামজয় থাকলেন বাড়িতে ছোট বউ-এর কাছে। সৌদামিনী ও শশীবাবু সকল সময় রামজয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতেন।

পূর্বের হেডমাস্টার শিবনাথকে চার্জ দেওয়ার সময় বলেছিলেন, পোস্ট অফিসের এই পাস বইখানা রাখুন। এতে মাত্র সাড়ে তিন শ টাকা জমা আছে। এই টাকাটি স্কুলের পুঁজি। কোন রকমে হাতছাড়া করবেন না। আমি একে যক্ষের ধনের মতো আগলে রেখেছিলাম। নইলে দুদিনে টাকাটা ফুট কড়াই হয়ে যেত।

এনট্রান্স পাস হলেও জার্নালিস্ট মশাই নাকি ভালো ইংরেজী জানতেন। মাঝে মাঝে হুট করে ক্লাসে ঢুকে পড়তেন। ছেলেদের প্রশ্ন করতেন। ছেলেরা ভুল উত্তর দিলে তাদের সামনে মাস্টারকে বকুনি দিতেন। একদিন বাজার করে আসার সময় তিনি একটা ক্লাসে গিয়ে মাছ ও আনাজের পুটুলিটা মাস্টারমশাই-এর টেবিলের উপর রেখে একখানা পা বেঞ্চির ওপর তুলে দাঁড়িয়ে ছেলেদের ট্রানশ্লেশান জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। ছেলেরা ভুল করেছে দেখে তিনি মাস্টারকে যা নয় তা বলে তিরস্কার করতে লাগলেন। অপমানিত হয়ে মাস্টারমশাই শিবনাথের কাছে নালিশ করলেন। তিনি মেম্বারমশাইকে অফিসে ডাকিয়ে এনে বললেন, আপনি কার হুকুমে ক্লাসে ঢোকেন, আর ছেলেদের সামনে মাস্টার মশাইদের অপমান করেন ?

—আমি কমিটির একজন মেম্বার। ক্লাসে ঢোকার অধিকার আমার আছে।

—আপনি যেই হোন না কেন, আমার অনুমতি না নিয়ে আর কখনো কোন ক্লাসে ঢুকবেন না।

ভদ্রলোক রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললেন, বেশ করব। আলবৎ ঢুকব। দেখি আপনি কি করতে পারেন ?

—মেজাজ দেখাবেন না, মশাই। অনুমতি না নিয়ে ঢুকলে এবার আপনাকে পুলিসে হ্যাণ্ড-ওভার করব, জানবেন।

—আচ্ছা, দেখা যাবে 'খন। বলে, গামছার পুঁটুলিটা নিয়ে তিনি হন্‌হন্‌ করে চলে গেলেন।

জার্নালিস্ট মশাই প্রেসিডেণ্টের কানভারি করতে লাগলেন। শিবনাথকে

তাড়িয়ে প্রেসিডেন্ট মশাই-এর একটি গ্র্যাজুয়েট জামাইকে হেডমাস্টার করার জন্যে ষড়যন্ত্র চলতে লাগল। দেশের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে দুর্নীতি অত্যাচার ও দলাদলিতে মাস্টারদের প্রাণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠছে দেখে শিবনাথ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কোথাও তারা বড়লোকদের মন জুগিয়ে চলতে বাধ্য হয়, কোথাও বা তারা গভর্নমেণ্টের গোয়েন্দাগিরি করে, কোথাও গেঁয়ো-মোড়লদের ষড়যন্ত্রে তারা অস্থির হয়ে উঠে। এর প্রতিকার করার জন্যে শিবনাথ জেলায় শিক্ষক-সমিতি প্রতিষ্ঠা করে তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করলেন।

নামের সঙ্গে বিনয়ের প্রকৃতির মিল ছিল। ভদ্র বিনয়ী আর মাস্টার মশাই-এর একান্ত ভক্ত হয়ে উঠেছিল সে। কি জানি কেন সে প্রথম দিন থেকেই মাস্টারমশাইকে ভালবাসতে আরম্ভ করেছিল। সে তাঁর কাছে পড়ত, একসঙ্গে খেত, এক বিছানায় শুত, পা টিপত। শিবানী তাকে ছেলের মতো ভালবাসতেন, আদর-যত্ন করে খাওয়াতেন। সে তাঁকে মা বলত, আর মন্দাকিনীকে পিসিমা বলত।

এই সকল দেখেশুনে লোকে মনে করতে লাগল হেডমাস্টারের মেয়ের সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে হবে। এমন কি ঐটুকু মেয়ে কল্যাণীও তাকে বর ভাবত। বাড়ি যাওয়ার জন্যে বেরিয়ে পড়লে ফ্রকপরা ঐ মেয়েটি তার পিছনে পিছনে ছুটত আর বলত, ও বর, বাড়ি যাচ্ছিস্? কখন আসবি? বিনয় তাকিয়ে হেসে চলে যেত।

সুখে-দুঃখে শিবনাথের জীবনের তিন বছর কেটে গেল। কল্যাণীর বয়স তখন দশ বৎসর আর বিনয়ের সতেরো। কথায় কথায় তাদের বিয়ের কথাটা যেন একটু পাকাপাকি হতে চলেছে। দু বাড়ির ভিতর আত্মীয়তা জমে উঠেছে। পূজোর সময় তত্ত্ব-তল্লাস চলেছে। মন্দাকিনীর আনন্দের সীমা নেই।

এই সময় শিবনাথের কর্মজীবনে একটি পরিবর্তনের সূচনা হল।

স্কুলের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট অন্নদা বসু দশ মাইল দূরে মহকুমা স্কুলেরও সম্পাদক ছিলেন। তাঁর স্কুলে হেডমাস্টারের পদ খালি হয়েছে দেখে তিনি শিবনাথকে সেই পদে নিযুক্ত করে দিলেন।

স্কুল থেকে একটু দূরে নদীতীরে একখানি ছোট দোতলা বাড়ি শিবনাথের বাসের জন্যে নির্দিষ্ট হয়েছিল। দোতলায় একখানি ঘর। বড় বড় জানালা

দিয়ে ঘেরা দুদিকের বারান্দা ঘরের কাজ করত। সেখানে দাঁড়ালে প্রশস্ত নদীর জল বহুদূর পর্যন্ত দেখা যেত। সন্ধ্যার সময় তীরের চট ও সুতোর কলের আলোয় জল ঝিকমিক করে জ্বলত।

গোপাল বাসার কাজকর্ম করে। সে মাঝে মাঝে ক্ষেপে উঠে। তার নাম গোপাল না হয়ে চণ্ডাসুর হলে মানাত ভালো।

ভূতের মতো চেহারা। অতি ঘোর নির্বোধ। বাপ ছিল না। মা ছিল না, ঘর ছিল না। ভিটেয় বাতি দিতে কেউ ছিল না। সাত বছর বয়সের সময় তার ভাইটাকে এক টাকা দিয়ে রামজয় কিনে এনেছিলেন। কালো কুচকুচে রঙ। শরীরের তুলনায় মাথাটা ছোট। চোখ দুটো ক্ষুদ্র। কবি বলেছেন, মানুষের মুখ নাকি দেবতুল্য, কিন্তু গোপালের মুখ ঠিক তার উল্টো। মেদিনীপুরের ভাষায় কথা বলে—না উড়ে, না বাংলা। উবো হয়ে বসে এক থালা ভাত ডাল চচ্চড়ি অম্বল এক সঙ্গে মেখে গোঁড়া পাকিয়ে দু মিনিটে গলাধঃকরণ করে। সে বলত, মুই সব জানি। জিজ্ঞাসা করলে বর্ণগুলি উল্টা-পাল্টা করে বলত। পচা বাসি দুর্গন্ধ ভাত তরকারি বাদ যেত না। রাগলে প্রলয় কাণ্ড আরম্ভ হয়ে যেত। দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে যা না তা করে বসত। রাগ করে খাটা পায়খানার গামলার কাছে বা সিঁড়ির নিচে অন্ধকার স্থানে দু-তিন বেলা না খেয়ে ঘুমোত। একবার কি কথায় এমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল যে, সে শিবানীর হাত কামড়ে রক্তারক্তি করে কোথায় উধাও হয়ে গিয়েছিল। পাঁচ-ছ মাস পরে হঠাৎ উদয় হয়ে তার মাকে বলেছিল, মোকে ভুলকি মেরা্যা একটা লোক কাই লিয়া গেছল মুই জানিনি। মোকে পেট পুর্যা ভাত খেতে দ্যায়নি, লুগা দ্যায়নি। মোকে মারত। মুই লুকিয়া পালিয়া আসিঠি। মুই আর কখনো যাব নি মা, তোকে ছেড়্যা। তুই বাবাকে বলিস মোকে যেন বকেনি।

শিবানী সহাস্যে তার সকল দোষ ক্ষমা করে তার গায়ে হাত বুলিয়ে বললেন, তোর চেহারা এমন হয়ে গেছে! তোর ভয় নেই। বাবু তোকে কিছু বলবেন না।

গোপাল ফিরে এসেছে শুনে শিবনাথ বললেন, আবার এই ভূতটাকে থাকতে দিলে? ও কোনদিন তোমাকে খুন করবে।

শিবানী হেসে বললেন, না, গো, না—ও আর কখনো কোথাও যাবে না।

এর পর সে আরও প্রায় পঁচিশ বছর শিবানীর কাছে ছিল। একেবারে পৃথিবী ছেড়ে যাবার আগে আর কোনদিন কোথাও যায়নি।

গোপালের পালিয়ে যাওয়ার পর শিবানী একজন ঝি রেখেছিলেন। তার নাম দুর্গা। আঠারো কুড়ি বছর বয়স। বিধবা। মিশমিশে কালো রঙ্। মুখ চোখের গড়ন ভালো। কৈবর্তের মেয়ে। খুব বিশ্বাসী, কর্মঠ ও গোছালো। রান্না করা ছাড়া শিবানীকে আর কোন কাজ করতে হ্‌ত না। ভোরে ঘুম থেকে উঠে সব বাসি কাজ সেরে রান্নার জল তুলে, বাটনা বেটে দিয়ে বড় বড় দুটো সাজা পান ও দোক্তা মুখে পুরে মাথার চুল খুলে দিয়ে আঁচলে চাবির ছড়াটা ঝুলিয়ে একটা ঝোড়া হাতে করে সে যেত বাজার করতে। কোন আলুওয়ালা তাকে দুপুরে ডাকত, কোন মুদী তাকে ডেকে বসাত, গল্প করতে বলত ইত্যাদি নানা কথা সে তার মা'কে বলত, আর খিল খিল করে হেসে ফেটে পড়ত।

একদিন এস. ডি. ও. সাহেব শিবনাথকে খাস কামরায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, মাস্টার মশাই, এখানে একজন অনারারি ম্যাজিস্ট্রেটের পদ শূন্য হয়েছে। আমি আপনাকে সেই পদে নিয়োগ করতে চাই। আশা করি, আপনি অমত করবেন না।

শুনে, শিবনাথ আশ্চর্য হয়ে বললেন, আমি আইন-কানুন কিছুই জানি না। আমি বিচার করব কেমন করে? আপনি আমাকে রেহাই দিন।

তিনি বললেন, আকাট মুখখুগুলো এই কাজ করছে। আপনি পারবেন না কেন? আপনাদের মতো শিক্ষিত ব্যক্তিরা যদি এই কাজে না আসেন, তাহলে আমরা কি শুধু ঘুষখোর গবেটদের দিয়ে এই সকল কাজ করাব? ভাবতে হবে না। পেনাল কোডের দু-চারটি ধারা পড়ে নিলেই চলবে। এই ফর্মখানিতে সই করে দিন। অমত করবেন না। শনিবার স্কুল ছুটির পর এখানে এলে চলবে।

তখনও শিবনাথ ইতস্ততঃ করছেন দেখে তিনি হেসে বললেন, আমি আপনাকে সাধাসাধি করছি। এই পদের জন্যে কতগুলি লোক উমেদার আছে জানেন? একটি চটকলের বড়বাবু নিজে উপযাচক হয়ে পাবলিক ফণ্ডে পাঁচ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত আছেন। মফঃস্বলের একটি ইজারাদার মুসলমান এই পদের জন্যে উমেদারি করছে। তার কিছু পয়সা আছে, তার প্রধান গুণ সে কলসী কলসী তাড়ি খায়, আর তার বড় ভাই

মুন্সেফির জন্যে নমিনেশন পেয়েছে। একজন জমিদার ম্যাজিস্ট্রেট থেকে কনস্টেবল পর্যন্ত গভর্নমেণ্ট অফিসারদের সার্টিফিকেট বাঁধিয়ে বৈঠকখানার দেওয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছে। তার প্রজারা দরখাস্তে লিখেছে তাদের জমিদার খুব গুণী জ্ঞানী সৎ ও বুদ্ধিমান। তারা তাঁকে হাকিম হিসেবে দেখতে চায়। তা ছাড়া চামড়ার ব্যবসায়ী মুসলমান, গোমস্তা, মহাজন, আড়ৎদার আবগারি দোকানের মালিকও উমেদার আছে। এরা হাকিম হলে মিষ্টি, শাড়ি, জুতো এমন কি একখানা মাতুর পর্যন্ত ঘুষ নিতে ছাড়বে না।

—এদের হাকিম করেন কেন ?

—উপায় কি ? ভাল লোক কি ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়াতে চায় ? ইংরেজ গভর্নমেণ্ট অপদার্থ লোককেই চায়। বিশেষতঃ এই যুগে।

এস. ডি. ও. সাহেবের অনুরোধে শিবনাথ অগত্যা ফর্মে সই করে দিলেন। যথা সময়ে তাঁর নাম গেজেটে ছাপা হল।

এস. ডি. ও. বলেছিলেন, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেটদের মধ্যে দু-চার জন ভালো লোক আছেন। তবে অধিকাংশই আমাদের ধামা-ধরা। না ডাকলেও তারা আসে। আমাদের পিছনে ঘুর ঘুর করে, খোশামোদ করে। আরে মশাই, আমরাও তো মানুষ। চক্ষুলজ্জাও তো আছে। খোশামোদে দেবতাও সন্তুষ্ট হন।

শিবনাথের বেঞ্চে একজন ভদ্রলোক বসতেন। তিনি ঘুষ নিতেন না। লোককে সন্তুষ্ট করার জন্যে অপরাধীকে ছেড়ে দিতে বা দণ্ড কমিয়ে দেওয়ার জন্যে অনুরোধ করতেন। একদিন শিবনাথ তাঁকে বলেছিলেন, আপনার অবস্থা ভালো। জমিজমা তেজারতি আর ব্যাঙ্কে লাখ খানেক টাকা আছে শুনি। আপনি এই মোষ-তাড়ানো কাজ নিলেন কেন ? তিনি বলেছিলেন, পাড়াগাঁর লোকের কাছে টাকার কোন দাম নেই। টাকা অনেকের আছে, বিশেষত এই যুদ্ধের বাজারে। স্বদেশী আমলে লোক দারোগা প্রভৃতি গভর্নমেণ্ট অফিসারদের ভয় করে। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট এখন আর সে ব্রিটিশ গভর্নমেণ্ট নেই। তারা এখন ছায়ায় ভূত দেখে। নিজের বা ছেলের বিরুদ্ধে একটা রিপোর্ট দিয়ে পুলিস যে কোন লোককে মামলায় জড়িয়ে দেয়। কংগ্রেসের গন্ধ পেলে তো আর রক্ষে নেই। এজন্যে অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট হলে হাকিম, দারোগাদের সঙ্গে দহরম মহরম হয়। লোকে সমীহ করে।

তা নইলে কি দেশে তিষ্ঠতে পারা যাবে ? এজলাসে বসলে উকিল-মোক্তাররা হুজুর হুজুর করে। শুনতে বেশ লাগে। তাই তো অনেক

কাঠখড় পুড়িয়ে এই পদটা যোগাড় করেছি। সমাজে খাতির পাওয়ার জন্যে সব কিছু করতে হয়।

—এই মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে দিনের পর দিন এস. ডি. ও. সাহেবের বাজার সরকারি করছেন ? আপনাদের রকমসকম দেখে আমার তো ঘেন্না ধরে যাচ্ছে। আমি হাকিমি ছাড়ব ছাড়ব করছি। শুধু সময় নষ্ট করা আর মিথ্যা কথা শোনা। উকিল-মোক্তাররা হাকিমের চোখে ধুলো দিতে চেষ্টা করে। হিমালয়-প্রমাণ মিথ্যার জঞ্জাল থেকে সত্য আবিষ্কার করা আমার মতো আইন-না-জানা ছেলে-ঠেঙ্গানো গুরুমশাই-এর কাজ নয়।

—আপনি জাত মাস্টার। বারো বছর মাস্টারি করলে বুদ্ধি-সুদ্ধি লোপ পায়। আপনার তো কুড়ি বছর হয়ে গেল। আপনারা আদৌ প্র্যাকটিক্যাল নন। ছেলে চরিয়ে চরিয়ে ছেলেমানুষ হয়ে গেছেন। মশাই, সংসারে প্র্যাকটিক্যাল হতে হয়।

—যারা চুরি-জোচ্চরি করে, শক্তিমানের খোশামোদি করে, নিজেদের কাজ গুছিয়ে নিতে পারে, সততা ও বিবেক বিসর্জন দিয়ে অপরকে প্রতারণা করার কৌশল জানে, তারাই জগতে প্র্যাকটিক্যাল মানুষ। এই ধরনের প্র্যাকটিক্যাল লোকের হাত থেকে ভগবান রক্ষা করুন।

তারপর হাতঘড়ি দেখে গাড়ির সময় হয়ে গিয়েছে বলে তিনি বললেন, আচ্ছা, আজ আসি। গাড়ি ধরতে হবে।

শশিভূষণ বাড়িতেই থাকতেন। পক্ষাঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। ভাইপো জমি বিক্রি করে তাঁর শ্রাদ্ধ করল। এক বছরের ভিতর বিধবা স্ত্রী ও একটি নাবালক ছেলেকে রেখে সেও নিউমোনিয়ায় মারা গেল।

সৌদামিনীর উপর সংসারের ভার পড়ল। তখনও যে জমি ছিল তা থেকে খোরাকির ধান পাওয়া যেত। নদীতে বান পড়লে দু-দশ হাঁড়ি ডিম পোনা এনে পুকুরে ছেড়ে দিতেন। মাছ বড় হলে বিক্রি করতেন। ডাঙ্গায় সংসার খরচের মতো বেগুন লাউ কুমড়ো লঙ্কা প্রভৃতি ফসল চাষ করতেন। বাগানের লেবু আম কাঁঠাল জাম প্রভৃতি ফল বিক্রি করতেন। এই ভাবে বুদ্ধিমতী সৌদামিনী সংসারের খরচ চালাতেন। চরকায় সুতো কেটে তাঁতির কাছে কাপড় বুনিয়ে নিতেন। বেশী কিছু টাকার দরকার হলে ঝাড় থেকে দু-এক শ বাঁশ বিক্রি করে দিতেন। শিবনাথ বড়দিদিকে সাহায্য করতে

চেয়েছিলেন। সৌদামিনী বলেছিলেন, এখন তো চালিয়ে নিচ্ছি, ভাই। প্রয়োজন হলে বলব। কোন দিন প্রয়োজন হয় নি। ঘরের উঠন, দাওয়া, বৈঠকখানা, ঠাকুর ঘর তকতকে ঝকঝকে ছিল। রামজয় অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সেবা যত্নের দিকে সৌদামিনীর দৃষ্টি সদা জাগ্রত ছিল। তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, ততদিন সারা বছর জিনিসপত্র যোগাড় করে রেখে বংশের নবমী পূজার পালাটি বজায় রেখেছিলেন।

বাবার কষ্ট হচ্ছে ভেবে শিবনাথ তাঁকে বাসায় আনতে চেষ্টা করেছিলেন। তিনি কিছুতেই এলেন না। বলেছিলেন, আর যে কটা দিন বেঁচে আছি এখানেই থাকব। যে মাটিতে অষ্টাশী বছর কেটেছে, আমি সেই মাটিতেই এই জীর্ণ দেহটা রাখতে চাই। এই আমার পিতৃপুরুষের ভিটে। তাঁদের পায়ের ধুলোয় এই স্থান পবিত্র। এখানে মরলে আমি স্বর্গে যাব।

শিবনাথ প্রতি শনিবার কিছু মিষ্টি নিয়ে বাবাকে দেখতে আসতেন। মিষ্টির ছোট হাঁড়িটা মাটিতে রেখে শিবনাথ যখন বাবাকে প্রণাম করতেন, তখন শালপাতায় বাঁধা হাঁড়ির মুখটা খুলে তিনি আট-দশটা পান্তোয়া টপাটপ গালে পুরতেন। ছোট নাতনীটার গালে হাতের রস মাখিয়ে দিয়ে হাঁড়িটা তার হাতে দিতেন।

মেদিনীপুরের পর পর দুজন ম্যাজিস্ট্রেট খুন হয়েছে। মেদিনীপুরকে সায়েস্তা করার জন্যে একজন দুর্দ্ধর্ব ম্যাজিস্ট্রেট এসেছে। নাম পেডি সাহেব। তার নাম শুনলে মেদিনীপুরের লোকের গায়ের লোম এখনও ভয়ে খাড়া হয়ে উঠে। মেয়েদের উপর অকথ্য পাশবিক অত্যাচার চলছে। ইংরেজ মরণ কামড় দিচ্ছিল। শিবনাথ ছুটে গেলেন দেশে। রামজয় বলেছিলেন, এবার ইংরেজ বেটাদের চার পোয়া পাপ পূর্ণ হল। এরা যখন মেয়েদের গায়ে হাত তুলেছে তখন আর ওদের রক্ষে নেই। এবার ওদের যেতে হবে। এখন তো আর মহারানী মা নেই। তাঁর আমলে আমরা সুখে ছিলাম। বেঁচে থাকলে তিনি এ সব কাণ্ড ঘটতে দিতেন না। আমাকে নিয়ে চল। বুড়ো বয়সে যবনের হাতে মার খেয়ে মরতে চাই না।

দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছে। মদের দোকানে, বিলিতী কাপড়ের দোকানে ও স্কুলে পিকেটিং চলেছে।

এই যুগে মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলন, সত্যাগ্রহ প্রভৃতি অহিংস কার্য-পদ্ধতি বিদেশী শাসকদের সুখনিদ্রা ভেঙ্গে দিয়েছিল। তাদের

দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে গভর্নমেণ্টের ধামাধরা দেশের লোক নিরীহ ব্যক্তিদের হয়রান করতে ছাড়ে নি। তারা ভেবেছিল এ-দেশে ইংরেজরা চিরকাল থাকবে। তাদের প্রিয়পাত্র হতে পারলে আখেরে কাজ দেবে।

শহরের এক প্রান্তে গঙ্গার তীরে নির্জন মনোরম স্থান। সেখানকার সুতোর কলটা উঠে গিয়েছে। বহু বৎসর ধূম উদ্‌গিরণের একটানা পরিশ্রমে ক্লান্ত তার সুদীর্ঘ বিরাট চিমনিটা ধীর স্থির দাঁড়িয়ে যেন অবসর ভোগ করছে। একটু দূরে পাঁচ বিঘা জমির এক অংশে শিবনাথ বাড়ি করেছেন। সামনে নদী-তীর পর্যন্ত সবুজ কৃষিক্ষেত্র। বাড়ির পাশে বাগান আর পুষ্করিণী। বৈঠকখানার সামনে ফুলের বাগান। তাতে আছে নানা জাতির গোলাপ বেল টগর যুঁই জাতি শেফালি মালতী কুন্দ চামেলি প্রভৃতি ফুলের গাছ। পুকুরের ওপারে আম লিচু জামরুল গোলাপজাম সফেদা কলা প্রভৃতি নানা জাতির ফলের গাঁছ। এক দিকে কফি বেগুন আলু লাউ মুলো পালংশাক প্রভৃতি তরিতরকারির গাছ। শিবানী আদর করে এই বাগান-বাড়ির নাম দিয়েছিলেন কুসুমপুর। পিছনে রেললাইন আর স্টেশন। গাড়ি আসার ও ছাড়ার ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায়। কতলোক উঠে আর নামে। তারপর বাঁশী বাজিয়ে হুম হুম শব্দে গাড়ি চলে যায় জলস্থল কাঁপিয়ে। মাঠের শেষপ্রান্তে জোয়ারের জলে গঙ্গা ফুলে উঠে। দেশবিদেশের কত জাহাজ যাতায়াত করে রঙ-বেরঙের পতাকা উড়িয়ে।

বাড়ির দক্ষিণ দিকে ফুল বাগানের মধ্যে সুন্দর মসৃণ শান্‌-বাঁধানো চওড়া চাতালটি শিবানীর বড় প্রিয় স্থান। সকল ঋতুতে বিশেষত গ্রীষ্মকালে বিকেল থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত সকল সময় তিনি চাতালে কাটাতেন। গৃহস্থালির কাজকর্ম এখন বিশেষ আর দেখতে হয় না। গোপাল বাইরের সকল কাজ করত। দুর্গা গৃহস্থালির সব কাজ করত। শিবানী শুধু আনাজ কুটে দিতেন এবং দুবেলা কি তরকারি হবে, তার ব্যবস্থা করতেন। তিনি দুর্গাকে সকল রকমের রান্নার কাজ শিখিয়ে দিয়েছিলেন। সাধারণ চাষীর মেয়ে ছিল এই দুর্গা। তার ভিতর যে সেবাপরায়ণা নারী সুপ্ত ছিল তা অনুকূল পরিবেশে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। তার গলার স্বরটা কাঁসার মতো খন্‌খনে ছিল। সে কল কল কথা বলত, খল খল হাসত, আর গল গল পান-দোক্তা চিবোত।

পড়াশুনা করার পর ছেলেরা গিয়ে বসত শিবানীকে ঘিরে। রান্নাবান্নার কাজ সেরে দুর্গা যেত মার কাছে সাজাপানের ডিবা, চুনের কৌটা, দোক্তার টিন, খাওয়ার জলের ঘটি নিয়ে। পাশে থাকত শিবানীর গ্রামসুবাদের ভাই শঙ্কর আর হাজরার পো। শঙ্করের বয়স আটাশ-তিরিশ। গুজরাটী চটকলের বাবু ছিল সে। মস্ মস্ করে খিলির পর খিলি সাজা পান চিবোত। খৈনি খেত। চটকলের গল্পে মশগুল থাকত। কোন্ কুলি কাজে ফাঁকি দিতে গিয়ে সাহেব ম্যানেজারের বুটশুদ্ধ লাথি খেয়েছে, কে পিলে ফেটে মরেছে, রোগে মরেছে বলে ডাক্তার সার্টিফিকেট দিয়ে কত টাকা ঘুষ নিয়েছে, কেমনভাবে গুজরাটী বাবুরা বাঙালী বাবুদের তাড়িয়ে নিজেদের দেশের অকেজো লোককে বেশী মাইনে দিয়ে কাজে লাগিয়েছে, কেমন করে লাখ লাখ টাকা চুরি হয়েছে, কিভাবে কুলিরা বস্তিঘরে শিয়াল-কুকুরের মতো বাস করে ইত্যাদি কথা ফলাও করে সে গল্প করত। শঙ্কর বলেছিল, এরা মিলমালিককে ফাঁকি দেয় আর মিলমালিক গভর্নমেণ্টকে ফাঁকি দেয়। জেঠি টিকটিকি পর্যন্ত ঘুষ নেয়। ইন্‌স্‌পেক্টররা ঘুষ নেয়। অডিটার ঘুষ খায়। বড় কর্তারা ঘুষ নেয়। ঘুষ কোথায় নেই? বোধ হয় স্বর্গেও আছে। ঘুষ নেয় না কে? বোধ হয় দেবতারাও ঘুষ নেয়। শুধু আমাদের বেলা পান থেকে চুনটুকু খসতে পারে না। কৃষ্ণের সব লীলাখেলা, পাপ শুধু আমাদের বেলা। মিলের কথায় তার মুখে খৈ ফুটত। সে বলত, চুরি না হলে চটকলগুলো সোনার ইটে গাঁথা হত।

শঙ্কর শিবানীকে আপন দিদির মতো দেখত। শিবনাথকে আপন ভগ্নীপতির মতো ভালবাসত। ছেলে-মেয়েদের আপন ভাগ্নে-ভাগ্নীর মতো স্নেহ করত। সব ঋতুতে শীতে গ্রীষ্মে ও বর্ষায়, রবিবারে, ছুটির দিনে এবং প্রত্যহ মিল ছুটির পর সন্ধ্যায় সে আসত। রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত খোলা বাতাসে বসে গল্পগুজব করত। তারপর শিবনাথের গা হাত পা টিপে দিয়ে বাড়ি যেত। তার কথার ভিতর দিয়ে দুঃখী কুলি মজুরদের প্রতি দরদ, মিলমালিকদের প্রতি বিতৃষ্ণা, অফিসারদের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ পেত। রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও সে এ বাড়ির সকলের আপন-জন হয়ে গিয়েছিল। তার প্রাণখোলা হাসি, সুখদুঃখে সমভাবে সকলকে মুগ্ধ করেছিল। সকল কাজে সে ছিল শিবনাথের ডান হাত।

হাজরার পো ছিল জাতে বাগ্দী। বয়স সত্তরের কাছাকাছি। শরীর

অপটু। শিবানী তাকে বাগানের কাজে লাগাতেন। ঘাস বাছা আর গাছের গোড়া খুসকানো ছাড়া কোন শক্ত কাজ সে করতে পারত না। শিবানী বলতেন, হাজরার পো কাজের লোক। আহা, বেটাপুত্তুর নেই বেচারীর। বুড়ো বলে কেউ তাকে খাটতে নেয় না। আমি যদি না খাটাই, সে খাবে কি করে? সে দুবেলা চা খেত, আর চায়ের সঙ্গে দু-চার মুঠো মুড়িও পাওয়া যেত। এক টাকা মজুরি নিয়ে চার দিন খাটত।

একদিন সন্ধ্যায় সময় হাজরার পোকে নিয়ে শিবানী চাতালে বসে আছেন, এমন সময় দুর্গা ছুটে আসতে আসতে চিৎকার করে বলছে, ওমা, শুনেছ, মুখপোড়া গোপালের কথা? সে বলে, আমি তো মার বড় বেটা। বল না মাকে, মোর একটা ব্যা দিতে। শিবানী বললেন, তাই নাকি রে? গোপালের বিয়ে করার মন হয়েছে। হবেই তো। বেটাছেলে। বয়েসও তো হয়েছে।

দুর্গা চটেমটে বলল, রক্ষে কর, মা। নিজে ভাত পায় না, আবার ভাইপো সঙ্গে! মুখপোড়াকে ঝেঁটাপেটা করে এখুনি বিদেয় দে। যাচ্ছি বাঁদরটাকে বাঁ পায়ের তিনটে লাথি মেরে দূর করব। দুর্গা যেমন ঝড়ের মতো এসেছিল তেমনি ঝড়ের মতো চলে গেল।

শিবানী হাজরার পো-কে বললেন, সত্যিই তো গোপালের একটা বিয়ে দিয়ে ওর একটা হিল্লে করে দেওয়া তো উচিত। দেখ না হাজরার পো, একটা মেয়ে পাওয়া যায় কিনা। তুমি তো গুণিন। দূরের গ্রাম থেকেও তো তোমার ডাক আসে। শঙ্কর তাঁর কথায় সায় দিয়েছিল।

হাজরার পো ওখানের নামজাদা লোক। সাপে কাটলে ঝাড়ফুঁক করে বড়িজড়ি দিয়ে রুগীকে ভালো করত। চণ্ড নামানো, ভূত ছাড়ানো, জলপড়া ও চাল পড়া দেওয়া, বাটি চালানো, নল চালানো, বশীকরণের মন্ত্রতন্ত্র জানত। হাজরার পো বললে, ঠিক বলেছ, মা। এই তো সেদিন একটা সাপে কাটাই রুগী দেখতে সেওড়া গাঁয়ে গিয়েছিলাম। লোকটাকে গোখ্‌রা সাপে কামড়েছিল। অনেক দেরি করে খবর দিলে কিনা। তখন বিষ মাথায় উঠে গেছে। বার বার ঝাড়ফুঁক দিলাম, কত তুকতাক করলাম, কত বড়িজড়ি খাওয়ালাম। বাঁচাতে পারলাম না। ঐ গাঁয়ের একটি মেয়ে বলেছিল তার একটি আট-ন বছরের মেয়ে আছে। শুধু একটি মেয়ে। সে একটি ছেঁউড়ে ছেলে চায়। মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে ঘরজামাই রাখবে। গোপালের তো তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। তোমার অবর্তমানে

দাদাবাবুরা কি আর গোপালকে রাখবে? শতখানেক টাকা হলে চলবে। গোপাল মা পাবে, ঘর পাবে, জমিজায়গা পাবে। চাষীর ছেলে খেটেখুটে চালিয়ে নেবে। শিবানী খুসী হয়ে হাজরার পো-কে সব ঠিক করতে বললেন।

শুনে, দুর্গা বলল, মা, তোর সব ভালো। মাঝে মাঝে এমন একটা কাজ করে ফেলিস যার দরুন তোর উপর ভক্তি চটে যায়। একটা পরের মেয়েকে ওই বাঁদরটার গলায় জড়িয়ে দিয়ে তার সর্বনাশ করতে চাস? আমার মেয়ে হলে তার গলায় কলসী বেঁধে গঙ্গার জলে ফেলে দিতাম তবু অমন হতভাগার সঙ্গে তার বিয়ে দিতাম না।

শিবানী বললেন, কেন, তোর অত হিংসে কেন? হাজরার পোকে বলে তোর জন্যে একটা বর যোগাড় করে দেব। দুর্গা চোখমুখ তুলে বলল, তাহলে পেথমেই তো কাঠের চেলা মেরে ঘটকের কুঁজো পিঠ সিদে করে দেব। আর বরের বাপের নাম ভুলিয়ে দেব। শিবানী হেসে বললেন, এমন মেয়ে কোথাও দেখিনি বাপু। তোর বরটা মরে বেঁচেছে।

বিয়ের দিন স্থির হয়েছে। গোপাল জীবনে পালকি চড়েনি। তার শখ সে পালকি চড়ে বিয়ে করতে যাবে। আবার বাজনাও চাই। নইলে বিয়ে করবে না। শুনে, শিবনাথ বললেন, এ বড় বাড়াবাড়ি করছ, শিবানী। বেটার বিয়ে হয় কিনা, আবার পালকি বাজনা চাই। শিবানী বললেন, আহা, বেচারীর শখটা কেন থেকে যায়! বাজনার খরচ তো তিন চার টাকা। এতই যখন হল আর ওটুকু কেন বাদ থাকে।

নতুন কাপড়, গলায় ফুলের মালা, কপালে চন্দনের ফোঁটা পরে বর সেজে গোপাল বসল পালকিতে। সে মিটমিট চায় আর ফিকফিক হাসে। পরদিন বেলা দশটার সময় বর-কনের পালকি শহর ঘুরে বাড়িতে এল। শিবানী বর-কনেকে বরণ করে ঘরে তুলে নিলেন। দুর্গা ফিসফিস করে কল্যাণীকে বলল—ভ্যাখ, দিদিমনি, ইচ্ছে হচ্ছে মুড়ো ঝাঁটাটা দিয়ে মুখপোড়ার পিঠে দু-চার ঘা বসিয়ে দিই। কল্যাণী চুপি চুপি বলেছিল—চুপ কর না, দুর্গাদি। মা শুনতে পেলে অনর্থ করবেন। দুর্গা রেগে গস্‌গস্‌ করতে করতে বাড়ির ভিতর চলে গেল।

রামজয়ের শরীর একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। এখন আর তাঁকে দেশের বাড়িতে ছোটবউ ও সৌদামিনীর হেপাজতে ফেলে রাখা সমীচীন নয় ভেবে

তাঁকে আনতে শিবানী ও শিবনাথ চাঁপাগ্রামে উপস্থিত হলেন। তাঁদের অনুরোধ শুনে রামজয় শিবানীকে বললেন, দেখ মা, আমি বুঝতে পেরেছি আমার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আমার এই সুদীর্ঘ জীবনের নব্বই বছর এখানেই কেটেছে। আমি এখানেই আর কটা দিন কাটিয়ে মরতে চাই। এই গ্রাম, এর ধুলো, এর মাটি, এর গাছ-পালা, এই ঘর, এই কংসাবতী—এদের ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। আমি এখানেই জন্মেছি, এখানেই শেষ নিশ্বাস ফেলব। কংসাবতীর ধারে আমার এই জীর্ণ দেহটা পুড়ে ছাই হবে। কংসাবতীর বন্যাস্রোত সেই ছাইগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে সমুদ্রে ফেলবে। তোমরা আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে চেও না। কেন, এরা তো কেউ আমার অযত্ন করছে না। ভালভাবেই আমার সেবা করছে। শুনে, শিবনাথ বললেন, সেবার ত্রুটি হচ্ছে না, জানি। এখানে ছোট বউমা আছেন, তাঁর মেয়েরা আছে, ছোটদি আছেন, আর সকলের উপরে সেবা-ধর্মের মুর্তিমতী দেবী বড়দিদি আছেন। চাকরির জন্যে তো আমরা দূরে থাকতে বাধ্য হয়েছি। ছুটি-ছাটার সময় ছাড়া তো আপনাকে দেখতে পাইনি। আপনার সেবা করতে পারিনি। দূরে থেকে আমাদের সোয়াস্তি নেই, সর্বদা মনে হয় আমরা অপরাধী। টাকা পাঠানো তো কিছু নয়। টাকা তো আর সেবা করে না।

শিবানী বললেন, বাবা, আট বছর বয়সে আমি মা হারিয়েছি। দশ বছর বয়সে বাবা মারা গেছেন। সেই অবধি আমি এখানে আপনাদের কাছে মানুষ হয়েছি। এই আমার বাপের বাড়ি, এই আমার স্বামীর বাড়ি, এই আমার শ্বশুর-বাড়ি। আমি আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনি চলুন আপনার ছেলের নতুন বাড়িতে। আপনার কোন কষ্ট হবে না। আপনার পায়ের ধূলির স্পর্শে—সে বাড়ি পবিত্র হবে।

শিবানী আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন। দেখে, রামজয় বললেন, তবে নিয়ে চল আমাকে। তোমাদের মনস্কামনা পূর্ণ হোক। হয়তো আমি আর ফিরে আসব না। জন্মভূমির কাছে শেষ বিদায় নিয়ে যাব—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আর এতকাল যাঁকে ছেড়ে কোথাও যাইনি…যাঁকে তুলসী চন্দন দিয়ে পূজা না করলে আমার দিনটা বৃথা যায় বলে মনে করি, আমার সেই প্রাণের ঠাকুর লক্ষ্মীজনার্দনকে গলায় ঝুলিয়ে নিয়ে যাব। মৃত্যুর সময় তিনি আমার কাছে থাকলে আমি স্বর্গে যাব।

রামজয়ের নতুন বাড়িতে আসার পর তিন মাস কেটে গেল। ক্রমে

তাঁর আহার কমে গেল। তিনি বিছানা নিলেন। তাঁর দিন ঘনিয়ে এল। কখন চেতন, কখন অর্ধচেতন, কখন অচেতন অবস্থায় কাটল শেষ তিন দিন। শেষ দিন সন্ধ্যা থেকে যেন অসাড় নিস্পন্দ। হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে উচ্চ কণ্ঠে অস্পষ্ট ভাষায় বললেন, বেলা হয়ে গেল। ঠাকুরের এখনও পূজো হল না। যাই শীগগীর একটা ডুব দিয়ে আসি। তারপর শুয়ে পড়লেন। সব নিস্তব্ধ! সব শেষ!

॥ পঁচিশ ॥

মৃত্যুর বছর তিনেক আগে রামজয় বলেছিলেন—দেখ, শিবু, এখান থেকে তোমার বালেশ্বরের জমি দেড় শ মাইল দূর। লোকে কথায় বলে, গরু-জরু-ধান, তিন রাখবে বর্তমান। আজকাল লোকের ধর্মভয় নেই। ভাগ-চাষীরা চোখের আড়ালে ধান চুরি করে নেয়। চাকরি করবে আর জমি চাষ হবে? তা হয় না। দু নৌকায় পা দিতে নেই? তাতে ভালো হয় না।

রামজয়ের কথা বর্ণে বর্ণে সত্য হল। বছর কয়েক এক শ বিঘা জমিতে নাকি ভালো ধান হচ্ছে না। কখন ধানে পোকা ধরে। কখন নীলগিরি থেকে বন্যা আসে। ধানগাছ নষ্ট হয়ে যায়। কখন হাজা, কখন শুকো, কখন ধান চুরি। কখন ধানের গাদায় আগুন ধরে। নানা অজুহাতে চাষীরা বছরে বিশ-পচিশ মণ ধান দেয়। ধান বিক্রি করে খাজনা আর চৌকিদারী ট্যাক্স দিতে টাকা নিঃশেষ হয়ে যায়। আয় তো নেই, বরং বাড়ি থেকে টাকা পাঠাতে হয়। জমি বিক্রি করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

ওদিকে আবার শিবানীর শরীরটা ভালো যাচ্ছিল না। ডাক্তারের পরামর্শে শিবনাথ সপরিবারে বায়ু পরিবর্তন করতে যাবেন স্থির করলেন। তাঁর এক মোক্তার বন্ধু শ্যামবাবুও ছেলেপুলেদের নিয়ে তাঁর সঙ্গে যাবেন স্থির হয়েছে। ঘাটশিলায় দুখানি বাড়ি ভাড়া করা হল।

ঘরকুনো ছা-পোষা বাঙালীর বিদেশ যাত্রা একটা বিরাট কাণ্ড। আগের স্টেশনে সকলকে নিয়ে শিবনাথ গাড়িতে উঠেছেন। পরের স্টেশনে দেখা গেল শ্যামবাবু তাঁর বিপুল বপুখানি নিয়ে ছুটাছুটি করছেন। প্ল্যাটফর্মের উপর চার-পাঁচটি শতরঞ্জি জড়ানো বিছানার মোট। কাপড়-চোপড় ভর্তি দু-তিনটি ছোট বড় ট্রাঙ্ক, সুটকেস, বাসন-কোসনের তল্পি ঝোড়া। বিদেশ-বিভূঁয়ে

গিয়ে পাছে বেশী দাম লাগে, এজন্যে শ্যামবাবুর গৃহিণী অনেক বুদ্ধি খরচ করে চাল ডাল তেল নুন গুঁড়ো মসলা, কর্তার জন্যে খান-কয় আমসত্ত্ব, এক ভাঁড় পুরানো তেঁতুল, বঁটি শিল নোড়া, মায় মশারি টাঙ্গানোর জন্যে পেরেক কতগুলো, এমন কি আলু বেগুন কুমড়ো পেঁপে ইত্যাদি কাঁচা আনাজের দু-তিনটে ঝোড়া প্রভৃতি জিনিসপত্রের একটা ছোট পাহাড় সজ্জিত ছিল। চার-পাঁচ জন কুলি মোট তুলতে হন্তদন্ত হয়ে গিয়েছিল। গৃহিণীর কোলে একটা আট মাসের মেয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করে কাঁদছে। আবার একটির আসার দিন এগিয়ে এসেছে। আগে গৃহিণীকে গাড়িতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে শ্যামবাবু ঘর্মাক্ত কলেবরে প্ল্যাটফর্মের এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছেন আর চিৎকার করছেন, ওরে ও ঝণ্টু উঠেছিস তো, ঝণ্টু নেণ্টু ঘণ্টু পিণ্টু—কে কে কোথায় গেলি রে! আঃ মেয়েগুলো কে কোথায় উঠল রে—ওরে ও শিবি, কালি, হেমি—তোরা উঠেছিস তো রে? শ্যামবাবুর আঁক-পাঁকানি দেখে শিবনাথের গাড়ি থেকে বিনয় ও সুশোভন নেমে পড়েছে। এক একটা ছেলেমেয়েকে ধরে বস্তার মতো গাড়ির ভিতর ঠেলে দিয়ে কপাট বন্ধ করে দিচ্ছে। একখানা বড় কামরা পুঁটলি-পোঁটলা জিনিসপত্র ছেলেমেয়েতে ভর্তি হয়ে গেছে।

শ্যামবাবুর এক গাদা ছেলেমেয়ে ও লটবহর দেখে স্টেশন মাস্টার গাড়ি ছাড়তে পাঁচ মিনিট দেরি করে দিয়েছিলেন। শেষ ঘণ্টা পড়ল। গাড়ি ছেড়ে দিল। এক একটা স্টেশনে গাড়ি থামে, আর শ্যামবাবু প্ল্যাটফর্মে নেমে ডাব কিনতে, দুধ যোগাড় করতে, বাদাম ভাজা কিনতে ছুটাছুটি করেন। প্রতি স্টেশনে ঘটি ভর্তি করে খাবার জল আনেন। গাড়ির ভিতর একটা বিশ্রী কাণ্ড ঘটছে। কোন্ ছেলেটা কাঁদছে, কোন্ মেয়েটা বায়না ধরেছে, কেউ কাপড়-চোপড় নোংরা করছে। কেউ বা পায়খানার দরজা খুলছে, আর বেরুচ্ছে, কেউ বা বাদাম ভাজা চিবোচ্ছে, কেউ নেবু খাচ্ছে। পূজোর সময়। গাড়িতে ভিড়। কিন্তু শ্যামবাবুর বালখিল্য বাহিনী স্থান জোড়া করে আছে, আর গাড়ির মেঝে নোংরা দেখে প্যাসেঞ্জাররা গাড়ির দরজা খুলে উঠে পড়ে আর ভিতরে কাণ্ডখানা দেখে প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে পড়ে, অথবা পরের স্টেশনে নেমে অন্য গাড়িতে উঠে। সুশোভন বিনয়ের কানে কানে বলছে—বিনয়দা, শ্যামবাবু কি পাগল? গুচ্ছেক ছেলেমেয়ের ঝক্কি নিয়ে ভদ্রলোক বিদেশে যাচ্ছেন কেন? মরণ আর কি! বিনয় মুখ টিপে হাসে।

বাসায় পৌঁছে শিবানী গোপালকে নিয়ে জিনিসপত্র গোছগাছ করতে

লাগলেন। ছেলেদের নিয়ে শিবনাথ দোকানে যাওয়ার জন্যে বেরিয়েছেন দেখে শ্যামবাবু বললেন, কি হে মাস্টার, বাসায় আসতে না আসতে কোথায় যাচ্ছ? জিনিসপত্র কিনতে দোকানে বোধ হয়? আমার গিন্নী কেমন বুদ্ধিমতী দেখ। তোমার মতো ধুলো পায়ে বাজারে ছুটতে হচ্ছে না।

শিবনাথ হেসে বললেন, হবেই তো, হাজার হোক তিনি মোক্তারের গিন্নী। মাস্টারদের বউরা একটু বোকাসোকা হয়। তাই তো তাদের সারা জীবন এত দুঃখু। গিন্নীর প্রশংসা শুনে এক গাল হেসে তিনি চলে গেলেন।

ইটের দেয়ালের উপর করুগেট টিনে ছাওয়া বাংলোর ধাঁচের বাড়ি। একটি উঁচু টিলার সানুদেশে এমন ভাবে তৈরি যে তাতে আলো-হাওয়ার অভাব ছিল না। তিনখানি বড় ঘর। হাত-পা ছড়িয়ে আরামে থাকা গেল। ভোরে উঠে হালুয়া-চা খেয়ে সকলে বেড়াতে বেরুত। বিকালে চারটা থেকে রাত্রি আটটা পর্যন্ত কেউ ঘরে থাকত না। ছেলেমেয়েরা সমবয়সী অনেক বন্ধু জুটিয়ে নিয়েছিল। দু-চার দিনের মধ্যে তারা তিন-চার মাইলের ভিতর সকল স্থান দেখে নিয়েছিল। আজ হরিণ-ধুবড়ী, কাল তামুকপাল, পরদিন মৌভাণ্ডারের তামার কারখানা, এখানে-ওখানে ছোট-বড় টিলা দেখে বেড়াত। দশ-পনরো দিনের মধ্যে শিবানীর শরীর অনেকটা সেরেছে। তিনি ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে হাঁটতে পারতেন না। তাঁকে নিয়ে শিবনাথ শাল-মহুয়ার বনে বেড়াতেন।

একদিন শালবনের ভিতর পায়ে চলার সরু রাস্তা ধরে তাঁরা বেড়াচ্ছিলেন। বহুদূর বিস্তৃত মানুষ-প্রমাণ শালগাছের সারি। মাঝে মাঝে দু-চারটে দীর্ঘ শালগাছ উঁচুতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। তাঁরা বনের ভিতর চৌমাথায় উপস্থিত হলেন। কোন্ রাস্তা ধরলে বাসার দিকে আসা যাবে ঠাহর করতে না পেরে ভুল পথে চলতে লাগলেন। কিছু দূর আসার পর গভীর জঙ্গলের ভিতর সাঁওতালদের দু-একটি কুঁড়ে তাঁদের চোখে পড়ল। সামনের উঠন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন তক্‌তক্ করছে। তাঁরা একটি কুঁড়ের উঠনে দাঁড়ালেন। সাঁওতাল ছেলেমেয়েরা দৌড়ে এল। তাদের পিছনে ছিল তাদের মায়েরা। পুরুষরা বাড়িতে ছিল না। মেয়েরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বললে যে তাঁরা ভুল রাস্তা ধরে মৌভাণ্ডারের দিকে চলেছেন। স্টেশনের দিকে যাওয়ার পথ ছেড়ে এসেছেন। দড়ির খাটিয়ার উপর তাঁদের বসতে দেখে এদের আনন্দের সীমা ছিল না। কি দিয়ে সম্মানিত অতিথিদের অভ্যর্থনা করবে স্থির করতে

পারছিল না। তাদের মধ্যে একটি মেয়ে নিজের খোঁপার একটি লাল ফুল নিয়ে শিবানীর হাতে দিল। তাদের ঠোঁটে মিষ্টি হাসি, চোখে কোমলতার চিহ্ন, মুখে সরলতার ছাপ দেখে শিবানী মুগ্ধ হয়েছিলেন। আঁচলের গিঁঠ খুলে সামান্য কিছু পয়সা ছেলেমেয়েদের হাতে দিলেন। তারা আনন্দে নাচতে লাগল। তাদের মায়েদের মুখ সলজ্জভাবে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। একটি মেয়ে তাঁদের ঠিক পথ দেখিয়ে দিয়ে গেল।

শিবানী বললেন, কেমন সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল চেহারা এদের, যেন কালো পাথরে খোদাই করা। কিন্তু দিনের পর দিন এরা কেমন করে এমন জঙ্গলে বাস করে বুঝতে পারি না।

শিবনাথ বললেন, এরা বন্য প্রকৃতির মধ্যে সহজ হয়ে বাস করে। আমরা সভ্য সমাজের মানুষ বলে বড়াই করি। ব্যবহারিক জীবনের উপর আবরণ টেনে চলি। প্রতিদিন নিজেদের নতুন ছাঁচে গড়ে তুলি। যাদের একেবারেই পছন্দ করি না, তাদের সঙ্গে হেসে কথা বলি। যাকে জানি ঠক মিথ্যাবাদী, তার সঙ্গেও হৃদ্যতা করি। অপদার্থ ব্যক্তির খোশামোদ করি, চরিত্রহীনের সঙ্গে উচ্চ তত্ত্বের আলোচনা করি। এরা আমাদের মতো পালিশ-করা সমাজে থাকে না। মানুষ সমাজে নিজের প্রকৃত পরিচয় দেয় না, সর্বদা আত্মগোপন করে চলে। আমাদের মধ্যে সাধুতা বোকামির নামান্তর, সরলতা দুর্বলতার লক্ষণ, ভালবাসা পরিহাসের বস্তু। বিবেকানন্দ বলেছেন—যদি হতে পার মুখে মধু, অন্তরে গরল, তবে পাবে এ জগতে স্থান। যে যত বড় ধাপ্পাবাজ, আমরা তাকে তত বড় বুদ্ধিমান বলি।

শিবানী বললেন, ঠিকই বলেছ তুমি। মেয়েদের মধ্যেও তো তাই দেখি। তারা গয়না আর কাপড় দিয়ে মনের দৈন্য ঢাকে। মদখোর চরিত্রহীন রাগী স্বামীর গুণগানে পঞ্চমুখ। আমি বড় লোকদের সঙ্গ এড়িয়ে চলি। আমার ভালো লাগে—হাজরার পো-কে, গোপালকে, মুক্তাদিদিকে। এরা সহজ সরল। এদের প্রকৃতি বোঝা যায়। এরা নিজেদের লুকিয়ে রাখার কৌশল শেখেনি।

কথা বলতে বলতে তাঁরা জঙ্গল পার হয়ে বড় রাস্তার উপর এলেন। তখন বেলা হয়ে গেছে। বাসায় ফিরে এসে শিবানী পথ হারিয়ে যাওয়ার কথা ছেলেদের বললেন। বিনয় বলল, এমন ভাবে জঙ্গলে বেড়াতে যাবেন না। সাঁওতালরা ভালো। ভাগ্যিস্ আপনারা কোন লোধার হাতে পড়েন নি! লোধারা বড় দুর্দান্ত, বড় নিষ্ঠুর।

আর একদিন শিবানীকে নিয়ে শিবনাথ বেড়াতে বেরিয়েছেন। বাসা থেকে আধ মাইল দূরে সুবর্ণরেখা। ঠিক যেন কংসাবতী। তেমনি কালো ঝিম জল। তেমনি ঝিরঝিরে স্রোত বালুর উপর দিয়ে ধীরে ধীরে গড়িয়ে চলেছে। পায়ে হেঁটে লোক নদী পারাপার করছে। অস্তগামী সূর্যের সোনালি আভা নদীর কালো জলে আর দূরে সীমাহীন নীল আকাশের গায়ে প্রতিফলিত দিগন্তব্যাপী শৈলশ্রেণীর উপর পড়ে এক অপরূপ মায়া রচনা করেছে। বালুর উপর একখানা কালো পাথরের উপর বসলেন শিবানী ও শিবনাথ। ক্রমে বায়ুভুক নর-নারীর ভিড় কমে গেল। নদী-সৈকত জনশূন্য। দেব-মন্দিরের কাঁসর-ঘণ্টার দূরাগত ধ্বনি সান্ধ্য-গগনের নিস্তব্ধতাকে আরও গম্ভীর করে তুলেছিল। ক্লান্ত সন্ধ্যার দিগন্তে বায়ু মন্থর। বিহঙ্গের গান শান্ত। যেন চেতন জগৎ এবং পৃথিবীর সব কিছু ঘনায়মান সন্ধ্যার পক্ষ-ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে।

কিভাবে সময়টা চলে গেছে তাঁরা বুঝতে পারেন নি। কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথির অপসৃয়মান আঁধার ভেদ করে চাঁদের আলো ও-পারের সবুজ গাছপালা, নদীর কালো জল, সাদা বালুর উপর ঝক্‌ঝক্ করছে। এমন সময় শোনা গেল অশরীরী মধুর কণ্ঠস্বর—আপনারা এখনো এখানে বসে আছেন? তাঁরা পিছন ফিরে দেখলেন বিনয় আর সুশোভনকে।

শিবনাথ বললেন, তাই তো বটে বড় দেরি হয়ে গেছে। চল, বাসায় যাওয়া যাক।

বাংলোর পশ্চিম দিকটা অবারিত উন্মুক্ত। হেমন্তের মিষ্টি ঝিরঝিরে হাওয়া। উঁচু-নিচু ঢেউ খেলানো মাঠ। কোথাও কিছু ধান ফলেছে। কোথাও উলঙ্গ ডাঙ্গা পড়ে আছে। কোথাও দু-চারটে মহুয়া বা শাল গাছ। এ যেন এক মায়া, স্বপ্ন। শিবানী একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে জানালার পাশে বসে আছেন খোলা মাঠের দিকে নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে। বিনয় সুশোভন অপর্ণা এবং আরও কয়েকটি ছেলেমেয়ে ছুটে চলেছে মাঠের ভিতর দিয়ে যেন আকাশটাকে লুট করে নিতে। পাশের ঘর থেকে শিবনাথ নিঃশব্দে উঠে এসে কখন যে শিবানীর পাশে দাঁড়িয়েছেন, তা তিনি টের পাননি। সহসা তাঁর চমক ভাঙ্গল শিবনাথের স্পর্শে। শিবনাথ তাঁর কাঁধের উপর একটা হাত রেখে জিজ্ঞাসা করলেন, এখানে একলাটি বসে কেন, শিবানী? শিবনাথ নিরালায় শিবানীকে নাম ধরে ডাকতেন। ছেলেদের সামনে তাঁকে বড় বউ বলতেন।

শিবানী চমকে উঠে মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিলেন। বললেন, বিনয় কাল চিঠি পেয়েছে সে আইন পরীক্ষা পাস করেছে। তার মা তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। টাটার লোহার কারখানা দেখে আসার পর সে বাড়ি যাবে। এবার বোধ হয় তারা ওর কাছে একটা শেষ কথা জানতে চাইবে। দেখতে দেখতে মেয়েটা তো এই পনরো বছরে পা দিল। বিনয়ের বাপের যদি একান্ত অনিচ্ছা থাকে, তাহলে এখানে বিয়ে না হওয়াই ভালো। তোমার তো কিছু ভাবনা চিন্তা নেই। শুধু বই কেনা, বই পড়া, ছেলে পড়ানো, আর লেখা। কি যে এত পড় আর লেখ—ছাই তা তো বুঝি না! ছেলেদের সঙ্গে মিশে তুমি তো একেবারে ছেলে-মানুষ হয়ে গেছ। কোনদিন সাবালক হলে না।

—চিন্তা করে কি হবে? যা হওয়ার তা হবে। মানুষ ইচ্ছে করলেই তো সব কিছু করতে পারে না।

—বিনয়ের কি ইচ্ছা তুমি জান?

—তার তো পুরো ইচ্ছে কল্যাণীকে বিয়ে করার। কিন্তু বাড়ির সকলের মত না থাকলে মেয়েটার দুর্দশা হবে। বিনয় বলে, আমি বড় হয়েছি। আজ বাদে কাল ওকালতি করতে বসব। আমি তো আর নাবালক শিশুটি নই?

—তবে আর চিন্তার কারণ কি?

—আমি ভুক্তভোগী। তাই এত দুর্ভাবনা। শ্বশুর-শাশুড়ী এখন স্বর্গে গেছেন। তাঁদের নিন্দে করে নরকে যেতে চাই নে। তুমি তো সব জান।

—জানি বলে তো বলছি। এখন আর সেকাল নেই। ছেলেমেয়েরা বড় হয়েই বিয়ে করে। বিনয় তো নেহাত ছোটটি নয়। সে নিজের দায়িত্ব বোঝে।

—যতই বুঝুক সে এখনও সংসার করেনি। কল্যাণীকে সে ভালবাসে সত্যি, কিন্তু বেশী ভালবাসে তোমাকে। কল্যাণী উপলক্ষ্য মাত্র। মাস্টার-মশাইকে আপন করে পাবে বলে সে মাস্টারমশাই-এর মেয়েকে বিয়ে করতে চায়। সমস্ত পৃথিবী একদিকে আর তুমি অন্যদিকে থাকলে, সে সব ছেড়ে তোমাকেই চাইবে।

—তাহলে তো ভালোই হবে।

—কিন্তু তার বাবার যদি অমত থাকে, তাহলে তিনি হয়তো ছেলেকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করবেন। বিনয় শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ছেলে জানি, কিন্তু হাজার বুদ্ধিমান হলেও আজকাল ওকালতিতে পসার করতে দশ বছর লাগে।

ততদিন মেয়েকে বাপের বাড়িতে পড়ে থাকতে হবে, নইলে দুর্গতির সীমা থাকবে না। তোমাকে ভালবাসলে তো মেয়ের সুখ হবে না।

—সবুরে মেওয়া ফলে। দেখা যাক না কোথাকার জল কোথায় যায়।

—তা হোক। আমার বড় আদরের একটি মেয়ে। তার কপালে কি আছে কে জানে? তাঁর চোখ ছল ছল করে এল।

—তুমিও তো বাপের এক মেয়ে। তোমার বাবা চোখ কান বুজে কপাল ঠুকে আমার মতো একটা সেকেণ্ড ক্লাসের পড়ুয়া নাবালক ছেলের হাতে তোমাকে তুলে দিয়েছিলেন। তুমি কি জীবনে অসুখী হয়েছ? দেখ, বিয়ে একটা লটারি। মানুষের সুখ-দুঃখ ভাগ্যের উপর নির্ভর করে।

—আমার মতো ভাগ্য কটা মেয়ের হয়? আমি অসুখী হইনি। তোমার মতো শিবতুল্য বিদ্বান স্বামী, সুন্দর স্বাস্থ্যবান ছেলেমেয়ে, অমন ঘর-বাড়ি, এত সুখ, এত ভালবাসা কজন স্ত্রী পায়? আমি বড়লোক হতে চাইনি। এমনি ভাবে সাজানো সংসার রেখে মা আর শাশুড়ীর মতো সিঁথিতে সিঁদুর নিয়ে যদি চলে যেতে পারি তো নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করব।

শিবানী আঁচলে চোখ মুছলেন। কতকটা সময় চুপ করে থাকার পর শিবনাথ বললেন, চল, একটু বেড়িয়ে আসি।

শিবনাথ ও শিবানী পাশাপাশি সামনের পায়ে-চলা পথের উপর দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেন।

॥ ছাব্বিশ ॥

ছেলেপুলেদের নিয়ে শিবনাথ টাটানগরে তাঁর ছাত্র সদানন্দবাবুর বাড়িতে উঠলেন। অনেক দিন পরে মাস্টারমশাইকে পেয়ে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। সদানন্দবাবু নিজেই বাজারে ছুটলেন। তিন-চার রকমের মাছ, মাংস আর এক গাদা কাঁচা আনাজে তিনখানা রিক্সা ভর্তি করে বাড়ি এলেন।

তাঁর স্ত্রী পারুলবালা স্বামীকে ভালোভাবেই চিনতেন। তিনি শিবানীকে বললেন, আপনার ছেলে আজ স্বয়ং বাজার গেছলেন। দেখবেন আসুন কি ইলাহী কাণ্ড ঘটেছে! লোকটির কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই। ওকে নিয়ে আমি সারাজীবন জলে পুড়ে মরছি। তারপর সদানন্দবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁ গা, আজ কি আমাদের যজ্ঞিবাড়ি?

তিনি আশ্চর্য হয়ে বললেন, কেন, এমন কি বেশী জিনিস এনেছি? এঁরা কোন দিন আসেন নি। তাই নিজে দেখে-শুনে বাজার করে এনেছি।

পারুল বললেন, বেশ করেছ। পাঁচ-ছজন লোক এসেছে, আর তুমি এক শ লোকের বাজার কোন্ আক্কেলে আনলে?

তাঁর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সদানন্দবাবু লজ্জায় বৈঠকখানায় তাঁর মাস্টার-মশাই-এর কাছে গেলেন।

পারুল শিবানীকে বললেন, এমন আপনভোলা মানুষ আর দেখিনি। লোকটি চিরকাল খোকা থেকে গেল।

শিবানী হেসে বললেন, সে তো তোমারি দোষ, বউ মা।

—কেন? আমি কি করলাম?

—এটা শুধু তোমার দোষ নয়, মা, সকল বাঙালী মেয়েরই দোষ। আমাদের ছেলেরা জন্ম অবধি ঘরেই থাকে, মায়ের স্নেহে লালিত পালিত হয়, বিয়ের পর স্ত্রী তাদের চালনা করে। চাকরি করা ছাড়া আমাদের পুরুষদের আর বাইরের কি কাজ আছে? তারা উদয়াস্ত টাকা উপায়ের ধান্দায় ছোটে। টাকা এনে আমাদের হাতে দেয়। আমরা গৃহের সর্বময় কর্ত্রী হয়ে উঠি। এজন্যে আমাদের পুরুষরা গৃহস্থালির কাজে আনাড়ী থেকে যায়।

—মাস্টারমশাইও কি তাই?

—শুধু তিনি কেন? আমাদের দেশের প্রায় সব পুরুষের অবস্থা তাই।

—তা না হয় হল। কিন্তু আপনার ছেলেটি তো অফিসের কাজ ছাড়া আর সকল বিষয়ে ঢিলে। কোথায় কি রাখে, কখন কি করে, তার কোন স্থিরতা নেই।

—অমন হয়েই থাকে। কি করবে বল? বেটাছেলের সাতখুন মাপ।

এমন সময় সদানন্দবাবু ফিরে এসে বললেন, কি, মায়ের কাছে আমার দোষ দেখানো হচ্ছে তো? ওটা মেয়েদের স্বভাব। তারা স্বামীদের দোষ দিয়ে নিজেরা সাধু সাজে।

শিবানী বললেন, সব মেয়ে অন্যের স্বামীকে ভালো বলে আর নিজেদের স্বামীর নিন্দে করে। মুখের নিন্দা গভীর ভালবাসার পরিচয়, কেননা পরের কাছে তারা স্বামীর প্রশংসায় শত-মুখ।

সদানন্দবাবু বললেন, রান্না-বান্নার সকল ব্যবস্থা হয়েছে তো? না, মায়ের কাছে আমার নামে লাগানো হচ্ছে?

পারুল বললেন, আদা ব্যাপারীর জাহাজের খবর কেন ?

পারুল ও শিবানী উঠে গেলেন। সদানন্দবাবু ছেলেদের সঙ্গে গল্প করতে গেলেন।

শিবনাথ সকালে টাটানগর দেখতে বেরিয়েছেন। ঢেউ-খেলানো সোজা সুন্দর রাস্তায় চলে অগণিত শ্রমিক ও অফিসের কর্মচারী। অসংখ্য মোটর, মোটর-সাইকেল, রিক্সা, দু-চারখানা ঘোড়ার গাড়ি এদিক-ওদিক ছুটাছুটি করছে। আকাশচুম্বী বিরাট চিমনিগুলি কৃষ্ণবর্ণ ধূম্র উদ্গিরণ করছে। আগুনের হল্কায় লাল হয়ে যায় নীল আকাশ বহুদূর পর্যন্ত। ভারতের শ্রেষ্ঠ বৃহত্তম লৌহ কারখানা। উঁচু-নিচু সুদীর্ঘ পিচ-ঢালা রাস্তার দুধারে কোম্পানির অসংখ্য বাংলো। কর্মচারীদের বাসস্থান। এক ছাঁচে তৈরী। বৈচিত্র্যহীন, বৈশিষ্ট্য বর্জিত, একঘেয়ে ক্লান্তিকর দৃশ্য। এখানকার সবকিছু কৃত্রিম, মাপজোক করা। কাঁকরে গাছ জন্মানোর মতো গজিয়ে উঠেছে একটা বিরাট শহর নিছক ব্যবসার তাগিদে। যন্ত্রে সব কাজ হয়। এখানে সকলই যান্ত্রিক, কৃত্রিম। মানুষ বুদ্ধিবলে যা সৃষ্টি করেছে, তার কাছে সে দাসখত লিখে দিয়েছে। এখানে যন্ত্র প্রধান, মানুষ গৌণ। যন্ত্র প্রভু, মানুষ ভৃত্য। অন্ধ-শক্তির কাছে সে নতি স্বীকার করেছে। শক্ত লোহা গলে জল হয়ে যাচ্ছে। সেই জল ছাঁচে ঢালা হয়ে বিরাট কড়ির আকার ধারণ করছে। জবা ফুলের মতো লাল কড়ি প্রয়োজন মতো খণ্ডিত হচ্ছে। ঢেউ-খেলানো টিনের পাত তৈরি হচ্ছে। তার উপর কলাই করা হয়ে যাচ্ছে। এইভাবে লক্ষ লক্ষ টন ইস্পাত বোঝাই গাড়ি দেশ-বিদেশে চালান যাচ্ছে। ধন্য সেই লোহার খনির আবিষ্কর্তা, যাঁর প্রসাদে এই জনশূন্য প্রান্তর জনবহুল নগরীতে রূপান্তরিত হয়েছে।

শিবনাথ বেড়াচ্ছেন একটা পার্কে। এমন সময় হঠাৎ একটি ভদ্রলোক তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন। আশ্চর্য হয়ে বললেন, এ কী, মাস্টার! তুমি এখানে ?

—পৃথিবীটা গোল প্রমাণ হয়ে গেল আজ।

—ব্যাপারটা কি ? বেড়াতে এসেছ নাকি ?

—পূজোর বন্ধে ঘাটশিলা এসেছিলাম। একবার ঘুরে দেখে গেলাম টাটা। এত নিকটে এসে টাটার লোহার কারখানা না দেখে গেলে লোকে বলবে কি ? আমি একা নই। ছেলেপুলেরা এসেছে আর গৃহিণীও আছেন।

—তাই নাকি? বেশ বেশ! উঠেছ কোথায়? কবে এলে? এখনও কি সিংহগড়ে আছ?

—উঠেছি আমার এক ছাত্রের বাসায়। কাল এসেছি। সিংহগড় থেকে বছর দশেক হল চলে এসেছি।

—বেশ নধর চেহারাটি তো দেখছি। বয়স কত হল?

—চল্লিশের উপর।

—কিন্তু একটি চুল তো পাকেনি এখনো।

—তোমার মাথায় তো একগাছি কালো চুল নেই। দাঁত বাঁধানো। এত বুড়ো হয়ে গেলে কেন? মোটা মাইনে। খাও ভালো। থাক ভালো। চিন্তা নেই। দুঃখ-কষ্ট নেই। তা সত্ত্বেও এমন হল কেন?

—না হওয়াটাই তো আশ্চর্যের কথা! যাক এখন ও-সব কথা। কাল সকালে আমার বাসায় নিশ্চয়ই যেও। সব বলব। বাসায় গাড়ি পাঠিয়ে দিচ্ছি। গিন্নীকে নিয়ে যেও। ভুলো না।

রমেশবাবু তাড়াতাড়ি চলে গেলেন জরুরী কাজে।

পরদিন সকালে রমেশবাবুর গাড়িতে শিবনাথ আর শিবানী তাঁর বাসায় গেলেন। শহরের এক প্রান্তে শান্ত পরিবেশে একটি প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে বিরাট বাড়ি। গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়াল। রমেশবাবুর বিধবা মেয়ে অনু তার মাসিমা শিবানীকে নিয়ে বাড়ির ভিতর গেল। শিবনাথ ও রমেশবাবু বৈঠকখানায় বসলেন। প্রাতরাশের সাজ-সরঞ্জাম উপস্থিত হল। খেতে খেতে শিবনাথ রমেশবাবুর কাহিনী শুনতে লাগলেন। পাঁচ বছর আগে স্ত্রী মারা গেছেন। বড় মেয়ে তিন বছর বিধবা হয়েছে। একটি ছেলে পাগল। তাকে রাঁচিতে রাখা হয়েছে। আর একটি ছেলে মোটর চাপা পড়ে মরেছে। টাকা কি হবে? ভোগ করার কেউ নেই। ঐ তো একটা বিধবা মেয়ে। তার কতটুকু প্রয়োজন? মোটা মাইনে আছে, গাড়ি আছে, বাড়ি আছে। ভোগের বস্তু আছে। ভোগ করবে কে? বলতে বলতে রমেশবাবুর চোখ-দুটো জলে ভরে গেল। এই তো জীবন! সুখ কোথায়? শান্তি কোথায়? আনন্দ কোথায়? তারপর বলতে লাগলেন—

It is a tale told by an idiot,
Full of sound and fury,
Signifying nothing.

শিবনাথের কাছে যেন তাঁর হৃদয়ের রুদ্ধ দরজা খুলে গেল। তিনি বললেন, বাইরে দেখলে মনে হয় আছি ভালো—এদিকে কিন্তু শালুক খেয়ে দাঁত কালো। আজ অনেক দিন পরে তোমাকে পেয়েছি। তোমাকে দেখেই মনে পড়ল সেই সিংহগড়ের সুখের জীবন, সেই ছোট ডাক্তারবাবুকে, সেই আমাদের সান্ধ্য সম্মিলন, গল্প-গুজব, নানা বিষয়ের আলোচনা—সেখানকার জীবনের তিন বৎসরের মধুর স্মৃতি আমি কোনদিন ভুলতে পারব না! তখন সেটেলমেণ্টের ডেপুটি ছিলাম, মাইনে মাত্র দু শ টাকা—কিন্তু জীবনে সুখ ছিল, শান্তি ছিল, পরিপূর্ণ সংসার ছিল।

শিবনাথ বলল, সত্যিই তোমার অবস্থা দেখে আর দুঃখের কথা শুনে আমার বড় কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু what cannot be cured must be endured.

রমেশবাবু বলতে লাগলেন, জানো তো বীরভূমে আমাদের বাড়ি। বড়দা ছিলেন তোমার মতো একজন নামজাদা হেডমাস্টার। তিনি এই সেদিন মারা গেছেন। মনে আশা ছিল, অবসর গ্রহণ করার পর দেশে ফিরে যাব। অজয়ের তীরে একটি ছোট নীড় রচনা করে শেষ জীবনটা শান্তিতে কাটিয়ে দেব। সে আশা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে।

তারপর নিজেকে সামলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, টাটা কেমন লাগল? একটা দেখবার জিনিস বটে! কি বল? কত লোকের অন্নসংস্থান হয়েছে।

—তা তো হয়েছে, কিন্তু দেশে যত কল-কারখানা বাড়ছে তত দুঃখ, অর্থ-সমস্যা জীবনকে দুর্বহ করে তুলেছে।

—কিন্তু তাতে কি দেশের অগ্রগতি দ্রুত হচ্ছে না? কলের সাহায্যে উৎপাদন বাড়ছে না?

—বাড়ছে সত্যি কিন্তু কার ভোগের জন্যে? একদিকে বেশী উৎপন্ন হচ্ছে অন্যদিকে বেকারের সংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। এখন বেকার-সমস্যা এই কল-কারখানার যুগে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জনকয়েক মালিক, ডিরেক্টার, ম্যানেজার বিপুল সম্পদের অধিকারী ও অংশীদার হচ্ছে, কিন্তু যাদের সাহায্যে কল-কারখানা চলছে, বিপুল সম্পদ সৃষ্টি হচ্ছে তারা কত সুখে আছে, তা একবার কুলিবস্তিগুলির দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায়।

—কিন্তু পরিশ্রমী মানুষের দুঃখ হয় না।

—দুঃখ হয় না, তা নয়। স্বামী-স্ত্রী গতরে খেটে যা উপায় করে, তাতে

তাদের কোন রকমে সংসার চলে ; কিন্তু অসুখে পড়লে বা কেউ মারা গেলে, দুঃখের সীমা থাকে না।

—আজকাল তো শ্রমিকরা ধর্মঘট করছে। পারিশ্রমিক বাড়িয়ে নিচ্ছে।

—ধর্মঘটে বিশেষ ফল হয় না। মালিকরা কল বন্ধ করে দেয়। কুলি-লাইন থেকে শ্রমিকদের তাড়িয়ে দেয়, তাদের দুর্দশা আরও বাড়ে। ছেলে-মেয়ে নিয়ে কোথায় যাবে ভেবে ধর্মঘট মিটিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। পারিশ্রমিক বেশী দিতে হয় বলে মালিকরা জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেয়। ফলে সাধারণের উপর চাপ পড়ে। বেশী দাম দিয়ে শ্রমিকদের প্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে হয়। সুতরাং বেশী মজুরি পেলেও তাদের অবস্থার উন্নতি হয় না।

—তা ঠিক। রাশিয়ায় নাকি কল-কারখানাকে সাধারণের সম্পত্তি করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথও বলেছেন, এই ব্যবস্থায় সেখানে নাকি ফল ভালোই হয়েছে। আমাদের দেশ স্বাধীন হলে তাই হবে।

—হবে কিনা জানি না। আমার মনে হয়, কল-কারখানা বাড়ুক। উৎপাদন বৃদ্ধি হোক ; কিন্তু যতদিন কারখানার মালিকরা হীন স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত হয়ে নিজেদের লাভের অঙ্কের দিকে তাকিয়ে থাকবে, ততদিন কল-কারখানা কল্যাণকর হবে না। ধন-বিভাগের বৈষম্য থাকলে ধনীর ঐশ্বর্য আর দরিদ্রের দারিদ্র্য বেড়ে চলবে। এরই নাম শোষক ও শোষিত সমাজ।

—দেখছি তুমি একেবারে সাম্যবাদী হয়ে গিয়েছ, মাস্টার।

—আজকাল বুদ্ধিজীবী মাত্রই সাম্যবাদী না হয়ে পারে না। কিন্তু যে সাম্যবাদ শুধু উৎপাদন ও বণ্টনের সমতা নিয়ে ব্যস্ত, যে সাম্যবাদ শ্রেয় বা শুভকে ত্যাগ করে প্রেয়কে পরমার্থ ভাবে, আমি তেমন সাম্যবাদের কথা বলছি না।

—তবে কি ?

—বিজ্ঞান-সাধনা বলে এক দিকে জৈব ক্ষুধা মেটাতে হবে, অপর দিকে আত্মিক বল এবং নৈতিক শুচিতা রক্ষা করার জন্যে তপস্যা করতে হবে ; অর্থাৎ জৈবতা আর দেবত্বের মধ্যে সেতুবন্ধন না হলে জীবন কল্যাণকর হয় না।

—আচ্ছা, যাক ও-সব বড় বড় কথা। এখন বল, দেশে ফিরছ কবে ?

—আগামী কাল ঘাটশিলা যাব। কালীপূজার পর বাড়ি ফিরব।

কলকাতা যাওয়া-আসার পথে কুসুমপুরে আসার প্রতিশ্রুতি নিয়ে শিবনাথ রমেশবাবুর কাছে বিদায় নিয়ে গাড়িতে উঠলেন। অনু তার মাসিমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে গেল।

॥ সাতাশ ॥

ঘাটশিলা থেকে ফিরে আসার পর এই ক্ষুদ্র পরিবারের জীবনধারাটি তার পূর্বের খাতে প্রবাহিত হল। বিনয় ওকালতি আরম্ভ করেছে জেলা কোর্টে। একখানি ছোট বাড়ি ভাড়া নিয়েছে। জুনিয়র উকিল। একজন সিনিয়রের কাছে কাজকর্ম শেখে। সামান্য কিছু উপার্জন করে। তাতে কুলোয় না। কেদারবাবু টাকাকড়ি দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন। রাত্রে সে একটি টিউশনি করে। লাইফ ইনসিউরেন্সের দালালি থেকে দু-পাঁচ টাকা আয় হয়। এইভাবে পাঁচ ফুলে সাজি ভর্তি করে খরচ চালায়।

কেদারবাবুর বাড়িতে ঘটকের আনাগোনা চলেছে। দুদিন ছাড়া কন্যাদায়গ্রস্ত পিতাদের ভিড় হচ্ছে। কেউ বা অর্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যা উৎসর্গ করার জন্যে উমেদারি করছে। কেউ বা হাজার হাজার টাকা পণ ও হাজার হাজার টাকার যৌতুক দেবার লোভ দেখাচ্ছে। কেউ বা বাড়ি ও গাড়ির সঙ্গে তিলোত্তমা সম্প্রদান করতে প্রস্তুত হয়েছে। মুখুজ্জে-গিন্নী হাজার হোক ছেলের মা। সুন্দরী বউ, গা-ভর্তি গয়না, ঘর-ভর্তি যৌতুক, বাক্স-ভর্তি টাকা, কোন ছেলের মা এমন লোভ সম্বরণ করতে পারে? তিনি বিনয়ের দুই বড় ভাইকে বলেন—ছাখ্ না রে তোরা বিনয়কে বোঝাতে পারিস কিনা। কেদারবাবুকে বলেন—ওগো, তুমি একটু বল না। বিনয় তোমার কথা শুনবে। কেদারবাবু ধীর-স্থির থাকেন। বলেন, এ তল্লাটের সকল লোক জানে শিবনাথবাবুর মেয়ের সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে হয়েই গেছে। এতদূর এগিয়ে এখন ফেরা যায় না। লোকে কি বলবে? সকলে বলবে, লোকটা পয়সা-পিশাচ। কথার ঠিক নেই। গিন্নী কানের কাছে দিনরাত্রি ঘ্যানর-ঘ্যানর করেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন কেদারবাবুর অফিসের অ্যাসিস্টেণ্ট বিরাজবাবু। কেদারবাবু তাকে চাকরিতে ঢুকিয়েছিলেন বলে সে তাঁর গিন্নীর মন যোগাত। তাঁকে বৌদি বলে ডাকত। সে জানত কেদারবাবু

কৌলিন্য-মর্যাদা রক্ষা করে চলেন। সেকেণ্ড ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যা হলেও ভাগ্য ও বুদ্ধিবলে তিনি অফিসের বড়বাবু হয়েছেন। ষোল টাকায় ঢুকে এখন পাঁচ শ টাকা বেতন পান।

বিরাজবাবু বললেন, কোথাকার কে আমড়া ভাতে দে! অজ্ঞাত-কুলশীল। ভিন জেলায় বাড়ি। ও-দেশে কুলীন বামুন আছে নাকি? লেখাপড়া শিখলে কৈবর্ত কী বামুন হবে, না, কৈবর্তর বামুন কুলীন বামুন হবে? অত্র পয়সা কোথায় যে, অমন বাড়িতে মেয়ে দেবে? করে তো মাস্টারি! ক'টাকাই বা মাইনে পায়। বামন হয়ে চাঁদে হাত দিতে এসেছে!

কেদারবাবুকে শুনিয়ে এই সকল কথা বলার পর তিনি মুখুজ্জে-গিন্নীকে লক্ষ্য করে বললেন, আচ্ছা বৌদি, সেদিন তো বিনয় এসেছিল, কি বললে সে?

—বলবে আর কি? সেই এক কথা। তার ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা। ওখানেই বিয়ে করবে। সে বলে, ওখানে যদি বিয়ে দেওয়ার মত না থাকে, তবে ভদ্রলোককে কথা দিয়েছিলে কেন? বাবা রাজী ছিলেন, আর মত দিয়েছিলেন। তিনি যদি কথা না রাখেন, আমি তাঁর কথা রাখব।

বিরাজবাবু বললেন, আচ্ছা, দেখা যাবে কেমন করে সে ওখানে বিয়ে করে। ছেলে একেবারে রামচন্দ্র আর কি! পিতৃসত্য পালন করবেন!

কেদারবাবু বললেন, ঐ কুলাঙ্গারকে আমার বিষয়-সম্পত্তির এক টুকরোও দেব না। ওকে ত্যজ্যপুত্র করব।

গিন্নী বললেন, তা সে জানে। আমি তাকে ঐ কথা বলতে সে বলেছিল, জানব আমার বাবার সম্পত্তি নেই। সকলের কি বাপের টাকা আর সম্পত্তি আছে? নিজের পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াব। তাঁর আশীর্বাদ থাকলে অমন সম্পত্তি আমি করতে পারব।

শুনে বিরাজ গম্ভীর হয়ে বলল, ওখানে বিয়ে হতে দেব না, দেব না, দেব না। বউদি আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। এমন জাল পাতব যে, বাছাধন তাতে জড়িয়ে ধরা দেবেন! আজ আমি আসি। আমি ওদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্যে ঘাটিতে ঘাটিতে লোক রেখেছি। বিয়ে পণ্ড করে দেব জেনে রাখুন।

এই বলে বিরাজবাবু সেদিন বিদায় নিলেন এবং তলে তলে বিয়ে পণ্ড করে দেবার ফন্দি আঁটতে লাগলেন।

শিবনাথ বিনয়কে বোঝাতে চেষ্টা করলেন। সে বললে, তাহলে আপনি

আমার বাবার পাকা বাড়ি, ব্যাঙ্কের টাকা, তালুক-মুলুক দেখে আমার সঙ্গে আপনার মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, আমাকে ভালবেসে নয়, নিজের মেয়ের সুখের জন্যে? বাবা আমাকে ত্যজ্যপুত্র করবেন শুনে এখন পিছিয়ে যাচ্ছেন?

লজ্জিত হয়ে শিবনাথ বললেন, না না, তা নয়। তোমার ঐকান্তিকতা আমাকে অভিভূত করেছে। আমি তোমার কাছে পরাজয় স্বীকার করলাম। আমি কল্যাণীকে তোমার হাতে তুলে দেব। তারপর তোমাদের ভাগ্যে যা আছে তা ঘটুক।

॥ আটাশ ॥

সে বছর আর্ধোদয় যোগে গঙ্গাস্নান করবার জন্যে সৌদামিনী গাঁয়ের গঙ্গাস্নানার্থিনী মেয়েদের সঙ্গে কলকাতা গিয়েছিলেন। ফিরবার পথে তিনি তাদের বিদায় দিয়ে বড় বউয়ের সঙ্গে দেখা করতে কুসুমপুরের বাড়িতে এলেন। বিনয়ের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ের কথা শুনে তিনি শিবানীকে বললেন, ইচ্ছে ছিল এই ক'টা দিন থেকে- বিয়ের পরে বাড়ি যাব। কিন্তু থাকবার তো উপায় নেই। খামারে দুটি ধানের গাদা বসেছে। ধান ঝাড়া না হলে নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। বৃষ্টি হলে ধান নষ্ট হয়ে যাবে। ছেলেগুলো সারা বছর খাবে কি? ধান ঝাড়িয়ে ধান মেপে গোলায় তুলে দিয়ে চার-পাঁচ দিনের ভিতর এসে পড়ব।

সৌদামিনীর চলে যাওয়ার দুদিন পরে শিবনাথ শুনলেন যে, তাঁর বড়দিদি পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। কুসুমপুর থেকে যাওয়ার সময় গাড়িতে তাঁর মেজবোনের ছেলে নবকুমারের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়। তার একান্ত অনুরোধে তিনি তাদের বাড়িতে যান। সেখানে গিয়েই তিনি অসুখে পড়েন। সেই দেশে কোন ভালো ডাক্তার ছিল না। এক কম্পাউণ্ডারের কম্পাউণ্ডার তাঁর চিকিৎসা করে। সাত মাইল দূর থেকে একজন এম. বি. পাস ডাক্তারকে 'কল' দেওয়া হয়। ডাক্তার বাড়িতে পৌঁছুতে না পৌঁছুতেই সৌদামিনীর শেষ নিশ্বাস পড়ে। এক ফোঁটা ওষুধ না দিয়েও বড় ডাক্তার ষোল টাকা ফি ও পালকি ভাড়া পাঁচ টাকা নিয়ে চলে গেলেন। এইভাবে বাড়ি থেকে দূরে

ডাক্তার-বৈদ্যশূন্য অজ পাড়াগাঁয়ে অসহায় অবস্থায় এই মহীয়সী রমণীর জীবনাবসান ঘটে। নবকুমার মাসিমার সেবা-শুশ্রূষা ও যত্নের কোন ত্রুটি করেনি। দিন-রাত্রি সে তাঁকে জেগে বসেছিল। রুগীর বিছানায় জেগে বসে থাকলেই রোগ সারে না, সময়ে ওষুধ দেওয়া চাই। মরার একটু আগে তিনি বলেছিলেন, কে রে, শিবু? এসেছিস্ ভাই? আয়, আমার কাছে বোস। পরক্ষণেই সব শেষ হয়ে যায়!

সৌদামিনীর মৃত্যু-সংবাদ বিনা মেঘে অশনি-পাতের মতো সকলকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল! ছেলেবেলার কত কথা, কত ঘটনা, বিশেষ ভাবে মায়ের মতো বড়দিদির স্নেহের কথা স্মরণ করে শিবনাথ মুষড়ে পড়লেন। ছেলে-মেয়েদের স্নেহের বড় পিসিমা, শিবানীর আদরের বড় ঠাকুরঝি, শিবনাথের প্রাণের বড়দিদি মৃত্যুর অন্ধকারে কোথায় বিলীন হয়ে গেলেন! আমাদের সাধারণ জীবনের কণ্টকাকীর্ণ উদ্যানে সৌদামিনীর মতো কত ফুল ফোটে, দিন কয়েকের জন্যে সুরভি বিতরণ করে, তারপর কালের তপ্ত নিশ্বাসে শুকিয়ে ঝরে পড়ে, পৃথিবীর কেউ কি তার কোন খোঁজ খবর রাখে?

সৌদামিনীর আকস্মিক মৃত্যুর আঘাতে কুসুমপুরের ক্ষুদ্র পরিবারটি এমনই মোহ্যমান হয়ে পড়েছিল যে, কল্যাণীর বিয়ের কথা কিছুকাল তাদের মনে স্থান পায়নি। কিন্তু সময়ের কোমল করের স্পর্শে দুঃখ-শোকের তীব্রতা ক্রমে হ্রাস হয়ে যায়। কালের শীতল ভৈষজ প্রলেপে ক্ষত শুকিয়ে যায় সত্যি, কিন্তু মনের উপর যে দাগ থাকে, তা কোনদিন মুছে যায় না। বিশ্ব-জগতে অনন্ত কাল ধরে জীবনের যে খরস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, তার উপর ভেসে ওঠে কত প্রাণী কত মানুষ বুদ্বুদের মতো; দুঃখ-শোকের লক্ষ ধারা বয়ে চলে কোথায় কে জানে? এর আদি কোথায়, অন্ত কোথায় কেউ জানে না, মধ্যেই তো হাসি-কান্না। যে বস্তু আদ্যন্তে নেই বর্তমানেও তা নেই, এই ভেবে ধীর মানুষ সুখ-দুঃখে বিচলিত হন না।

তিন মাস কেটে গেল। বিবাহ-যজ্ঞ পণ্ড করে দেওয়ার জন্যে বিরাজ তোড়জোড় করছে। আন্দোলনের যুগ। পুলিস তো ছুতো খুঁজছে। শিবনাথবাবুর ছেলেরা মদের দোকানে পিকেটিং করছে বলে একটা গণ্ডগোল বাধিয়ে দিতে কতক্ষণ। এই ভেবে শিবনাথ কলকাতার কোন অজ্ঞাত স্থানে বিবাহ দিতে মনস্থ করেছেন শুনে শিবানী আপত্তি করলেন। বললেন, আমার নতুন বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দেব ভেবেছিলাম। পাঁচজন বন্ধুবান্ধব নিয়ে

আমোদ-আহ্লাদ করব আশা করেছিলাম। আমি তাদের ছেলেমেয়ের বিয়েতে গিয়েছি, খেয়েছি, আমোদ-আহ্লাদ করেছি। এমন চোরের মতো লুকিয়ে মেয়ের বিয়ে দিতে পারব না। আমার একটি মেয়ে। এই আমার প্রথম, এই আমার শেষ। না হয় এখন বিয়ে বন্ধ রাখ।

শিবনাথ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, জানবে, শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি। সম্বন্ধ ঠিক করে ফেলে রাখতে নেই। শুভস্য শীঘ্রং। নইলে সব ভেস্তে যাবে। বিয়ে বন্ধ করা চলবে না। তবে নিরাপদ স্থানে ব্যবস্থা করতে হবে। শিবনাথের মুখের উপর তিনি কোনদিন জবাব দেন নি। পুরুষ মানুষ মেয়েদের চেয়ে ভালো বোঝে, এই ধারণা, এই বিশ্বাস শিবানীর মনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তিনি স্বামীর কথায় ও কাজে বিশ্বাস করতেন। তাঁর পতি-সর্বস্ব আত্ম-নিবেদন শিবনাথের পারিবারিক জীবনকে মধুময় ও শান্তিময় করে রেখেছিল।

শিবনাথ কলকাতায় বাড়ি খুঁজতে বেরিয়েছেন। বিডন স্কোয়ারের মোড়ে চিৎপুর রোডের উপর একটি লোকের সঙ্গে দেখা হল। তার পরনে আধ-ময়লা তেলচিটে কাপড়, সস্তা খদ্দরের লালচে রঙের জামা, এক হাতে ভাঙ্গা একটা ছাতা, আর এক হাতে দুটো শিশি। প্রথমে শিবনাথ তাকে চিনতে পারেন নি। লোকটি প্রণাম করে আত্ম-পরিচয় দিল। বলল, দাদা, আমাকে চিনতে পারছেন না? আমি সুবোধ।

না চেনারই কথা। শিবনাথ আশ্চর্য হয়ে বললেন, তুমি সুবোধ? এমন চেহারা হয়ে গেছে তোমার! কোথায় গেল তোমার সেই গোলগাল দেহ, সুন্দর রঙ, শৌখিন পোষাক-পরিচ্ছদ?

—আর দাদা, লক্ষ্মীছাড়ার আবার চেহারা, রঙ আর পোষাক?

—এখন ঘুসড়ীর চটকলে কাজ করছ তো? কলকাতায় থাক? হাতে কি? ওষুধের শিশি? কার অসুখ?

—অসুখ কারোর নয়। এ দুটো সর্ষে তেলের শিশি। তেলের গদিতে কাজ করি। তেলের নমুনা দেখিয়ে খদ্দের যোগাড় করি। চটকলের কাজ বহুকাল পূর্বে শেষ হয়ে গেছে। এখন কলকাতায় আছি।

—ঘুসড়ীর কলে ভালো চাকরি করতে। বেশ মোটা মাইনে না হলেও উপরি আয় বেশ ছিল শুনেছি। চাকরি ছাড়লে কেন?

—সাধে কি ছেড়েছি? ভাগ্য ছাড়িয়ে দেয় যে!

—মাইনে ছিল মাত্র পনরো টাকা। হাজিরাবাবু ছিলাম। দু হাতে পয়সা লুঠ করছি। মাসে পাঁচ-সাত শ টাকা ঘুষ পেতাম। চাকরি নিজে ছাড়িনি। ঘুষ ধরা পড়ে গেল। প্রাণের দায়ে ঘুসড়ী ছেড়ে কলকাতার একটা বস্তি বাড়িতে স্বামী-স্ত্রী গা ঢাকা দিয়ে থাকলাম। অবিশ্যি এখনও সেখানেই আছি। তখন হাতে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা ছিল। ধর-পাকড়ের হিড়িকটা কেটে গেলে নতুন বাজারে পেট্রোলের চালানী কারবার খুলে বসলাম। জার্মানি থেকে পেট্রোল আনাতাম। টাকায় টাকা লাভ। দশ বছরের মধ্যে বেশ ফেঁপে উঠলাম। দেশে পঞ্চাশ বিঘা জমি, বাড়ি, পুকুর, বাগান, আর কলকাতায় একখানা বাড়ি, মোটর গাড়ি, স্ত্রীর গহনা, আসবাব-পত্র; খাট, কোচ, কেদারা, ড্রেসিং টেবিল—আরও কত কি! একেবারে হৈ হৈ রৈ রৈ চলতে লাগল।

—তারপর?

—তারপর চুরির পয়সার যা হবার তাই হল। প্রথম মহাযুদ্ধে এক লাখ টাকার তেল-ভর্তি জাহাজ মাইনে লেগে ডুবে গেল। দেনার দায়ে সব বিকিয়ে গেল। ছিলাম আমীর, এক দিনে ফকীর হয়ে গেলাম।

—কলকাতার বাড়িখানা আছে তো?

—থাকলে কি আবার বস্তি-বাড়িতে থাকি? আবার সেই কারবার ফেল হয়ে যাবার পর দুশ্চিন্তায় রক্তের চাপ বেড়ে গেল। স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে চিকিৎসা হল। বায়ু পরিবর্তন হল, কিন্তু পূর্বের স্বাস্থ্য ফিরে পেলাম না। এখন একেবারে রিক্ত, কপর্দক-শূন্য। রোজ আনি রোজ খাই।

এখন সর্ষে তেলের নমুনা নিয়ে ঘুরে বেড়াই। মাসে তিরিশ-চল্লিশ টাকা কমিশন পাই। বস্তি-বাড়ির একখানা ঘরে থাকি। দশ টাকা ভাড়া। আর বিশ-পঁচিশ টাকায় স্বামী-স্ত্রীর খোরাকি চলে।

—এত সব ব্যাপার তো জানতাম না।

—আগে আমি লোকের কাছে বলতাম, দাদা এম. এ. পাস করে করলে কি? এখন দেখছি ধর্মপথে থেকে এক টাকা উপায় করলে তার দাম দশ টাকা। কত টাকাই না পেলাম, কিন্তু গেল কোথায়?

তারপর শিবনাথের উদ্দেশ্যের কথা শুনে সুবোধ বললে, লুকিয়ে বিয়ে দেওয়ার পক্ষে এই বাড়িই ভালো। কাক চিল পর্যন্ত টের পাবে না।

নিরাপদে কাজ উদ্ধার হয়ে যাবে। চলুন না আমার বাসায়। বেলা হয়ে গেছে। এ বেলা থেকে সব দেখে-শুনে ঠিকঠাক করে নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে যাবেন।

শিবনাথ রাজী হলেন। সুবোধের সঙ্গে বাড়ি দেখতে গেলেন।

॥ উনত্রিশ ॥

কলকাতার বটতলা অঞ্চলের পুরানো দোতলা বাড়ি। জগৎ শেঠের আমলের। সুবোধ বলেছিল, এখনও নাকি শেঠের বংশধররা এর মালিক। বড় রাস্তার ফুটপাথের ধারে এর প্রবেশ পথ। ডাইনে বাঁয়ে পট-আঁকার, ফটো-তোলার দোকান। সামনে বড় বড় দু-তিনখানি মেয়ের রঙীন ছবি টাঙ্গানো দো-মহলা দোতলা বাড়ি। প্রথম মহলের নিচে পূজার দালান। সামনে উঠন। পিছনে দ্বিতীয় প্রস্থে যাওয়ার গলি নোংরা, অন্ধকার। দিন-দুপুরে কেরোসিনের ডিবা জ্বলে। নইলে দেওয়ালে মাথা ঠুকে যায়। গলি দিয়ে ঢুকলে দেখা যায় উঠনে প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা। কানায় কানায় জলে ভর্তি। টুক্‌রো কাগজ, পায়রার পালক, ছেঁড়া শালপাতা, ন্যাকড়া জলের উপর ভাসছে। শেওলা-পড়া উঠন, রোদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। কোন পুরুষ কাপড়ে সাবান দিচ্ছে। কেউ গায়ে ঘটি ঘটি জল ঢেলে স্নান করছে। কোন স্ত্রীলোক বাসন মাজছে। পাশের সরু রাস্তা দিয়ে কেউ বা পায়খানায় ঢুকছে। এখানে স্ত্রী-পুরুষের ভেদাভেদ নেই। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি যেমন সংকীর্ণ, তেমনি অন্ধকার আর অপরিষ্কার। দুধারের দেওয়াল পানের পিচে লালে লাল। শিবনাথকে নিয়ে সুবোধ দোতলায় উঠল। চারদিকে বড় থামওয়ালা চওড়া বারান্দা। পঙ্খের কাজ করা। মেঝের উপর ছোট বড় গর্ত। বারান্দার পাশে আট-দশখানি ঘর। ঘরগুলি নেহাত ছোট নয়। প্রত্যেক ঘরে এক একটি গৃহস্থ পরিবারের বাস। স্ত্রী পুত্র কন্যা কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে দু-তিনটে বিছানায় গাদাগাদি ঠাসাঠাসি শোয়। শিবনাথ উঁকি মেরে দেখলেন, কোন কোন ঘরের দেওয়ালে সস্তা জাপানী ঘড়ি। দেওয়ালে ছোট আলনায় কোঁচানো ময়লা, আধময়লা ছোট বড় জামা ধুতি শাড়ি। কোন ঘরে তক্তাপোশের নিচে অ্যালুমিনিয়াম ও কলাই-করা কম দামী বাসন-

কোসন, চাল ডাল নুন তেল মশলার ঠোঙ্গা, শিশি বোতল, টিনের ডিবা এলো-মেলো ছড়ানো। তোলা উনুনের ধোঁয়ার বারান্দা ঝুলে কালো, ঘর কত কাল চুনকাম করা হয়নি। দেওয়ালের রঙ হলদে।

শিবনাথ শুনলেন, এই সব ঘরে বাস করে হরেক রকমের, নানা বৃত্তির, বিভিন্ন প্রকৃতির লোক। এদের ভিতর অনেকে মুদীখানায়, কাপড়ের দোকানে, তেলের কলে কাজ করে। কারোর মনিহারী দোকান, কাটা কাপড়ের স্টল। কেউ সাবান তেল চানাচুর ফিরি করে অলিতে-গলিতে। কেউ বা ফটো তোলে, আর দু-চার জন কর্পোরেশন, ও সওদাগরী অফিসে বিল আদায়কারীর কাজ করে। দিনের বেলা এদের অনেককে দেখা যায় না। কখন কাজে বেরোয় জানা যায় না। তবে সন্ধ্যের পর বাসায় আসে, খায় আর ঘুমোয়।

চার-পাঁচটি পরিবারের এক একটি আধবুড়ী ঝি আছে। তারা সকাল ও সন্ধ্যায় আসে, উনুনের ছাই তোলে, বারান্দা ঝাঁট দেয়, বাসন মাজে, পরস্পর ঝগড়া করে, ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলে চলে যায়।

শিবনাথ দেখলেন, মেয়েরা বেশ স্বাধীনভাবে আছে। নিচে ও উপরে একটি সাধারণ শৌচাগার ব্যবহার করছে। এক চৌবাচ্চার জলে স্নান করছে। গামছা পরে অর্ধ-উলঙ্গ অবস্থায় বালতি বালতি জল তুলছে।

এরা শহরের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। এরা বাস করে একটু উঁচু ধরনের বস্তিতে। এদের নিজেদের গৃহ নেই, সমাজ নেই। এরা শহরের আগাছা-পরগাছা। এরা নয় শহরের, নয় গ্রামের। এদের না আছে নৈতিক জীবন, না আছে সামাজিক জীবন। তারপর একটু পরে শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, এদের কি গ্রামে বাড়ি নেই? এত কষ্ট করে কলকাতায় থাকে কেন?

সুবোধ বলল, দেশে হয়তো কারোর একটা কুঁড়ে আছে। অধিকাংশের জমি-জায়গা নেই। খাবে কি? এখানে যা হোক্ একটা কিছু করে দু পয়সা রোজগার করে, আর সংসার চালায়। এদের ভিতর দু-একজনের অবস্থা ভালো, আলাদা বাড়ি ভাড়া করে থাকতে পারে। তবে এইভাবে থাকাই অভ্যেস হয়ে গেছে। এইভাবে থাকতে ভালবাসে। আঁশ চুপড়ি না হলে মেছুনীর ঘুম হয় কি?

—তা বটে। তুমি এদের মধ্যে থাক কেন?

—কপালের দোষে! এত সস্তায় আর কোথায় ঘর পাব?

কথাটা ঘুরিয়ে নিয়ে শিবনাথ বললেন, গোপন বিয়ের পক্ষে এই বাড়িটি ভালো, কিন্তু অন্ততঃ তিনখানা ঘর তো চাই। তোমার তো মাত্র একখানি ঘর।

সুবোধ বললে, আমার পাশের একখানা ঘর খালি আছে। আর এক ভদ্রলোক দিন কয়েকের জন্যে তাঁর ঘরখানা ছেড়ে দেবেন। তেতলার চিলে ছাদের ঘরখানা পড়ে আছে। এইখানেই বিয়ে হোক। আপনাকে কোন কষ্ট পেতে হবে না। পয়সা খরচ করলে কলকাতায় বিয়ে দেওয়ার মতো সুখ নেই। কলকাতায় বাঘের দুধ কেনা যায়। পাড়াগাঁয়ের মতো ভুগতে হয় না। সেখানেই বিয়ে হবে স্থির করে সেদিন বিদায় নিয়ে শিবনাথ চলে গেলেন।

দিন কয়েক পরে নির্দিষ্ট দিনে নির্বিঘ্নে কল্যাণীর বিয়ে হয়ে গেল। বরযাত্রী কেউ আসে নি। বিনয়ের সঙ্গে ছিল তার দুজন উকিল বন্ধু। কন্যাপক্ষের মধ্যে ছিল পঁচিশ-তিরিশ জন কলকাতাবাসী বন্ধু, আর ছিল বস্তি-বাড়ির চল্লিশ-পঞ্চাশ জন মেয়ে-পুরুষ। শত চেষ্টা সত্ত্বেও বিরাজ জানতে পারে নি কলকাতার কোন্ অঞ্চলে কোন্ বাড়িতে বিয়ে হচ্ছে। পরে শোনা গেল, বিয়ের তিন দিন পরে বিনয়ের বিয়ের সংবাদ পেয়ে তার মা এমন গলা ফাটিয়ে মরা-কান্না জুড়ে দিয়েছিল যে, বিশ-পঁচিশ জন পাড়া-পড়শী ছুটে এসেছিল। বিয়ের কান্না বুঝে তারা গা টেপাটেপি হাসাহাসি করে চলে গিয়েছিল।

কুশণ্ডিকা শেষ করে বর-কনে বাসায় গেল। আগে থেকে দুর্গা ও গোপাল সেখানে গিয়ে বর-কনের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করে রেখেছিল।

সেদিন রাত্রি দুটোর সময় তেতলার ছাদের উপর একখানা মাদুরে শিবানী শুয়ে আছেন। শিবনাথের চোখে ঘুম ছিল না। তিনি এদিক-ওদিক পায়চারি করছিলেন। কি জানি কেন চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছিল। তাঁর মনে পড়েছিল মেয়েকে বিদায় দেওয়ার সময় রামচরণবাবুর চোখের জল, তাঁর বাবার হাত ধরে আকুল ক্রন্দন। শিবানীর মনোবল ভেঙ্গে যায় নি। তিনি বলেছিলেন, কোন বাপ-মা মেয়েকে ঘরে পুষে রাখতে চায় না, রাখা উচিত নয়। মেয়ে সুপাত্রে পড়বে, স্বামীর ঘর করবে, ছেলেপুলের মা হবে, সুখে-দুঃখে হাসিমুখে সংসার করবে। সকল সাধারণ গৃহস্থ মা-বাপের এই কামনা। ভাগ্য ভালো হলে মাটি মুঠো ধরলে সোনা মুঠো হয়। সুখ-দুঃখ পূর্বজন্মের কর্মফল। বিধাতা কপালে যা লিখেছেন, তা কেউ খণ্ডাতে পারে না;

টাকাকড়ি জীবনের সব নয়। শাক-ভাত খেয়ে স্বামী নিয়ে সুখ-শান্তিতে ঘরকন্না করতে পারলেই মেয়েদের জীবন সার্থক হয়। ছোট ঠাকুরঝির টাকাকড়ি ছিল, ঘর-সংসার ছিল, কিন্তু তাঁকে তো সারা জীবন বাপের বাড়িতে কাটাতে হচ্ছে। আমার খুকী সুখী হোক, এই আমি চাই। শিবানীর কথা শুনে শিবনাথ চুপ করে রইলেন।

বিয়ের কয়েক দিন পরে ধুলো পায়ে বিনয় কল্যাণীকে নিয়ে কুসুমপুরের বাড়িতে রেখে বাসায় ফিরে গেছে। দশ-পনরো দিন বিনয় আসেনি; কোন সংবাদও দেয়নি দেখে শিবানী অস্বস্তি বোধ করছিলেন। শিবনাথকে গুটিকয়েক কথা জিজ্ঞাসা করবার ফুরসত পান নি। সকালে তিনি যতটুকু সময় বাড়িতে থাকেন, তখন তিনি লাইব্রেরীতে হয় লেখায়, না হয় পড়ায় এত মশগুল থাকেন যে, শিবানী ঘর-সংসারের কোন কথা নিয়ে তাঁকে বিরক্ত করতে সাহস পান না। স্কুলের কাজকর্মের পর সন্ধ্যার আড্ডা থেকে ফিরে আসতে বেশ একটু রাত্রি হয়ে যায়। একদিন খাওয়া-দাওয়া সেরে গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে বিছানার উপর অর্ধশায়িত অবস্থায় কি যেন একখানা বই পড়ছেন, এমন সময় শিবানী এসে বললেন, তুমি তো বেশ নিশ্চিন্ত আছ! ছেলেটা যে পনরো-কুড়ি দিন এমুখো হয়নি তা কি তোমার খেয়াল নেই?

শিবনাথ গড়গড়ার নলটা মুখ থেকে নামিয়ে ধীর ভাবে বললেন, কার কথা বলছ? বিনয়ের? বোধ হয় কাজকর্মে খুব ব্যস্ত আছে।

—বিয়ের আগে মাস্টারমশাইকে না দেখলে তার ঘুম হত না, প্রতি শনিবার ছুটে আসত। এখন আসছে না কেন? বিরাজবাবু আবার কিছু গোল বাধালেন না কি?

—কি আর গোল বাধাবে?

—একে তো মা-বাপের অমতে বিয়ে করেছে, তার উপর তোমার মেয়ের রকম-সকম দেখে তার মন খারাপ হয়ে গেল নাকি?

—সেকি বলছ তুমি? শিক্ষিত ছেলে বিয়ে করেছে, দায়িত্ব জ্ঞান হয়েছে। মন খারাপ হওয়ার কি আছে, কল্যাণী কিছু দোষ করেছে নাকি?

—ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়। তোমার আদুরে মেয়ে যে একেবারে মিলিটারি! অত বড় মেয়ে, লেখাপড়া শিখেছে। এখনো জ্ঞান হল না কিছু। এখনো বিনয়কে বিনুদা বলে ডাকে!

—মা-বাপকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে সে যদি আবার বিয়ে করে বসে? হতভাগীর কপালে সতীন নাচছে নাকি?

—শিবনাথ হেসে বললেন, আজকাল ছেলেরা অত বোকা নয়। একটা বউ পুষতে পারে না। আবার দুটো? তুমি পাগল হলে নাকি? আর কি সে যুগ আছে?

—পুরুষ মানুষকে বিশ্বাস কি?

—তা বটে! দেখছ না, তোমার এই পুরুষ-মানুষটা আরও একটা বিয়ে করছে?

—তামাশা রেখে দাও। বিয়ে না করুক, মনের দুঃখে সন্ন্যেসী-টন্ন্যেসী হয়ে চলে যেতে পারে তো?

—তা পারে। আজকাল যাতায়াতের খুব সুবিধে আছে। তবে যাওয়াটা যেমন সহজ, ফিরে আসাও আরও বেশী সুবিধাজনক।

—তামাশা রেখে দাও। মেয়ে তো একটা চিঠি লিখবে জামাইকে আসতে। ও লিখবে না। বলে, তোমাদের জামাই, তোমরা লেখ না। আমি লিখতে যাব কেন?

—ঠিকই বলে। ওর তো জামাই নয়, ওর বিনুদা। যেমন মা, তেমনি মেয়ে—ওর দোষ কি?

—মার অপরাধটা কি হল শুনি?

—অপরাধ কর নি?, তুমি কোন দিন চিঠি লিখেছিলে?

—লিখতে কি জানতাম, ছাই, যে লিখব? আজকাল চিঠি লেখালেখির রেওয়াজ। আট বছরের একরত্তি মেয়ে ঘর করতে এসেছিলাম অজ পাড়াগাঁয়ে। লেখাপড়া জানতাম না। তুমি তো ন-মাসে ছ-মাসে বাড়ি আসতে। খেয়ে-দেয়ে ভালো ছেলেটির মতো তো মায়ের কোলে শুয়ে পড়তে। এইভাবেই তো কয়েক বছর কষ্টে কেটেছে। বড় হয়েও কি মশাই-এর দেখা পেয়েছি? দিনের বেলা তো আমার কাজের অন্ত ছিল না। মাথায় একহাত ঘোমটা টেনে খেতে দিতাম। তুমি খেতে বসতে, আর আমি রান্নাঘরের বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে তোমাকে দেখতাম। ভাবতাম, মানুষটি তো বেশ! একবার খোঁজখবর নেয় না। ছুটির সময় বাড়ি আসে, খায়-দায় বেড়ায়, আর মায়ের কোলে ঘুমোয়! মা বলতেন, ছেলে লেখাপড়া করছে। বউ-এর কাছে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। এই মানুষটি আমাকে কি কম জ্বালিয়েছে?

শিবনাথ হেসে বললেন, কি করব বল? সেকালে দেশের ওই রীতি ছিল।

শিবানী চটেমটে বললেন, মার ঝেঁটা দেশের রীতির মাথায়! ঘরে বউ ছটফট করছে, আর উনি মা-বাপের সুপুত্তুর হয়ে শুয়ে পড়লেন মার অঞ্চলের নিধি হয়ে! আমি ভাবতাম, মানুষটা কি সন্ন্যেসী, না আর কিছু! দু-একদিনের ছুটির কথা না হয় ছেড়ে দিলাম। মশাই একজন না একজন বন্ধুকে নিয়ে বাড়ি আসতেন, খেতেন-দেতেন, নদীর চরে বেড়াতেন, বন্ধুকে নিয়ে শুতেন, গল্প-গুজবে রাত কাটিয়ে চলে যেতেন। এমন রাগ হত আমার সে কি বলব?

—তাই বুঝি মেয়ে-জামাইকে এক সঙ্গে দেখে ক্ষোভটা মেটাতে চাচ্ছ?

শিবানী বাঘিনীর মতো গর্জন করে বললেন, বাপ-সোহাগী মেয়ের জ্বালায় তা কি হয়ে উঠবে? মেয়ে তো মনসা ঠাকরুন, ফণা তুলেই আছেন!

—যাক্, ও সব পুরানো কাসন্দি ঘেঁটে লাভ কি? আগের অভাবটা তো এখন সুদে-আসলে পুষিয়ে নিচ্ছ। আজ পঁচিশ বছর তো ছাড়াছাড়ি হয় নি, বোধ হয় হবেও না।

শিবানী তাঁর দিকে চোখ তুলে বললেন, হবে না? নিশ্চয়ই হবে। দেখে নিও। আমার মা সধবা মরেছেন, আমার শাশুড়ী পাকা চুলে সিঁদুর নিয়ে গেছেন। দেখে নিও, আমিও আগে চলে যাব।

তাঁর চোখ দুটি জল জল করে উঠল। তাঁর এই আচমকা ভবিষ্যদ্বাণী শুনে শিবনাথ ভয়ে ভয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন! একটা-দুটো চুলে পাক ধরেছে। দেবী-প্রতিমার মতো অমন নিটোল সুন্দর মুখে দু-একটা খাঁজ পড়েছে। ইদানীং তাঁর শরীরটাও ভালো যাচ্ছে না। শিবনাথের বার বার বলা সত্ত্বেও, ছেলেমেয়েদের অনুনয়-বিনয় সত্ত্বেও, তিনি নিজের দেহের প্রতি অমনোযোগিনী। অনবরত পানদোক্তা চিবানোর দরুন তাঁর খিদে হয় না। কাজ নেই, তবু বেলা তিনটের সময় স্নান ও খাওয়া। রাত্রে খাওয়ার দরকার হয় না। একটু সন্দেশ হলেই হল। ওষুধ এনে দিলে পড়ে থাকে। বলেন আমার কিছু হবে না। আমার কঠিন জীবন। ছেলেবেলা থেকে কষ্ট সহ্য করে আমার হাড় শক্ত হয়ে গিয়েছে। মরণ হবে কি?

শিবানীকে সান্ত্বনা দিয়ে শিবনাথ বললেন, তুমি ভয় পেয়ো না। বিনয় একটা বড় মকদ্দমা নিয়ে ব্যস্ত। এখনো তো সে জুনিয়র। কেস স্টাডি করতে হয়, নজির বের করতে হয়। সিনিয়রের কাছে দুবেলা যেতে হয়। এজন্যে

তার ফুরসত হয় না। সে লিখেছে, যেতে দেরি হচ্ছে বলে আপনারা ভাববেন না। শীগ্‌গীর যাচ্ছি।

শিবানী স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। নিজের মনকে সান্ত্বনা দেবার জন্যে বললেন, তা জানি। বিনয় আমার তেমন ছেলে নয়। দেখ, পেটের মেয়ের চেয়ে পরের ছেলে অনেক ভালো।

॥ ত্রিশ ॥

কল্যাণী বিনয়ের বাসায় গিয়েছে। শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক ছিল না। শিবানী আদরের মেয়েকে কোন দিন রাঁধতে দেন নি। রান্না-বান্না শেখান নি। সে এখন একলা ঘরের গৃহিণী। বিনয় ও গোপালকে নিয়ে তার ক্ষুদ্র সংসার। কোনদিন ভাত কাঁচা থাকে, কোন দিন চাল সিদ্ধ হয়ে জাউ হয়ে যায়, কোন দিন ভাত পুড়ে যায়। কোন তরকারি আনো-না। কোনটা নুনে পুড়ে যায়। মাছ কাঁচা থাকে, মাছের ঝোল জলবৎ তরল। ডাল দোতলা। বিনয়ের খাওয়াই হয় না। চুপ করে খেয়ে উঠে যায়। শুনে, শিবানী মেয়েকে রান্না শেখাতে বাসায় গেলেন। বড় বউরানী আর দুর্গা বাড়িতে রইল।

বড় বউরানী কাজকর্মে পাকা। সুন্দরী, তবে তিরিক্ষি মেজাজ। বেশী শুচিবাই। বামুন-পণ্ডিতের বাড়ির মেয়ে। জাত-বিচার সকৃড়ি-বিচার ছোঁয়াছুঁয়ি ব্যাপারে সচেতন। বাপের বাড়ি শ্যামবাজারে।

শিবনাথের নতুন বাড়ি, পুকুর, বাগান তার বড় ভালো লাগত। তবে বাড়ির সামনে ফাঁকা মাঠ ধূধূ করে। বড় নির্জন, ক্লান্তিকর। পাশেই তো অত বড় নদী। তাতে অনবরত স্টীমার চলে, ঢেউ ওঠে, জোয়ার আসে, জল ফেঁপে ওঠে। তার ভয় হয়। কি জানি কখন উচ্ছ্বসিত জলরাশি বাঁধ ভেঙ্গে ঘর-বাড়ি সব ভাসিয়ে নিয়ে যায়! আবার রাত্রে শিয়ালও ডাকে, হুক্কা-হুয়া রব শুনে সে চমকে ওঠে। ঘুম হয় না। এ বাড়ির সব ভালো আরও ভালো হত, যদি এখানে নদী, ফাঁকা মাঠ, আর শিয়াল না থাকত।

একদিন মন্দাকিনী বলেছিলেন, দ্যাখ্ বড় বউ, আজকাল বউগুলো এমন হল কেন?

শিবানী বললেন, কেন, কি হল ?

—এরা ঘোমটা টানতে ভুলে গেছে।

—আজকাল বউদের ঘোমটা টানার রেওয়াজ নেই।

—সেকালে তো এমন ছিল না।

—একালে বাস করে, সেকালের প্রথা চালু করা চলে না। সেকাল আর একালের মধ্যে তো তফাত আছে, ঠাকুরঝি।

—আমি এ সকল বেল্লিকপনা দেখতে পারি না।

—না পার চোখ বুজে থাক। বুড়ো হলে চোখ কান বুজে সংসারে থাকতে হয়। এইজন্যেই তো ভগবান বুড়োদের চোখে ছানি ফেলে দেন।

শিবানীর কথায় বিরক্ত হয়ে বুড়ী গজ গজ করছিল, এমন সময় মাসিমা কোথা গো—মাসিমা কোথা গো? বলে একটি যুবক বাগানের ভিতর চাতালের কাছে উপস্থিত হল। শিবানীকে দেখে সে মাথা নিচু করে পায়ে হাত ছুঁয়ে প্রণাম করল। শিবানী বললেন, ঐ তোমার পিসিমা, ওঁকে প্রণাম কর, বাবা!

ছেলেটির বয়স কুড়ি-বাইশ। পরণে হাফ্‌প্যান্ট, মাথায় টুপি। হাতে ছোট একটি এ্যাটাচি কেস। সুন্দর স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহ। আয়ত নয়ন যুগল বুদ্ধিদীপ্ত।

শিবানী জিজ্ঞাসা করলেন, আমেদ, এমন সময় কোথা থেকে এলি ?

আমেদ নাম শুনে বুড়ী তিন পা পিছিয়ে গেলেন। তারপর বললেন, হাঁ, বাবা, তুমি মোছলমান ? আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি হিন্দুর ছেলে। এই বলে ছোঁয়াছুঁয়ির ভয়ে বুড়ী চলে গেলেন। মুসলমানে ছুঁয়েছে, এজন্যে তিনি সটান পুকুরের জলে নেমে স্নান করলেন। ভিজে কাপড়ে নিজের ঘরে ঢুকে পাটের থানখানি পরলেন। তক্তাপোশ, বিছানা, সিন্ধুক, প্যাঁটরা, ছেঁড়া ন্যাকড়ার পুটুলিতে গঙ্গাজল ছিটোতে লাগলেন। মাটির হাঁড়ি কলসী ফেলে দিলেন। বাসন-কোসন মেজে ধুয়ে আনলেন।

বুড়ী চলে যাওয়ার পর শিবানী বললেন, কিছু মনে করো না, বাবা আমেদ। বামুনবাড়ির সেকেলে বিধবাদের অমন একটু শুচিবাই থাকে। এটা ঘৃণা নয়, অন্ধ কুসংস্কার। আমেদ হাসতে লাগল। তারপর বলল, অনেক দিন আপনাদের কথা শুনি নি। ঢাকার গবর্নমেণ্ট অফিসে চাকরি করি। গবর্নমেণ্টেরই কাজে কলকাতায় এসেছিলাম। জহিরের কাছে আপনাদের

ঠিকানা নিয়ে এলাম। শুনলাম কল্যাণীর বিয়ে হয়ে গেছে। সত্যি নাকি মাসিমা? সে এখন বউ হয়েছে। বলে সে হা হা করে হাসতে লাগল।

—হাঁ বাবা, সত্যি। বিয়ের কথা বলতে গেলে মহাভারত লেখা হয়ে যায়। তুমি এখন হাত-মুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হয়ে বস, জল খাও, তারপর সব শুনবে।

চা-জলখাবার খেতে খেতে আমেদ বলল, দেখুন, মাসিমা, ঢাকায় আমরা আপনার কথা আলোচনা করি। হিন্দুদের সব ভালো। একটা বড় দোষ তাদের। তারা মুসলমান ধর্মকে ঘৃণা করে না, ঘৃণা করে মুসলমানকে। আপনার কাছে কিন্তু হিন্দু-মুসলমানের বাছ-বিচার নেই। আপনার প্রাণ-ঢালা স্নেহের কথা আমরা ভুলতে পারব না। ঘাটশিলায় আপনি আমাদের সঙ্গে মিশতেন আর একসঙ্গে খেতেন দেখে মোক্তার-গিন্নী কত কথা বলেছেন। আপনি বলতেন, স্নেহের কি জাতবিচার আছে?

শিবানী জিজ্ঞাসা করলেন, রানু-জানু এখন কোথায়? দুটি বোন তো নয়, যেমন লক্ষ্মী-সরস্বতী। যেমন রূপ, তেমনি গুণ, তেমনি ব্যবহার, কথাবার্তা।

—ওরা এখন কুচবিহারে তাদের বাপের বাড়িতে। শীগ্‌গীর কলকাতা আসবে। তাদের বর জালাল আর জহির মেডিক্যাল কলেজের হাউস সার্জেন। তারা অনেক করে বলেছে, রানু জানু ফিরে এলে মাসিমাকে একদিন তাদের বাসায় যেতে হবে।

শিবানী হেসে বললেন, আচ্ছা, তাতে আর আপত্তি কি?

সন্ধ্যার পর শিবনাথ বাড়ি এলেন। ছেলেরাও এল। অনেকদিন পরে আমেদকে দেখে ছেলেরা তাকে মুহূর্তের জন্যেও ছাড়তে চায় না। রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তাদের আনন্দ, গল্প ও খাওয়া-দাওয়ার বিরাম ছিল না। আমেদ গবর্নমেণ্টের জরুরী কাজ নিয়ে কলকাতা এসেছিল। এজন্যে ভোরে চা-খাবার খেয়ে সে চলে গেল। পথিকের সঙ্গে পথিকের পরিচয়ের মতো বিদেশে বায়ু সেবনকারীদের পরিচয় ও মেলামেশা মনের উপর স্থায়ী দাগ কাটে না। কিন্তু ক্ষুদ্র এই শিক্ষিত মুসলমান-পরিবারের সঙ্গে এ বাড়ির সকলের মিলন ও হৃদ্যতা আত্মীয়তার রূপ নিয়েছিল।

আমেদ যতক্ষণ এ বাড়িতে ছিল, বুড়ী ততক্ষণ তার সামনে আসেনি। সে চলে গেছে শুনে বুড়ী উঠনে ও বাগানে গোবর জলের ছড়া দিলেন। এইভাবে বুড়ী স্নেহভাব দূষিত হিন্দুত্বের মহিমাকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। ঘর-বাড়ির

অশুদ্ধি মোচনের পর বুড়ী শিবানীকে বলেছিলেন—দেখ বউ, তোর সব ভালো, তুই জাত্ বিচার করিস নে, এইটে তোর দোষ। তোরা যতই বল, মোছলমান কখনো ইষ্টি, তেঁতুল কখনো মিষ্টি!

বুড়ীর কথায় উত্তর না দিয়ে শিবানী মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।

—মা, ওমা, শুনেছ। আজ সন্ধ্যার সময় একটা কাণ্ড হয়ে গেছে, দূর থেকে চিৎকার করে বলেছিল কাঙ্গালী। শিবানীর মেজ ছেলের ক্লাসফ্রেণ্ড। বয়স ষোল-সতরো বৎসর। জাতে সোনার বেনে। ছন্নছাড়া আড্ডাধারী ছেলে। মাইনে দিতে না পারায় স্কুল ছেড়ে দিয়েছিল। দশ বছর বয়সে মা-বাপ মরে যাওয়ার পর নগদ হাজার তিনেক টাকা, আর পাঁচ-ছ হাজার টাকার সোনার গয়না খুড়তুতো ভাইয়ের কাছে জমা রেখে তারই বাড়িতে ছিল। বছর চারেক পরে জমা টাকা ফুরিয়ে গেছে বলে খুড়তুতো ভাই তাকে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিল। ছেলের সুপারিশে শিবানী তাকে গৃহে আশ্রয় দিয়েছিলেন। একটা স্যাঁকরার দোকানে কাজ করে মাসে দশ টাকা রোজগার করে হাত খরচ চালাত। সন্ধ্যার পর আড্ডা দিয়ে ফিরে আসতে দেরি হয়ে গেলে একটা কাল্পনিক ঘটনার চমকপ্রদ কাহিনী শুনিয়ে শিবানীকে সন্তুষ্ট করত।

একদিন শিবনাথ বললেন, দেখ তুমি এই আড্ডাধারী হতভাগাটাকে ঘরে স্থান দিলে? ওর পাল্লায় পড়ে ছেলেগুলো বখাটে হয়ে যাবে যে! যত হতভাগা কি তোমার কাছে জোটে?

উত্তরে শিবানী বললেন, না গো না, আমার ছেলেরা তেমন নয়। ও কোথায় যাবে, বল। ওর যে কেউ কোথাও নেই!

—নেই বলে কি খামকা আমার অন্ন ধ্বংস করবে?

—দেখ, মানুষ লক্ষ্মী। যিনি ওদের পাঠান, তিনিই ওদের খাবার পাঠিয়ে দেন। মানুষের মুখে অন্ন দিলে সংসারে অভাব হয় না।

—তুমি জগজ্জননী হয়ে বসেছ! যা ভালো বোঝ কর।

কিছুকাল পরে কাঙ্গালী কলকাতা চলে গেল। পরে কাঙ্গালী বৌবাজারে একটা সোনা রূপার দোকান খুলে বসেছিল।

॥ একত্রিশ ॥

সে বছর পূজার বন্ধে বিনয় সকলকে নিয়ে বায়ু পরিবর্তনের জন্যে দেওঘরে গেছে। শিবানীও সঙ্গে গেছেন। মা সঙ্গে না থাকলে দেখাশুনা করবে কে? কল্যাণী তো ছেলেমানুষ। তার মেয়েটি তো মাত্র এক বছরের। বাড়ির সকলেই গেছে। বাকি ছিলেন শুধু শিবনাথ আর তাঁর মেজ ছেলে। কিন্তু বিনয়ের পত্রাঘাতের তাড়নায় শেষ পর্যন্ত তাদের দুজনকেও যেতে হল।

শিবনাথ ছিলেন ঘরকুনো মানুষ। কোথাও যাওয়ার নাম শুনলে তাঁর গায়ে জ্বর আসত। শান্তিপ্রিয় নিরীহ এই মানুষটি গল্প করে, বই পড়ে ও বই লিখে, আর চা-তামাক খেয়ে সময় কাটাতে ভালবাসতেন। একদিন সান্ধ্য-আড্ডায় এক বন্ধু তাঁকে জিজ্ঞাসা করল—কি হে মাস্টার! এ বছর পূজোর বন্ধে কোথাও বেড়াতে যাবে নাকি?

শিবনাথ বললেন—গাঁটের পয়সা খরচ করে ভবঘুরের মতো ঘুরে বেড়ানোর বাতিক আমার নেই।

—বেড়াতে যাওয়া কি বাতিক?

—বাতিক নয়, ব্যাধি। ছুটির দিনে বঁড়শিতে মাছ ধরা, পাখি শিকার করা, আর বিদেশে বায়ু পরিবর্তনে যাওয়া নিষ্কর্মা দেশী সাহেবদের একটা রোগ। তার চেয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে, দিব্বি হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে, গড়গড়ায় নলটা মুখে দিয়ে একখানা খবরের কাগজ বা মাসিকপত্র পড়ার মতো আরাম আর নেই। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে গাড়ির ভিড় ঠেলে রাত জেগে আধমরা হয়ে বিদেশে যাওয়ার মতো দুর্ভোগ আর নেই। লোকে কথায় বলে—ঘরের পাপ যে, বিদেশে যায় সে।

দলের মধ্যে এক ডাক্তার ছিল। সে বলল, তাহলে আমরা যে রুগীকে চেঞ্জে যেতে বলি তাও পাপ?

—তোমাদের ডাক্তারদের কথা আর বলো না। আগে রুগীর সর্বস্ব খেয়ে তোমরা যখন দেখলে টাকা হালে পানি পাচ্ছে না, তখন তোমরা রুগীকে চেঞ্জে যেতে উপদেশ দাও। অর্থাৎ আমার দ্বারা আর কিছু হবে না, এখন পথ দেখ। বেচারী ধনে-প্রাণে মারা যায়!

—তাহলে তুমি কি করতে বল?

—আমি বলি ঘরে থেকে সন্দেশ-রসগোল্লা খাও, আর বেড়াও। দেখবে সব রোগ সেরে যাবে।

—সন্দেশটা দেখছি তোমার মতে মহৌষধ!

—ওহে, সন্দেশ আর রসগোল্লা হচ্ছে বাঙালী কালচারের ক্লাইমেক্স! এ হেন বস্তু খেলে কি আর দেখতে আছে?

তারপর বললেন, বাঙালী ছাড়া পৃথিবীর আর কোন জাত এত ভালো সন্দেশ আর রসগোল্লা তৈরি করতে পেরেছে কি?

একজন উকিল বললেন, তার মানে, বাঙালী জাতের মতো এত বড় পেটুক জাত নেই। আমাদের তরকারির ফিরিস্তি আর মিষ্টির বহর দেখলে বোঝা যায়, বাঙালীদের নোলা কত লম্বা। আমাদের মেয়েরা নানা রকম আনাজের পারমুটেশন ও কম্বিনেশনের ওস্তাদ। মাছের মাথা দিয়ে মুগের ডাল, মাছের কালিয়া, ডাঁটা চচ্চড়ি, ছেঁচড়া, এঁচড়ের ডাল্না, ফুলকপি বাঁধাকপির তরকারি, লাউ-চিংড়ি ইত্যাদি হাজার রকমের তরকারি রান্নায় তাঁদের সুরুচি-বোধ আর রন্ধন-পটুতার পরিচয় পাওয়া যায়।

বাঙালী মেয়েদের ভূয়সী প্রশংসা শুনে শিবনাথ বললেন, তবু তো বউদি এখানে নেই। উলুবনে মুক্তো ছড়িয়ে লাভ কি, ভাই? বউদি কাছে থাকলে তোমার নারী-প্রশস্তি তাঁর কাছে পৌঁছে দিতাম। শুনে তিনি বকবক খুশী হতেন? আর তোমাকে নেমন্তন্ন করে গাণ্ডেপিণ্ডে খাওয়াতেন।

—তার মানে?

—মেয়েদের একটা দুর্বলতা আছে। রূপের আর রান্নার প্রশংসা করলে তারা আনন্দে গলে যায়।

—এখন বল মাস্টার! কবে পাড়ি দিচ্ছ দেওঘরে? বৌঠাকরুন তো মেয়ে-জামাই-এর কাছে? একবার সকলকে দেখতে যাবে তো? উকিলবাবু মুখ টিপে হাসতে লাগলেন।

—যেতে ইচ্ছে নেই। অমন ছুটাছুটি আমার ভালো লাগে না। তবে না গিয়েও তো উপায় নেই। ছেলে, মেয়ে, জামাই বার বার ডেকে পাঠাচ্ছে। না গিয়ে করি কি?

—হাঁ হাঁ তা তো বটে। তোমার তো ইচ্ছেই নেই! বৌঠাকরুনও চুপচাপ। মৌনং সম্মতি লক্ষণং।

এই বলে তিনি হাসতে লাগলেন। মুখ চাওয়া-চাউয়ি করে তাঁরা সকলে

উকিলবাবুর হাসিতে যোগ দিলেন। ডাক্তার এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকার পর বললেন, ছেলেপুলে হয়ে গেলে তাদের দেখবার অছিলায় মানুষ স্ত্রীর কাছে যায়।

অগত্যা দুখানা ইণ্টার ক্লাসের টিকিট কিনে শিবনাথ মেজ ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশনে দেওঘরের গাড়িতে উঠলেন। কোজাগরী লক্ষীপূজা শেষ হয়ে গেলেও গাড়িতে ভীষণ ভীড়—ন স্থানং তিলধারণং। প্রায় সারারাত্রি দাঁড়িয়েই কাটাতে হল। সকাল সাতটার সময় গাড়ি বৈদ্যনাথধাম স্টেশনে পৌছল। শিবানী ছাড়া বাড়ির আর সকলে স্টেশনে উপস্থিত ছিল।

কারস্টেয়ার টাউনে বড় রাস্তার ধারে একটি প্রকাণ্ড বাগানের মধ্যে একখানি বড় একতলা বাড়ি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। একই কম্পাউণ্ডের ভিতর একই বাড়িওয়ালার আর একখানি একতলা ছোট বাসায় একজন প্রোফেসার সপরিবারে থাকতেন।

দ্বিতীয় মহাসমরের পূর্বে ইংরেজ আমলে বাঙালী-বিহারী সমস্যা তত তীব্র আকার ধারণ করেনি। বাঙালী-বিদ্বেষ সবেমাত্র দেখা দিয়েছে। জিনিসপত্র সুলভ। এক টাকায় ছ সের খাঁটি দুধ। টাকায় চার-পাঁচটি মোরগ। চাল, তরিতরকারি, আনাজ, দৈ খুব সস্তা। ছেলেরা তো দশ-পনরোটা মুরগী বাগানে ছেড়ে রেখেছিল। দুপুরটুকু ছাড়া তারা তো জনবিরল মুক্ত প্রান্তরে ঘুরে বেড়াত। কোন দিন মধুপুর, কোন দিন গিরিডি, কখন বা দেওঘরের আশে-পাশে দূর গ্রামাঞ্চল তাদের ভ্রমণ পরিক্রমার অন্তর্গত ছিল। শিবনাথ অত ছুটাছুটি ভালবাসতেন না। বেড়াতে এসেও তার সঙ্গী ছিল বই, কাজ ছিল লেখা, আর বিলাসিতা ছিল চা-তামাক। শিবনাথ ভেবেছিলেন, প্রোফেসার মশাই-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় সময়টা ভালভাবে কাটাবেন ; কিন্তু তাঁর টিকির নাগাল পাওয়া যেত না। তিনি ছিলেন বড় স্ত্রী-ভক্ত স্বামী। স্ত্রীর কথায় উঠতেন, বসতেন। ভোর পাঁচটায় বিছানা থেকে উঠে তিনি যেতেন ঘটি হাতে নিয়ে খাটালে। দাঁড়িয়ে থেকে গাই দুইয়ে ঘটি-ভর্তি দুধ নিয়ে আসতেন। তারপর শ্যালককে সঙ্গে নিয়ে বাজার করে আনতেন। গৃহিণীকে রান্না-বান্নার কাজে সক্রিয় সাহায্য করতেন। কূয়া থেকে জল তুলে আনতেন। এমন কি বাটনা বেটে দিতেন।

তাই দেখে একদিন শিবানী বললেন, লেখাপড়া-জানা ভদ্রলোক এত স্ত্রৈণ হলেন কেন ? মেয়েটি স্বামীকে যাদুমন্ত্রে এমন বশ করেছে যে, তাকে নাকে

দড়ি দিয়ে খাটাচ্ছে, উঠাচ্ছে, বসাচ্ছে, নাচাচ্ছে। শুনেছিলাম প্রোফেসাররা নাকি বিদ্যের জাহাজ। ভদ্রলোককে কোনদিন একখানা বই হাতে করতে দেখি নি।

শিবনাথ হেসে বললেন, উনি কলকাতার এক কলেজের অধ্যাপক, ডক্টরেট।

শিবানী আশ্চর্য হয়ে বললেন, উনি রুগী দেখেন, আবার কলেজে প্রোফেসারিও করেন!

—না গো না। ডক্টরেট মানে সর্ববিদ্যাবিশারদ। ওঁর সব পড়াশুনা শেষ হয়ে গেছে।

—তাই আবার হয় নাকি? শুনেছি বিদ্যের শেষ নেই।

—ডক্টরেট হলে হয়। একজন পণ্ডিতের কাছে থেকে তাঁর নির্দেশ অনুসারে পুরানো পুঁথি ঘেঁটে কোন বিষয়ে নতুন কিছু লিখতে পারলে এবং বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সেই লেখা অনুমোদিত হলে ডক্টরেট উপাধি পাওয়া যায়। সে যা হোক, আমাদের এই প্রোফেসার মশাই জ্যামিতি, ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্যের বই লেখেন। প্রকাশকরা ওঁকে টাকা দিয়ে বই কিনে নেয়। কাল্পনিক লেখকের নামে বই প্রকাশ করে। বই পাঠ্য হিসেবে অনুমোদন লাভ করলে প্রকাশকদের বেশ দু পয়সা পকেটে আসে।

—প্রোফেসার মশাই-এর বউ বললেন ওঁরা নাকি বালিগঞ্জে বাড়ি করেছেন।

—তা হবে না কেন? ওঁর নিজের মুখে শুনেছি, উনি কলকাতায় দু-তিনটি কলেজের আংশিক অধ্যাপক। তা ছাড়া সপ্তাহে চারদিন ছেলে পড়ান। এইভাবে দশ বছর চালাতে পারলে, বালিগঞ্জে কেন, লণ্ডনেও বাড়ি করা যায়।

প্রোফেসারবাবুর কথা ছেড়ে দিয়ে শিবানী বললেন, দেশ দেশান্তর থেকে হাজার হাজার যাত্রী আসে বাবা বৈদ্যনাথের পূজো দিতে। তুমি একদিনও মন্দিরে গেলে না? অদ্ভুত মানুষ দেখছি!

—আমি পুরী গয়া ও কাশীতে গেছি। সব তীর্থস্থানে দেখেছি যাত্রী, পাণ্ডা ও ভিখারী তীর্থস্থানের অপরিহার্য অঙ্গ। আমাদের তীর্থস্থানগুলি ধর্মক্ষেত্র না হয়ে ব্যবসাক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখানে গিয়েও তো সেই সব দেখব। লোকে মনে করে তীর্থস্থানে গেলেই ধর্ম হবে। রেলের প্রসাদে এখন তীর্থস্থানে পুণ্যলাভ সহজসাধ্য হয়ে উঠেছে।

—তুমি কি বল আগে যখন পায়ে হেঁটে মানুষ ধর্ম করতে যেত তখন বেশী পুণ্যলাভ হত, আর এখন রেলে চড়ে যায় বলে তা হয় না ?

—না, আমি তা বলছি নে। তবে মানুষ ভালবাসে পথ চলার আনন্দকে। শক্তি ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে সে যে আনন্দ পায়, যে তৃপ্তি পায় তার আর তুলনা হয় না। প্রতি পদে মাটিকে ছুঁয়ে চলে, প্রকৃতির অকৃত্রিম সৌন্দর্য উপভোগ করে, আর দুর্গম পথ চলার সংগ্রামে জয়ী হয়ে সে তার ইষ্টদেবতার কাছে কৃতজ্ঞতা জানায়। মনের প্রসন্নতা ও কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ সে গড়ে মন্দির, তোলে দেউল আর নুইয়ে দেয় তার মাথা তাঁর পদতলে শ্রদ্ধায় ও ভক্তিতে।

—সহজে ও পথ চলার কষ্ট ভোগ না করে দেবদর্শনে এলে পুণ্য হয় না ?

—তীর্থ-ভ্রমণের কাহিনী পড়ে কিছু টাকা যোগাড় করে একখানা টিকিট কিনে লোক ছুটে তীর্থস্থানে পুণ্য সঞ্চয় করতে। এটা পুণ্য সঞ্চয়ের পথ নয়, একটা বাতিক বা বিলাস মাত্র। এ যেন বড়লোকের ফুলের বাগান করা। নিজে মাটি কুপিয়ে, ফুলের গাছ লাগিয়ে, গাছের যত্ন করে, জল ঢেলে, ফুল ফুটিয়ে যে নির্মল আনন্দ ও স্বাস্থ্যলাভ হয়, তার সঙ্গে পয়সা খরচ করে মালী রেখে, মজুর খাটিয়ে, গাছ বসিয়ে, ফুল ফোটানোর আনন্দের তুলনা হয় না।

—তোমার কথা শুনলে ঠাকুরঝি কি বলবেন ?

—ঠাকুরঝিদের মতো ধর্মের বাতিকগ্রস্তা বুড়ী ও অকর্মণ্য বুড়ো, ভবঘুরে ছেলে-ছোকরা আর শৌখিন শহুরে বাবু ও তাদের স্ত্রীরা এখন ভিড় করেন তীর্থস্থানে। তীর্থক্ষেত্র যদি স্বাস্থ্যকর স্থান হয় তবে তো কথাই নেই। রথ-দেখা আর কলা-বেচা হয়—এক ঢিলে দুটো পাখি মারা চলে।

—তা হোক। তবু তো তারা দেব-দেবী দর্শন করার জন্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

—বেড়াতে বা বায়ুপরিবর্তন করার জন্যে স্বাস্থ্যকর স্থানে আসা এবং পুণ্য অর্জন করতে আসার মধ্যে প্রভেদ আছে। দু নৌকায় পা দিলে কখনো কল্যাণ হয় না।

এমন সময় ছেলেমেয়েরা হৈ চৈ করতে করতে বাসায় উপস্থিত হল। শিবনাথ বেশী ঘোরাঘুরি করতে ভালবাসেন না। শিবানীও বেশী হাঁটতে পারেন না। ছেলেদের আগ্রহ ও অনুরোধ ঠেলতে না পেরে তিনি মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে

যান। খাওয়া আর ঘুমানোর সময় তারা বাসায় থাকে। কোন কোন দিন কল্যাণী ও বড় বউ শিবানীকে নিয়ে সন্ধ্যার সময় কতকটা বেড়িয়ে আসে। কোন দিন তিনি শিবনাথের সঙ্গে যান। ত্রিকূট, তপোবন, বালানন্দ স্বামীর আশ্রম প্রভৃতি দেখা হল। কোন একটা পাহাড় ও ঝর্ণার নাম শুনলেই দেখবার জন্যে বিনয়, সুশোভন ও সরোজের মন অস্থির হয়ে উঠে। যতদূর হোক না তারা যেতে ছাড়ে না।

একদিন বিকেলে শিবানী শিবনাথের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন। তাঁদের আশে-পাশে কত মেয়ে ও পুরুষ রাস্তায় চলতে চলতে গল্প করছে, হাসছে, আনন্দ করছে। দেখে শিবানী বললেন, এদের বয়সে আমি কোনদিন এত স্বাধীনভাবে ঘরের বাইরে বেরুতে পাইনি। এত বয়স হল, কিন্তু এখনও রাস্তার পুরুষদের সঙ্গে উঁচু গলায় কথা বলতে লজ্জা করে। এরা তো গৃহস্থবাড়ির বউ-ঝি? এরা পারে কি করে? এরা যে সকলে সাহেব-বিবি হয়ে গেল!

—দেশে এরাও লজ্জা সরম ত্যাগ করে এতখানি বেপরোয়া হয় না। স্বাস্থ্য ভালো করবার জন্যে বেড়াতে বিদেশে এসেছে। বেড়াবে না কেন?

—আমার ছেলেমেয়েরা বড় হয়েছে, জামাই হয়েছে, নাতনী হয়েছে, ছেলেদের বিয়ে হয়েছে। বুড়ী হয়ে গেলাম। তুমি আর ছেলেরা ছাড়া অন্য কারোর সঙ্গে পথে বেরুতে হলে পা কাঁপে।

—ওটা অভ্যাসের দোষ।

তারপর হেসে বললেন, তুমি একেবারে সেকেলে মুখ্যু মেয়েছেলে কিনা? এরা আজকালকার আপ্-টু-ডেট্ মেয়ে। সকলের সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারে, কথা কইতে পারে, ঠাট্টা তামাশা করতে জানে। এরা তোমাদের মতো কুনো মুখচোরা ঘোমটা-টানা মেয়ে নয়।

—কেন, আমার কল্যাণী তো তেমন নয়। সেও তো ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়েছিল, না হয় ফেল করেছে।

—যেমন মা তেমনি মেয়ে। সে তো আর স্কুল-কলেজে পড়েনি। এজন্যে সে চালাক-চোস্ত নয়। ননীর পুতুলই রয়ে গেল। ফরওয়ার্ড হল না।

—তা হোক অমন ফরওয়ার্ড হওয়ার মাথায় ঝাঁটা মারি। আমাদের গেরস্তবাড়ির মেয়েকে গেরস্তবাড়ির বউ হতে হয়। ধিঙ্গী হয়ে বেড়ালে চলে না।

—তোমাদের কাল ছিল আলাদা। তোমরা ছোটবেলায় শ্বশুরঘর করতে

আসতে, ঝি-গিরি করতে আর হেঁসেলগোড়ায় বাঁধা থাকতে। সেকাল আর নেই। একালের মেয়েরা স্কুল-কলেজে পড়ে। সাঁতার আর খেলাধূলার প্রতিযোগিতায় নামে। চাকরি করে। আমাদের দেশনেতারা পুরুষদের সঙ্গে মেয়েদের দেশের কাজ করতে বলেছেন। বিজয়লক্ষ্মী, সরোজিনী নাইডুর কথা শুনেছ তো? আজকাল দেশের হাওয়া বদলে গেছে।

—হাওয়া বদলেছে, কিন্তু আমি যে বদলাতে পারলাম না।

—কেন, তুমিও তো ধীরে ধীরে বদলে গেছ। তা তুমি বুঝতে পার নি! সময়ের গুণে তোমার মধ্যেও পরিবর্তন ঘটেছে। তুমি যেভাবে মানুষ, তাতে তোমার পক্ষে এতখানি উদার হওয়া সম্ভব ছিল না। তুমি মেয়েকে লেখাপড়া শেখাচ্ছ, জাত বিচার কর না, সকৃড়ি মান না, ছোঁয়াছুঁয়ির ধার ধার না। এটা কি কাল-ধর্ম নয়?

—কাল-ধর্ম অনুসারে মানুষ বদলায় সত্যি। কিন্তু জীবনের সকল ক্ষেত্রে কতগুলি নিয়ম আছে, আর সেই নিয়মগুলি মেনে চলাই ভালো।

—সব নিয়মই কি ভালো?

—আমি সামান্য লেখাপড়া জানি। ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতা আমার নেই। তবে এটুকু বুঝি, যারা নিয়ম মেনে চলে, তারা ন্যায়ের পথে আছে।

এই বিষয় নিয়ে শিবনাথ তর্কে আর বেশী দূর অগ্রসর না হয়ে বললেন, প্রচলিত নিয়মগুলো যে সব সময়ে ঠিক তা নয়। তবে যে নিয়মে পারিবারিক জীবন সুস্থ ও সুখময় হয়ে উঠে, সেই নিয়মই ভালো। সংসারে পুরুষের কাজ হচ্ছে পত্নীকে ভালবাসা, ছেলেপুলেদের সৎ শিক্ষা দেওয়া, আত্মীয়-স্বজনদের বিপদে সাহায্য করা; আর নারীর কাজ ছেলেমেয়েদের লালনপালন করা, তাদের মানুষ করা, গৃহকে বাইরের আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, তাকে পবিত্র রাখা।

এইভাবে কথা বলতে বলতে তাঁরা উপস্থিত হলেন একটা ছোট টিলার নিচে। শিবানী সবুজ ঘাসের উপর বসে পড়েছেন। শিবনাথ এদিক-ওদিক ঘুরছেন। মাকে দেখতে পেয়ে কল্যাণী ও ছেলেমেয়েদের দল শিবানীর কাছে উপস্থিত হয়ে হৈ-হল্লা করতে লাগল। শিবনাথ তাদের দিকে এগিয়ে এলেন।

—তোরা ওকে নিয়ে আয়। আমি চললাম। বলে, শিবনাথ বাসার দিকে দ্রুত হাঁটতে লাগলেন।

ঘুরে বেড়িয়ে আনন্দে কোথা দিয়ে ছুটির মাস কেটে গেল। বিদেশে এসে জামাই-এর টাকা খরচ করা লজ্জার বিষয়। টাকা-কড়ি দিতে গেলে বিনয় নেয় না। বলে, ও আর কি! হলই বা খরচ। তোমার শরীরটা সেরে যাক। শিবানী বললেন, আমি বেশ সেরে গেছি। এবার দেশে ফিরে চল।

একদিন সকালে মোট-ঘাট, বাসন-কোসন ও বিছানার চার-পাঁচটা গাঁটরি, ট্রাঙ্ক, স্যুটকেস প্রভৃতি নিয়ে তারা হাওড়া প্যাসেঞ্জার গাড়িতে উঠল। রুক্ষ লাল মাটির প্রান্তর ভেদ করে গাড়ি ছুটে চলতে লাগল। দূরে দূরে স্টেশন। স্বাস্থ্যকর স্থান। মাঝে মাঝে আম্রকুঞ্জ। খোলার ছাউনি কুটীরের সমষ্টি গ্রাম। শ্রীহীন, দারিদ্র্যের ছাপ-মারা। অকরুণ দৃশ্য। কাট-খোট্টা আকৃতির মানুষ, প্রকৃতিও তাই।

ক্রমে ট্রেণখানি এসে ঢুকল বর্ধমান জেলায়। চোখ-জুড়ানো শ্যামলিমা। রেলের রাস্তার দুধারে দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ। মাঠ-ভরা ধানগাছের সবুজ সমারোহ। মাঝে মাঝে কয়লার খনি। স্থানে স্থানে কয়লার পর্বত-প্রমাণ স্তূপ। দূরে ধূম উদ্গিরণকারী অসংখ্য চিমনি। এইভাবে প্রকৃতির ও মানুষের হাতের তৈরী নানা দৃশ্য দেখতে দেখতে তারা এসে পৌছল জনবহুল হাওড়া স্টেশনে। শিবানী গেলেন বিনয়ের বাসায়। আর সকলে এল কুসুমপুরে।

কেদারবাবু একলা কলকাতার বাসায় থাকেন। বাড়ি থেকে রোজ অফিসে যাতায়াত করতে পারেন না। প্রতি শনিবার দেশে যান। কেদারবাবুর অনুপস্থিতিতে বিনয় মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসে। উভয় পক্ষের মনোমালিন্যের উত্তাপ কমে গেছে। কেদারবাবু অনমনীয় দৃঢ়তার ভাব দেখান। ওকালতিতে বিনয় নাম করেছে। লোকের মুখে তিনি তার প্রশংসার কথা শোনেন। লজ্জার দুর্বলতা পিতা-পুত্রের মিলনের অন্তরায় হয়েছে।

একদিন সন্ধ্যার সময় বিনয়কে সঙ্গে নিয়ে শিবানী উপস্থিত হলেন কেদারবাবুর বাসায়। বাইরের দরজায় দাঁড়িয়ে তিনি কড়া নাড়তে লাগলেন। 'কে কে' বলতে বলতে কেদারবাবু খিল খুলে দিলেন। অনেকদিন পরে তিনি শিবানীকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। শিবানী গড় হয়ে প্রণাম করলেন।

কেদারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি একলা এলে?

—না, একলা নই। বিনয় এসেছে। বিনয় রাস্তায় পায়চারি করছিল। বাসার সামনে আসতে সাহস করে নি। দরজার সামনে এসে সে বাবাকে

প্রণাম করে তাঁর পায়ের ধুলো নিল। বৃদ্ধের দুটি চোখ জলে ভেসে গেছে। শিবানী কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় কেদারবাবু বললেন, এসো, ঘরের ভিতরে এসো। সদর দরজায় খিল দিয়ে তারা ভিতরে গেল। কেদারবাবু খাটের উপর আর শিবানী তাঁর পায়ের কাছে মেঝের উপর বসলেন।

কেদারবাবু বিছানার তলা থেকে একটা ছোট ব্যাগ বের করে দুটো টাকা বিনয়কে দিয়ে বললেন, এই নে, শীগ্‌গীর যা—খাবার নিয়ে আয়। বিনয় চলে গেলে শিবানী বললেন, আজ আমি এসেছি একটি অনুরোধ নিয়ে। বিনয়ের বিয়ে তো পাঁচ বছর আগে হয়ে গেছে। আপনার একটি নাতনী আর একটি নাতি হয়েছে। বাব্‌লুর অন্নপ্রাশনের বেশী দেরি নেই। আপনি বিনয়কে ক্ষমা করুন। আপনার অনুমতি পেলে ওরা দেশের বাড়িতে যাবে। আপনি বাব্‌লুর অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করুন।

বৃদ্ধের সে উষ্মা, সে উত্তাপ ছিল না। তাঁর ধীর, শান্ত মুখ অন্তরের আনন্দে উজ্জ্বল, ওষ্ঠদ্বয় স্মিত হাস্যে উদ্ভাসিত। দেখে শিবানী সাহস করে ব্যঙ্গচ্ছলে বললেন, আপনার নাতি বাব্‌লুর অন্নপ্রাশনের নেমন্তন্ন করতে এসেছি।

—তাই নাকি? তোমার বাড়িতে?

—আমার বাড়িতে কেন? তার নিজের বাড়িতেই। তবে আমি নেমন্তন্ন করছি আপনাকে।

—তুমিও যাবে তো?

—বা রে, যাব না কেন? আপনি না বললেও যাব।

—আচ্ছা, বেশ, বেশ! তাহলে যেতে হবে। যেন মনে থাকে। ওজর-আপত্তি শুনব না।

—এ কথাটা আর মনে থাকবে না? এত চেষ্টা করে নেমন্তন্ন বাগালাম, আর যাবো না? বলে দুজনে হাসতে লাগলেন।

—অন্নপ্রাশনের দিন স্থির হয়েছে?

—সে তো আপনার কাজ। আমি দিন স্থির করব কেন?

—তা তো ঠিক কথা। যুগলে যাচ্ছ তো?

—তা আর বলতে! আপনি তো জানেন আমরা জোড়ে ছাড়া কোথাও থাকি না বা যাই না।

—আর ছেলেপুলেরা? বৌমা?

—তারা সকলে তো পা তুলে আছে। বাড়ি ঝেঁটিয়ে যাবে।

কেদারবাবু শিবানীকে মেয়ের মতো দেখতেন। আজ পিতা পুত্রের মিলনের আনন্দে বেয়াই-বেয়ানের সম্পর্কের সুযোগ নিয়ে শিবানীর সঙ্গে রসিকতা করার লোভ সম্বরণ করতে পারেন নি। বিনয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, বিনয়! তোর শাশুড়ীকে নিয়ে বাসায় যা। রাত হয়ে যাচ্ছে। আজ ভোরে আমি বাড়ি যাচ্ছি। খোকার অন্নপ্রাশনের ব্যবস্থা করে তোদের জানাব। শিবানী ও বিনয় তাঁকে প্রণাম করে সেদিন বিদায় নিল।

॥ বত্রিশ ॥

তখন দ্বিতীয় মহাসমরের আগুন জ্বলে উঠেছে। গভর্নমেণ্ট নিরাপত্তা রক্ষার সমস্ত ব্যবস্থা করেছে। কুসুমপুরের আশে-পাশে চটকল, সূতার কল, কাপড়ের কল বন্ধ হয়ে গেছে। নদীর ধারে সশস্ত্র পুলিস পাহারা দিচ্ছে। মাঝে মাঝে সাইরেনের কর্ণভেদী চিৎকার শুনে লোকে ছুটোছুটি করে, ঘরে ঢোকে, মাটির গর্তে আশ্রয় নেয়। ছেলেপুলেদের নিয়ে শিবানী দাঁতে কাঠি দিয়ে কানে তুলো গুঁজে লেপমুড়ি দিয়ে খাটের নিচে শুয়ে পড়েন। জাপানী বোমারু বিমান ভয়ানক শব্দে আকাশে উড়ে চলে জ্যোৎস্নালোকে উজ্জ্বল নদীপথ ধরে মহানগরীর দিকে। নদীর ওপারে পেট্রোল এবং কেরোসিনের চৌবাচ্চায় বোমা পড়ে বিস্ফোরণ হয়। আগুনের হল্‌কা ছড়িয়ে পড়ে। নদীর জলে ভাসমান পেট্রোল দাউ দাউ জ্বলে ওঠে। মনে হয় নদীতে আগুন ধরে গেছে। দশ-বারো মাইল পর্যন্ত স্থানের ঘর-বাড়ি, জানালা-দরজা থর থর কাঁপে।

বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে নিরীহ অসামরিক মানুষ সম্বিৎ হারায়। গৃহ, অট্টালিকা, প্রাসাদ, যুগ-যুগ-সঞ্চিত সভ্যতার অবদান পুড়ে ছাই হয়ে যায়। পাছে জাপানীরা এসে নৌকাগুলি দখল করে, এই ভয়ে পুলিস সমস্ত নৌকা জলে ডুবিয়ে দিয়েছে। পাছে শত্রু যানবাহন হস্তগত করে, এই ভয়ে পুলিস সকলের সাইকেল কেড়ে নিয়েছে। স্থানে স্থানে সৈন্যের ঘাঁটি ও ছাউনি পড়েছে। দিন রাত্রি মালবাহী লরি মাটি কাঁপিয়ে ছুটছে। গুর্খা সৈন্য আনাগোনা করছে। দুশমনের মতো কালো পুরু-ঠোঁট নিগ্রো সৈন্য কুচকাওয়াজ করছে।

সন্ধ্যার পর ব্ল্যাক-আউট। চারদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কারখানা-বাড়ির দেওয়াল, সাহেবদের কোয়ার্টার কালোয় কালো। জ্যোৎস্না রাতেও ছায়ার

মতো অস্পষ্ট। মাঠে ধান নেই। গাছে ফল নেই। ডাঙ্গায় ফসল নেই। পুকুরে জল নেই। দেশ থেকে ধান চাল উধাও হয়ে গেছে।

কালো-বাজারীরা ছ টাকা মণের চাল ছত্রিশ টাকায় বিক্রি করে মোটা মুনাফা লুটছে। এক জোড়া মোটা কাপড় ষোল টাকায় বিক্রি করছে। হাট-বাজার খাঁ খাঁ করছে। জিনিসপত্রের দাম আগুন। কেনার লোক কোথায়?

লোক পেটের জ্বালায় প্রথমে বাসন-কোসন, পরে গরু-বাছুর, তারপর জমি-জায়গা, শেষে ছেলেমেয়ে বিক্রি করছে। সকলে বিক্রি করতে চায়। কেনার লোক কোথায়? স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে লোক ছুটেছে শহরে। হাতে মাটির মালসা, নারকেলের মালা। দরজা খোলা পেলে কাতর স্বরে বলে, একটু ফ্যান দাও মা! পায়ে পড়ি। তাদের চোখ কোটরে ঢুকে গিয়েছে। পেট দড়ি। হাত-পা কাঠি। অস্থিচর্মসার। কেউ দাঁত মুখ খিঁচিয়ে মরে পড়ে আছে রাস্তার ধারে! কেউ খাবারের দোকানের খুঁটিতে হেলান দিয়ে হাঁ-করে দাঁত বের করে মরে আছে!

স্থানে স্থানে গভর্নমেণ্ট লঙ্গরখানা খুলেছে। দশ সের চালের সঙ্গে কচু-ঘেঁচু ডাঁটা শাক গোটা ডাল এক সঙ্গে সিদ্ধ করে লোকের পাতে দেওয়া হচ্ছে। অখাদ্য খাদ্য খেয়ে হাজার হাজার লোক পা ফুলে মরে যাচ্ছে। গভর্নমেণ্টের ডাক্তার বলছে, এই পুষ্টিকর খাদ্যে প্রচুর ভিটামিন আছে। লঙ্গরখানার হাজার হাজার মণ চাল কোথায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। কন্‌ট্রোলের দোকান থেকে গাঁট গাঁট কাপড় কোথায় চলে যাচ্ছে। মানুষের জীবন নিয়ে খেলা চলেছে! বাংলাদেশ শ্মশানে পরিণত হয়েছে! লীগ গভর্নমেণ্ট দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছে। পিছনে লাট সাহেব কলকাঠি নাড়ছেন। অভাবের তাড়নায়, পেটের জ্বালায় লোক সৈনিকের খাতায় নাম লেখাচ্ছে।

দেশে চাল, তেল, নুন, চিনি না থাকলেও সৈন্যদের ছাউনিতে, শিবিরে শিবিরে টিন কেটে জ্বালানি কাঠে ঘি ঢেলে উনুন ধরানো হচ্ছে। রুটি মাখনের ছড়াছড়ি। টোস্ট, মাখন, রুটি, কেক কুকুরে খাচ্ছে। একটুকরো রুটি পাওয়ার আশায় বাচ্চা ছেলের দল সাহেবদের তাঁবুর চারধারে ঘুর ঘুর করছে। তাদের ফরমাশ খাটে, কাজ করে। দালালরা সৈন্যদের তাঁবুতে মেয়েমানুষ জুগিয়ে দিচ্ছে।

মুনাফাখোর চোরাবাজারী আড়তদারদের স্বর্গসুখ আরম্ভ হয়েছে।

গভর্নমেণ্টের অফিসাররা দু হাতে পকেট ভর্তি করছে। ধর্ম, নীতি, বিবেক দেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। লোভ-প্রতারণা-বঞ্চনার অবাধ রাজত্ব চলেছে। একদল নতুন বড়লোক সৃষ্টি হয়েছে। পূর্বে যেখানে কুটীর ছিল, সেখানে প্রাসাদ তৈরি হয়েছে। গ্রামে অধিকাংশ মাটির ঘরের চালে খড় নেই। খড়ের কাহন ষাট টাকা। খাদ্যের অভাবে মানুষের মতো হাজার হাজার গরু-বাছুর মৃত বা মৃতকল্প। কোথাও দু-চারটি শীর্ণকায় গাভী তৃণশস্যহীন শুষ্ক মাটি কামড়াচ্ছে।

শিবনাথের মতো বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরও কষ্টের অবধি ছিল না। শিবনাথের বড় ছেলে সুশোভন ওকালতি করতে বসেছে। লোক খেতে পায় না। মামলা করবে কে? মক্কেল কোথায়? সে রিক্তহস্তে বাড়ি ফিরে আসে। তার দু ভাই কলেজে পড়ে। সংসারে টানাটানি। সুশোভন ওকালতি ছেড়ে দিয়ে রেলের অফিসে চাকরি নিল। মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে। অল্প দামে রেশন পায়, এই লাভ। এই দুঃসময়ে শিবানীর মঙ্গল হস্তস্পর্শে সংসারের দুঃখকষ্টের তীব্রতা কেউ তেমন বুঝতে পারে নি।

সংসারের খুঁটিনাটি নিয়ে শিবনাথ কোনদিন মাথা ঘামান নি। মাইনের টাকা শিবানীর হাতে তুলে দিয়ে তিনি নিশ্চিন্ত থাকতেন। আলু, পটল, মাছ, তেল, নুন তাঁর চিন্তার পরিধির বাইরে ছিল। তিনি ছেলে পড়াতেন। নতুন বই কিনতেন। ঘরে বই পড়তেন। মাসিকপত্রের জন্যে প্রবন্ধ বা স্কুলপাঠ্য পুস্তক লিখতেন। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিতেন। কখন বা তাদের বাড়িতে গিয়ে বিনা পয়সায় তাদের ছেলেমেয়েদের পড়িয়ে আসতেন।

কিন্তু বই কিনবে কে? পাড়াগাঁর স্কুলে ছেলে নেই। শহরের স্কুলগুলি চলছে কিন্তু গভর্নমেণ্টের স্কুলগুলি ছাড়া সাধারণের স্কুলগুলিতে ছাত্রসংখ্যা বেশ কমে গেছে।

একদিন বৈঠকখানায় বসে খবরের কাগজ পড়তে পড়তে সুশোভন বিনয়কে বলল, ছাখ বিনয়দা, মুসলিম লীগের মন্ত্রীরা বলছে, যুদ্ধের জন্যেই দেশে দুর্ভিক্ষ হয়েছে। যুদ্ধ তো পৃথিবীর সব দেশেই হয়েছে, ভারতের অন্য সব প্রদেশেও তো যুদ্ধের ঢেউ লেগেছে, কিন্তু বাংলাদেশে জিনিসপত্র ও খোরাকির দাম এত বাড়ল কেন?

বিনয় বলল, যুদ্ধের জন্যে সকল দেশেই জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে সত্যি,

কিন্তু সেই সব দেশ স্বাধীন। তাদের মনোবৃত্তি এমন হীন নয়। তারা দুধে জল ভেজাল দিয়ে, চালে পাথরকুঁচি, নুনে বালি, তেলে সোরগোঁজা, চিনিতে কাঁচের গুঁড়ো আর ঘিয়ে সাপের চর্বি মিশিয়ে দেশের লোকের স্বাস্থ্য নষ্ট করে বড়লোক হতে চায় না।

—এ দেশের লোকের এমন প্রবৃত্তি হল কেন?

—বহুকাল পরাধীন থেকে এরা স্বার্থপর হয়ে গিয়েছে। এদের Self first আর স্বাধীন দেশের লোক বলে—Live and let live.

—তা বটে!

—দেখলে না, সমুদ্রের জল ফেঁপে উঠবে, ঝড় হবে জেনেও, এ দেশের গভর্নমেণ্ট আগে থেকে লোকজনদের সতর্ক করে দেয় নি। আগে জানিয়ে দিলে লোক সাবধান হতে পারত। এত লোক মরত না। নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিত। এত দুঃখ-দুর্দশায় পড়ত না।

—সেদিনের কথা মনে পড়লে আমার গা শিউরে উঠে! সপ্তমী পূজার দিন। সকাল থেকে আকাশটা গড়মড় করছিল। বিকেল তিনটার সময় তুমি চায়ের জল গরম করছিলে। নদীর দিক থেকে পাঁচ-ছ হাত উঁচু হয়ে জল আসছিল। তুমি আমাদের ডাকলে। আমরা ছুটে এলাম। জানলার ভিতর দিয়ে দেখলাম, চারদিক জোয়ারের জলে থৈ-থৈ করছে। তারপর সেই ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে এক বুক জল ভেঙ্গে স্টেশনে পালানো, সারারাত্রি গাড়িতে বসে থাকা, ছেলে-মেয়েদের চিৎকার, বিদ্যুতের কড়কড় আওয়াজ ও ঝলকানি, প্ল্যাটফরমের গাছ ভেঙ্গে পড়ায় মড়মড় শব্দ, বিশ্রামাগারের টিনের চাল উড়ে যাওয়ার ঝনঝনানি, আকাশের প্রলয়ঙ্কর মূর্তি, ভগ্ন বসত-বাটির করুণ দৃশ্য, এই সকল মনে পড়লে এখনও আমি কেঁপে উঠি! প্রকৃতির সে কি তাণ্ডব, সংহার-মূর্তি! তারপর দেশব্যাপী দুর্ভিক্ষ!

এর জন্যে দায়ী কে?

—দায়ী লীগ গভর্নমেণ্ট, আর দেশের লোভী ব্যবসায়ীগুলো, কালোবাজারী মুনাফাখোর আড়তদাররা। ইংরেজরা সামনে লীগ গভর্নমেণ্ট খাড়া করে পিছন থেকে কলকাঠি নাড়ছে।

—প্রতিকারের উপায় কি?

—ইংরেজের হাতের পুতুল এরা। এদের উচ্ছেদ না হলে দেশ রসাতলে যাবে। ভূত ছেড়ে যাওয়ার সময় যেমন গাছের ডাল ভেঙ্গে দিয়ে জানিয়ে

যায়, তেমনি যাওয়ার আগে এরা ভারতবর্ষকে খণ্ডিত করে তার একটা অংশ নিয়ে ছাড়বে।

—ক্রীপস্ মিশন তো ফেসে গেছে। দেখা যাক, লর্ড মাউন্টবেটেনের চেষ্টার কি ফল হয়।

—ফল আর কি হবে? মুসলমানেরা লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তানের ধুয়া তুলেছে। ওরা দেশের নানা অংশে মারামারি কাটাকাটি হানাহানি চালিয়ে রাখবে। জিন্না সাহেব তো দ্বিজাতিতত্ত্ব প্রচার করেছেন। হিন্দু-মুসলমান এক দেশে বাস করলেও ভাই-ভাই নয়—তারা দুটো জাতি। সুতরাং দুটো জাতি দুটো স্বাধীন দেশে বাস করবে। পেছনে ইংরেজদের উস্কানি আছে। ইংরেজ চলে যাওয়ার আগে ভারতবর্ষকে ভাগ করে দিয়ে যাবে। কংগ্রেস ভাববে সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো। গান্ধীজীর মত না থাকলেও অপর কংগ্রেসী নেতারা রাজী হয়ে যাবে, অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ, এই ভেবে।

এইভাবে বিনয় ও সুশোভনের মধ্যে আলোচনা চলছিল। এমন সময় শিবনাথ বৈঠকখানায় ঢুকে বললেন, শুনেছ তোমরা, সুরাবর্দী সাহেব প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু করবেন জানিয়েছেন।

আশ্চর্য হয়ে সুশোভন জিজ্ঞাসা করল, তার মানে?

শিবনাথ বললেন, মানে আর কি? মারামারি কাটাকাটি রক্তপাত! হিন্দু উচ্ছেদ।

—তা কি হবে?

—যাদের হাতে গভর্নমেণ্ট, পুলিস, সৈন্য, টাকা, অস্ত্রশস্ত্র, তাদের ইঙ্গিতে সব হতে পারে, আর হবেও তাই।

আলোচনা শেষ হতে না হতে খাওয়ার ডাক পড়তে তারা উঠে পড়ল।

॥ তেত্রিশ ॥

কুসুমপুরের বাড়িতে 'গানের মাস্টার' এসেছে। গানের মাস্টারের আসল নাম রামকৃষ্ণ। শিবনাথের দূর সম্পর্কের নাতি। চাঁপা গ্রামের বাঁড়ুয্যে বংশের একটি মেয়েকে বিয়ে করে ঘর-জামাই হিসেবে শ্বশুর-বাড়িতেই থাকে। ছোট ছেলেমেয়েদের গান শেখায়। গান জানে। অশিক্ষিত পটুতা আছে। গলাটি

মিষ্টি। প্রতি সপ্তাহে হুদিন কুসুমপুরের বাড়িতে থাকে। বিয়ের আগে কল্যাণীকে গান শেখাত। শহরের আট-দশটি মেয়েকে গান শিখিয়ে কিছু নগদ টাকা রোজগার করে। ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় তাকে রুটিন অনুসারে কাজ করতে হয়।

এত কম রোজগার মানুষের, কি করে সংসার চলবে, ভবিষ্যতে কি হবে, তিন-চারটির মুখে আহার যোগাতে তো হয়—এই সব কথা বলে সে নাকে কাঁদত। একটি বীমা কোম্পানির দালালি করত সকালে, বিকেল ও রাত্রে ছোট ছেলে-মেয়েদের গান শেখাত। ঘড়ি ধরে আসত, কাজ করত, চলে যেত। এক মিনিট এদিক-ওদিক হলে সব ওলট-পালট হয়ে যেত। শিবনাথ বলতেন, মাস্টারের কাজ লাট সাহেবের চাইতে বেশী। সময়টাকে সে হাতঘড়িতে বেঁধে রেখেছে। সে দীন নয়নে চেয়ে বলত—কি করব, দাদা! ছা-পোষা মানুষ। দুঃখের ধান্দায় ছুটোছুটি করি। ঘড়ি ধরে কাজ না করলে এত জায়গায় গান শেখাব কি করে? ঠাণ্ডা লেগে গলা ভেঙ্গে যাওয়ার ভয়ে সে খুব সাবধানে থাকত। শীতকাল তো দূরের কথা, এমন কি গ্রীষ্মকালেও গেঞ্জির উপর হাফ্ শার্ট, তার উপর শার্ট, তার উপর জ্যাকেট আর জ্যাকেটের উপর মোটা কোট চাপাত। জামার আট-দশটি পকেট টুকিটাকি জিনিসে ভর্তি থাকত। ভয়েস পিলের মোড়ক, পিপারমেন্টের শিশি, যোয়ানের আরক, আশ্চর্য মলম, আকণ্ঠভোজন বটিকা, তানসেনগুলি, ভাস্কর-লবণ, অম্বলের বটি, পানের ডিবা, বিড়ি ও দেশলাই-এর বাক্স, ফাউন্টেন পেন, ছোট্ট সরু কাঁচি, ছুরি, থার্মোমিটার, দাঁতের মাজন, ছোট আরশি, পকেট চিরুনি আর হাতকাটা তেল তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত। ছেলেরা তামাশা করে বলত, কাকার ম্যাজিসিয়ানের পকেট! যা খুঁজবে তাই পাওয়া যাবে। মাস্টার বলত, কি করব, বাবা! সাত ঘাটের জল খেয়ে বেড়াতে হয়। পথে-ঘাটে বিদেশ-বিভুঁয়ে হঠাৎ অসুখ-বিসুখ করলে ডাক্তার-বদ্যি কোথায় পাব?

শিবনাথ হেসে বলতেন, অসুখ ঠেকাবার জন্যে যে এত তোড়জোড় করে, অসুখ তাকে পেয়ে বসে। কবে কি অসুখ করবে বলে পকেটে ডিস্পেন্সারি নিয়ে ঘুরতে হবে? ওহে, যে মরবে তাকে কেউ বাঁচাতে পারে না, জানবে।

শিবনাথের সুবাদে নাতি হিসেবে শিবানী তাকে নিয়ে ফষ্টি-নষ্টি করতেন। তাকে 'গানের মাস্টার' নাম দিয়েছিলেন। সে কখন আসবে, কি খাবে, কোথায় শোবে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে তিনি সচেতন থাকতেন। শীতের রাতে ছাত্রীদের

গান শিখিয়ে বাড়ি ফিরতে এগারোটা বেজে যেত। বাড়ির সকলে ঘুমিয়ে পড়ত। শিবানী তার ভাত জেগে বসে থাকতেন। বলতেন, পুরুষ-মানুষ ভাত বেড়ে খাবে? আহা, পেটের জ্বালায় বেচারাকে বড় খাটতে হয়।

একদিন একটা গানের মজলিস থেকে মাস্টারের বাড়ি ফিরতে রাত্রি বারোটা হয়ে গিয়েছিল। শিবানীকে জেগে বসে থাকতে দেখে শিবনাথ রসিকতা করে বললেন, দেখছি, মাস্টার আমার এতকালের জিনিসটাকে হাত করে নিল।

শিবানী হেসে বললেন, হাত করার কি উপায় আছে? যে মানুষ ঘুমিয়েও চোখ বুজোয় না, তাকে ফাঁকি দেওয়া কি সহজ?

—আচ্ছা, কেন বলত মাস্টারের দিকে তোমার এত টান? বোধ হয় বুড়ীরা ছোকরাদের নিয়ে একটু মুখ বদলাতে চায়।

—ভাল-খাওয়া মুখে কি ঘেসো মাল চলবে?

—রাত হয়ে গেছে। শোবে এসো। রাত জাগলে শরীর খারাপ হবে।

—আমার শরীর খারাপ হওয়ার জন্যে দরদ নয়। কোল শূন্য বলে ঘুম হচ্ছে না, বুঝি?

—সারাজীবনের অভ্যেস, বদ অভ্যেস হলেও ছাড়া যায় কি?

—কোনদিন তো কোল শূন্য থাকেনি। চিরকালের অভ্যেসটা ছাড়ব কি করে?

—যখন একেবারে ছাড়তে হবে তখন কি হবে?

—সত্যি বলছি, আমিও তাই ভাবি। আজ পঁয়ত্রিশ বছর কাছ-ছাড়া হওনি। বাপের বাড়ির কেউ নেই যে দুদিন গিয়ে থাকবে। স্ত্রীকে কেমন করে লোক লম্বা লম্বা চিঠি লেখে তা জানি না। লেখার প্রয়োজন হল না এ পর্যন্ত।

—রাজা মরে গেলে রাজ্য চলে আর স্ত্রী মরলে সংসার চলে না?

—স্ত্রীর মূল্য রাজ্যের চেয়ে বেশী। জান তো কত রাজা স্ত্রীর জন্যে রাজ্য ছেড়েছে?

—স্ত্রীর জন্যে নয়, প্রেমের জন্যে। আমাদের দেশে মেয়েছেলে সস্তা। স্ত্রী পাওয়া কঠিন নয়।

—সস্তা আর পাওয়াও যায় সত্যি। তাতে লালসা মেটে, মন ওঠে না। প্রেম করে তো আমাদের বিয়ে হয়নি।

—তা বটে। বিয়ে কি জানতাম না। ভাবতাম, একটা অচেনা অজানা লোকের কাছে থাকব কি করে? সে কি ভালবাসবে? হয়তো কত বকবে, মারবে। দুর্দশা করবে।

—হাতে-নাতে কি দেখলে?

—ঘর করতে আসার পর বছর ছয় তো মশাই-এর টিকির নাগাল পাইনি। প্রথম ক'টা বছর তো অনেক নাকানি-চোবানি খেয়ে ষোল বছরের হলাম। ভেবেছিলাম, আমার জীবনটা এই ভাবেই বুঝি কাটবে। রাত্রে ঘুম হত না—কত ভাবতাম, কত কাঁদতাম। আঁধারের চোখের জল আঁধারেই মিশে যেত। ভগবানকে কাতরভাবে বলতাম, হে ঠাকুর, আমি তো সীতার মতো জন্ম-দুঃখিনী। কিন্তু সুদূর রাক্ষসপুরীর অশোকবন থেকেও সীতার উদ্ধার হয়েছিল। আমার কি উদ্ধার নেই? মেয়েরা স্বামী নিয়ে ঘরকন্না করে। আমার কপালে কি সে সুখ হবে না? এক একবার মনে করতাম গলায় দড়ি দিই, জলে ডুবে মরি, কোথাও চলে যাই। এমনভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরাই ভালো। পরক্ষণেই কে যেন বলত—মরবি কেন? অত ভাবছিস কেন? বউ হয়ে এসেছিস, বউ হয়ে থাক। সহ্য কর। স্বামী পাবি। ঘর পাবি। সংসার পাবি। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। তারপর তুমি একদিন হঠাৎ এসে উপস্থিত হলে। শুনলাম, তুমি আমায় নিয়ে যেতে এসেছ। ভাবলাম, লক্ষ্মী-জনার্দনের দয়া হয়েছে। পথ চেয়ে আর সময়ের অপেক্ষা করে বসে থাকা বুঝি এতদিনে সার্থক হল।

শিবানী আঁচলে চোখ মুছতে লাগলেন। এমন সময় সদর দরজায় ধাক্কা শোনা গেল। শিবানী দরজা খুলে দিলেন। তাঁকে দেখে মাস্টার লজ্জিত হয়ে বলল, দাদা, আপনি এখনও জেগে আছেন?

—না জেগে উপায় কি? চোর-ডাকু আছে। আমি নিজের প্রাণের মাল পাহারা দিচ্ছি, আর উনি তোমার পেটের মাল পাহারা দিচ্ছেন।

মাস্টার অপ্রতিভ হয়ে মিনতির সুরে বলল, আজ একজন বড় ওস্তাদের সঙ্গে 'তাল' নিয়ে ভীষণ তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেল।

—হাতাহাতি হয়নি তো? গাইয়ে-বাজিয়েদের ঐ রীতি। আমি স্বচক্ষে দেখেছি একবার একজন গাইয়ে তাল কেটে গেছে বলে তার বাজিয়ের গালে চড় বসিয়ে দিয়েছিল।

—জুড়ি সমান না হলে ধৈর্য রাখা যায় না। এই দেখুন না, দাদা আর বউদিদির জোড় না মিললে কথায় কথায় কুরুক্ষেত্র হয়ে যেত।

—তা বটে। এজন্যেই তো কোষ্ঠী দেখে স্ব স্ব প্রধান দুটো ডানা মেলা তরুণ-তরুণীর জোড় মিলিয়ে দিতে হয়। আমার মত কি জান? একজন ভালো গাইয়ের সঙ্গে একজন ভালো বাজিয়ে দিতে হয়। নইলে তাল কেটে যায়। গান জমে না। রসভঙ্গ হয়।

—তা ঠিক।

—সঙ্গীত-প্রেমিকরা গান শুনে আনন্দ পেতে চান। আসরে তোমাদের কথা কাটাকাটি শুনতে বা মারামারি দেখতে যান না। এখন যাক ও সব কথা। তুমি তো এখনও খাওনি?

—আমি খেয়ে এসেছি। ছিঃ ছিঃ,! বড় দেরি হয়ে গেছে। বউদিকে বড় কষ্ট দিলাম।

শিবনাথ হেসে বললেন, ভালোই হয়েছে। তা নইলে তো তোমার বউদিকে একান্তে পাওয়া যেত না। যৌবনে মা-পিসিরা আর প্রৌঢ় বয়সে ছেলে-বউরা মিলনের প্রতিবন্ধক।

শিবানী বিরক্ত হয়ে বললেন, রাত দুপুরে দাদা-নাতিতে কি এইভাবে রসালাপ চলবে? ঘুমোতে হবে না? রাত পুইয়ে এল যে। তুমি এখন ওঠ। মাস্টার, শোও গে যাও। গল্প পেলে ওঁর দিনরাত জ্ঞান থাকে না।

শিবনাথ বললেন, এতক্ষণ তো বেশ পান-দোক্তা গালে দিয়ে চুপ করে বসেছিলে। এখন আর তর সয় না দেখছি।

—তা হোক, এখন চল।

॥ চৌত্রিশ ॥

মুসলিম লীগ মন্ত্রী-সভার আমল। ইংরেজের পক্ষপুটে থেকে হিন্দুদের ধ্বংস করে বাঙলায় মুসলিম রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা চলছে। হিন্দু মন্ত্রীরা মন্ত্রী-সভা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। উৎকোচ, ধর্ম-বিদ্বেষ, পক্ষপাতিত্ব, অনাচার, অবিচারের রাজত্ব চলছিল। মুসলমান পাড়ায় মুসলমান যুবকদের ড্রিল, সামরিক-শিক্ষা দেওয়া হচ্ছিল। মুসলমান গুণ্ডারা অর্ধচন্দ্র মার্কা পতাকা

উড়িয়ে ঢোল বাজিয়ে 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' শ্লোগান দিয়ে বীর বিক্রমে নাচতে নাচতে শোভাযাত্রা করে হিন্দুদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছিল। সংখ্যালঘু মুসলমান-পাড়ায় মারণাস্ত্রে-সজ্জিত অপরিচিত মুসলমান গুণ্ডারা প্রচ্ছন্নভাবে ওত পেতে বসেছিল। মুসলমানদের ঘরে ঘরে হাত বোমা, ব্রেনগান, স্টেনগান, তলোয়ার, ছোরা সরবরাহ করা হচ্ছিল। যে দরিদ্র মুসলমানরা নিজেরা খেতে পায় না, তারাও ছদ্মবেশী গুণ্ডা আত্মীয়দের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছিল। কে টাকা দিত, কোথা থেকে টাকা আসত, তা বোঝা গেলেও দেখা যেত না। রাজকোষের টাকা এইভাবে হিন্দু-নিধন-যজ্ঞ অনুষ্ঠানের জন্যে জলের মতো ব্যয় হচ্ছিল। মুসলমানদের ব্যাপক প্রস্তুতি দেখে হিন্দুরা চিন্তিত, শঙ্কিত, ভীত, বিপন্ন। প্রতি গ্রামের হিন্দু যুবকরা—সম্ভাবিত বিপদের আশঙ্কায় মা-বোনদের মান-সম্ভ্রম রক্ষা করার জন্যে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল। পল্লীতে পল্লীতে স্বেচ্ছাসেবক দল গঠিত হয়েছিল। 'বন্দে মাতরম' ও শঙ্খধ্বনি বিপদের সঙ্কেত হিসেবে ব্যবহারের আদেশ প্রচারিত হল। সে এক অদ্ভুত অবস্থা। এক দেশের দুটি সম্প্রদায়ের লোক যারা আজ সাত শ বৎসর পাশাপাশি বাস করছিল, যারা ভাষায়, পোষাক-পরিচ্ছদে, আচার-ব্যবহারে এক ও অভিন্ন বলে মনে হয়েছিল; আজ তারা একই শাসনাধীনে নিজেদের মধ্যে লড়াই-এর জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল, পরস্পরের টুঁটি ছিঁড়ে রক্তপান করার অকারণ উগ্র ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষছিল। যুগে যুগে এই দেশে কত মনীষী, কত সাধক জন্মেছেন। তাঁরা শিক্ষা দিয়েছেন বিদ্বেষ দূর করতে, মানুষকে ভালবাসতে, পরকে আপন করে নিতে। হিন্দু ও মুসলমান, এই দুটি বিরুদ্ধ ধর্ম ও জাতির সংঘর্ষের ভিতর দিয়েই উভয় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ মনীষীরা মানুষের মৌলিক একত্বের সন্ধান দিয়েছিলেন—একদিকে কবীর দাদু নানক ও চৈতন্য এবং তাঁদের অনুবর্তীরা, অপর দিকে আউল-বাউলের দল, ফকির দরবেশ সম্প্রদায় আর সুফী ও বৈদান্তিকগণ; কিন্তু তাঁদের শিক্ষার বিফলতা দেখে সুধীগণ চিন্তিত হয়েছিলেন।

এই চিন্তাই শিবনাথের মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তাঁর মনে হয়েছিল, এই বিরোধের মূল কারণ ধর্ম। সেমেটিক গোষ্ঠীর ধর্ম ইসলাম কোন জাতির ধর্ম নয়। ইসলাম অন্যকে জয় করেই ক্ষান্ত হয় না। তাকে হজম করে নিতে চায়, কিন্তু ইসলাম হিন্দুধর্মকে গ্রাস করতে পারেনি। যে মহীরুহের মূল গভীরে তাকে নাড়া দেওয়া চলে; তাকে উৎপাটন করা সহজ নয়।

ইসলাম ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে জয়ী কিন্তু হিন্দু-সংস্কৃতির কাছে পরাজিত। ইসলামের দৃষ্টি আরবের দিকে, ভারতের বাইরের দিকে। এজন্যে মুসলমান ধর্মাবলম্বীরা এতকাল ভারতে থেকেও ভারতীয় হতে পারেনি। তারা দিনে পাঁচ বার পশ্চিমদিকে মুখ ফিরিয়ে তাদের সেই 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরি আর স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' আরবের কথা ভাবে। মক্কা তাদের ধর্মের জন্মভূমি, তাদের প্রাণের ধন। তাদের সাহিত্য শিল্প দর্শন সেমিটিক ভাবধারায় পুষ্ট। তারা ভারতকে জয় করতে না পেরে তাকে ধ্বংস করে সর্বেসর্বা হতে চাচ্ছে। গান্ধীজী বললেন, হিন্দু মুসলমান একই মায়ের যমজ সন্তান। তাদের ধমনীতে এক রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। কায়েদে আজম জিন্না বললেন, তারা দুই জাতি। তারা মিশবে না, মিশতে পারে না। তাদের সত্তা তেল ও জলের মতো পৃথক। তিনি বাইরের জিনিসকে বড় করে দেখেছিলেন স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে। এইজন্যেই কংগ্রেস গান্ধীজীর অমত সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে জোর করে প্রেম না করে তাদের পৃথক করে দিলেন।

লাইব্রেরীতে বসে গড়গড়ার নলটা মুখে দিয়ে যখন শিবনাথ মনে মনে হিন্দু ও মুসলিম বিভেদের মৌলিক কারণ উদ্ঘাটনের চেষ্টায় মসগুল, তখন শিবানী ঘরে ঢুকে বললেন, ওগো, শুনেছ, কাল থেকে নাকি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভীষণ দাঙ্গা শুরু হবে। আমার ছেলেমেয়েরা সব কলকাতায় আর হাওড়ায়। কি জানি তাদের ভাগ্যে কি আছে? ওদের বাড়ি ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা কর।

শিবনাথ মুখ তুলে দেখলেন, শিবানী মেঝের উপর বসে পড়েছেন। দুশ্চিন্তায় তাঁর মুখ কালো হয়ে গিয়েছে। শিবনাথ ধীর, স্থির। তিনি বললেন, আমিও ভাবছি, কি করা যেতে পারে। তিনি উঠলেন। ভাবলেন, স্টেশনে গেলে কোন না কোন অফিস ফেরত ডেলি প্যাসেঞ্জারের মুখ থেকে কলকাতার সঠিক সংবাদ পাবেন। কারণ দাঙ্গাই হোক আর মারামারি হোক, ধরাতল রসাতলে যাক আর না যাক, ডেলি প্যাসেঞ্জার চাকুরীজীবী বাঙালী নিশ্চয়ই অফিস যাবে। তিন ঘণ্টার মধ্যে হাওড়া থেকে মাত্র দু-তিনখানি গাড়ি এসেছে। তারা বলল, এখানে ওখানে দাঙ্গা আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। রাস্তায় একটিও পুলিস নেই। লুঠতরাজ চলেছে। হিন্দুর দোকান লুঠ হচ্ছে। যে পেরেছে সেই পালিয়ে এসেছে। গাড়িতে স্থান না পেয়ে দলে দলে লোক হেঁটে আসছে। আর কিছু পরে গাড়ি চলবে না। রাত্রে ভীষণ কাণ্ড হবে।

পাড়ায় একজন ডেলি প্যাসেঞ্জার গাড়ি থেকে নামলেন। তিনি শিবনাথকে বললেন, চিন্তার কারণ যথেষ্ট বটে কিন্তু কি করবেন আপনি? যারা যেখানে আছে তারা সেখানেই থাকুক। যেতে চেষ্টা করবেন না। আর যাবেনই বা কেমন করে? টেলিগ্রাম বা ফোন করে লাভ নেই। সুরাবর্দী সাহেব সব বন্ধ করে দিয়েছেন। আগামী কাল থেকে কলকাতা ও হাওড়ায় পাইকারী হারে হিন্দু হত্যা, হিন্দুদের দোকান লুঠ আরম্ভ হবে। কলকাতার কোন অংশে সংবাদ আদান-প্রদান বন্ধ। মফঃস্বলে টেলিগ্রাম বিলি করা নিষিদ্ধ হয়েছে। তবে আমাদের পাড়াগাঁয়ে হিন্দুর সংখ্যা বেশী। তাহলেও খুন জখম না হবে তা নয়। হিন্দুরা সঙ্ঘবদ্ধ হলে প্রতিরোধ করতে পারবে।

ডেলি প্যাসেঞ্জার প্রতিবাসীর কথা শিবনাথ শিবানীকে বললেন। শিবানী সকল বিষয়ে খুব সাহসী ছিলেন। সহজে দমে যেতেন না। অসুখ, দুঃখ-কষ্ট অভাব-অভিযোগ গ্রাহ্য করতেন না। কিন্তু দুটি বিষয়ে তাঁর দুর্বলতা ছিল। বন্যা ও মুসলমানকে তিনি ভীষণ ভয় করতেন। বর্ষাকালে যখন কংসাবতী করাল মূর্তি ধারণ করত, যখন তীরবর্তী গ্রামের লোক ঝোড়া কোদাল নিয়ে ছুটোছুটি করত এবং রাত্রিতে লণ্ঠন হাতে করে বাঁধের উপর পাহারা দিত, আর গেল গেল বলে হৈচৈ করত, তখন তাদের চিৎকার শুনে বানের জলে ভেসে-যাওয়ার ভয়ে বালিকা বধূ শিবানীর বুক দুরু দুরু করত, সে ছুটে গিয়ে রামজয়কে আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করত, বাবা, বাঁধ ভেঙ্গে বন্যার জলে আমাদের এই মাটির ঘরখানা কি ভেসে যাবে? রামজয় কৌতুকের ছলে গম্ভীর হয়ে বলতেন, এ বছরটা কোন রকমে কাটিয়ে দাও। আসছে বছর দালান তুলব। তখন আর কোন ভয় থাকবে না। কিন্তু কোন দিন আর পাকা বাড়ি তোলা হয়নি। মুসলমানরা দাঙ্গা করবে শুনে শিবানীর তালু শুকিয়ে গিয়েছিল।

সেদিন সন্ধ্যার পর দূরে অনেকখানি আকাশ লাল হয়ে উঠেছিল। মুসলমানরা হিন্দুদের ঘর জ্বালিয়ে দিচ্ছে ভেবে মেয়েরা শঙ্খ বাজাতে লাগল।

হিন্দু যুবকরা বন্দে মাতরম্ ধ্বনি তুলল। মেয়েরা চিৎকার করতে লাগল। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কান্না জুড়ে দিল। তুমুল কোলাহল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ল। যুবকরা স্ব স্ব গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাতবোমা, লাঠি, সড়কি, ইট-পাটকেল নিয়ে সজ্জিত হয়ে মুসনমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করতে প্রস্তুত হল। হিন্দুরা মনে করছে মুসলমানরা, আর মুসলমানরা ভাবছে

হিন্দুরা আক্রমণ করছে, ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। শিবানীকে মাড়োয়ারী মিল মালিকের বাড়িতে পাঠিয়ে দেওয়া হল। পাড়ার মেয়েরা মিলের ভিতর আশ্রয় নিল। মিলের বাইরে গুর্খা দারোয়ানরা অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে পাহারা দিচ্ছিল।

একজন লোক ছুটে যেতে যেতে বলে গেল, মুসলমান গুণ্ডারা গ্রাম আক্রমণ করেছে, ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিচ্ছে। হিন্দু মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচার করছে। হিন্দু পুরুষদের বেদম প্রহার করছে। কেউ কারোকে বিশ্বাস করছে না। হিন্দু ছেলেমেয়েরা মুসলমানদের ভয়ে, আর মুসলমান ছেলেমেয়েরা হিন্দুদের ভয়ে ঝোপে-ঝোপে, বনে-বাদাড়ে, পাটগাছের ভিতর আশ্রয় নিচ্ছে। রাত্রি এগারোটা নাগাত আকাশের সেই লাল আলো কোথায় মিলিয়ে গেল। লোকের আর্তনাদ থেমে গেল। লোকে সারারাত্রি জেগে কাটিয়ে দিল।

সকালে শোনা গেল, একটা চায়ের দোকান দৈবক্রমে আগুনে পুড়ে গেছে।

তিন-চার দিন হাওড়ার কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। সংবাদ পাওয়ার কোন উপায় ছিল না। রেলগাড়ি চলাচল প্রায় বন্ধ। সারাদিনের ভিতর লোকভর্তি দু-একখানি গাড়ি আসছিল। বুচকি-বোচকা নিয়ে উড়েরা দলে দলে পায়ে হেঁটে সামনের রাস্তা দিয়ে পালাচ্ছিল। শত শত হাত-কাটা পা-কাটা গলা-কাটা মড়া গঙ্গায় ভাঁটার স্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। শিবনাথ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। শিবানী কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, ওগো, আমার বংশে বাতি দিতে বুঝি আর কেউ রইল না। তিন ছেলে, মেয়ে, জামাই নাতি-নাতনী কেউ বেঁচে নেই। চোখের জলে তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছিল। শিবনাথ নির্বাক, নিস্তব্ধ! কি করবেন, কি বলবেন স্থির করতে পারছিলেন না। তিন দিন তাঁদের পেটে ভাত যায়নি। চোখে ঘুম ছিল না। শিবানী কাঁদতে কাঁদতে বললেন—হে লক্ষ্মীজনার্দন, আমি কি মহাপাপ করেছি যে আমাকে এই শাস্তি দিলে!

শিবনাথ বললেন, তুমি অত অস্থির হয়ো না। নিশ্চয়ই তারা কোন সুরক্ষিত বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তারা বেঁচে আছে। শুনে, শিবানী বললেন, ওগো! তাই যেন হয়। তারা ফিরে এলে আমি বাবা লক্ষ্মী-জনার্দনকে ক্ষীর-ভোগ দেব। সোনার বেলপাতা দিয়ে তারকনাথের পূজো দেব। শিবনাথ সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি স্থির হও। বাবাকে ডাক। আমার স্থির বিশ্বাস তারা ভালো আছে। অক্ষত শরীরে ফিরে এসে তোমাকে মা বলে ডাকবে।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের তৃতীয় দিন বিকালে একটি ছেলে কুসুমপুরের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। তাকে দেখে শিবানী চিৎকার করে উঠলেন, বল, বাবা সন্তোষ, তারা ভালো আছে তো?

শিবানীর আকুলি-বিকুলি দেখে সন্তোষ বলল, ভাববেন না। তারা সকলে নিরাপদ স্থানে ভালো আছে। একটু সুবিধা পেলেই চলে আসবে। এখন রাস্তায় বেরোতে পারা যায় না। অবাধে খুন-জখম চলেছে। আমি আপনাদের সংবাদ দিতে এসেছি। যে ভাবে এসেছি তা বলবার নয়। তারা এক উকিলের বাড়িতে অবরুদ্ধ হয়ে আছে। দোকান পাট বন্ধ। বাজারে জন-প্রাণী নেই। উকিলবাবুর কিছু চাল কেনা ছিল তাই রক্ষে। আমাকে কিছু কাঁচা তরকারি দিন। নুন ভাত ছাড়া আর কিছুই নেই। তারা না খেয়ে আছে। কথা বলার সময় নেই। আমি এখুনি যাব। পরে সব শুনবেন। এই বলে সন্তোষ এক পুঁটলি কাঁচা আনাজ নিয়ে চলে গেল।

শিবানীর বুক থেকে দুশ্চিন্তার জগদ্দল পাথর নেমে গেল। তিনি শিবনাথকে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছিলে। তারা ভালো আছে। খেতে না পেলে না হয় রোগা হয়ে যাবে কিন্তু বেঁচে থাকবে। সন্তোষ বলে গেছে অশোকও ঠনঠনের কালিতলা থেকে কোন রকমে পালিয়ে হাওড়ায় আর সকলের সঙ্গে আছে।

এর দিন চারেক পরে ছেলেমেয়েরা বাড়ি এল। অপর্ণা শিবানীকে বলল, মা, সে কাণ্ড দেখলে তোমার হার্টফেল করত। খেয়ে দেয়ে দোতলার ঘরে বসে আমরা তাস খেলছিলাম। হঠাৎ নিচে একটা গোলমাল শোনা গেল। জানলা দিয়ে যে বীভৎস ব্যাপার দেখলাম তাতে আমাদের প্রাণ ছেড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। আমাদের জানলার ঠিক নিচে গলির মাথায় দুটো মুসলমান গুণ্ডা ছুটে এসে দুটো হিন্দুস্থানীকে তলোয়ার দিয়ে কচু-কাটা করে দৌড়ে গেল। বড় রাস্তার উপর হানাহানি চলতে লাগল। আমাদের বাড়িটা পুরানো। সিঁড়ি দিয়ে সহজে উপরে উঠা যায়। দরজা জানলাগুলো কম মজবুত। একটা ধাক্কা মারলে ভেঙ্গে পড়বে। দাদারা তো হকচকিয়ে গেল। নিচের গলির রক্তের স্রোত দেখে কাঁপতে লাগল। তোমার জামাই-এর উপস্থিত বুদ্ধির জন্যে আমরা এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। অবশ্য সামনের একজন মুসলমান দোকানদার বলেছিল, বাবু! আপনাদের কোন ভয় নেই। আমি আছি। তোমার জামাই তাকে বিশ্বাস করতে পারেনি। তার নির্দেশে

আমরা স্টকেসে গয়না-গাঁঠি পুরে নিলাম। তারপর তাড়াতাড়ি বাইরের দরজায় চাবি-তালা লাগিয়ে সকলে রাস্তার ওপারে রমেনবাবুর বাড়িতে উপস্থিত হলাম। মুসলমানটি আমাদের সকলকে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল। রমেনবাবুকে আগে বলা ছিল। ওঁদের বাড়ি খুব বড় ও মজবুত। বারান্দা লোহার রেলিং দিয়ে ঘেরা। সহজে কেউ উপরে উঠতে পারবে না। তা ছাড়া ওঁদের দুটো বন্দুক ও দুটো রিভলভার ছিল। ওঁরা খুব বড়লোক। বিস্তর টাকাকড়ি। লুঠ হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাঁরা আট জন নেপালী দারোয়ান রেখেছিলেন। সব দিক দিয়ে এমন নিরাপদ স্থান আর ছিল না। বাড়িটি যেমন বিরাট ও মজবুত, তেমনি নিরাপদ। যেন একটি ছোট-খাট দুর্গ। এখানে আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম। আমাদের গায়ের একটি চুলও কেউ স্পর্শ করতে পারে নি। রমেনবাবুরা খুব ভদ্র ও দয়ালু। আমরা তাঁদের উপকারের কথা কোনদিন ভুলতে পারব না। আমাদের ওখানে যাওয়ার একদিন পরে আপনার ছোট ছেলে এসেছিল। আমরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলাম। দাঙ্গার ভিতর দিয়ে প্রাণটি হাতে করে ঠনঠনে থেকে হাওড়ায় সে কেমন করে এসেছিল তা সেই জানে।

দাঙ্গা থেমে যাওয়ার পরেও প্রায় এক মাস ছেলেরা কুসুমপুরের বাড়িতে ছিল। শিবানী শিবনাথকে বললেন, অনেক দিন থেকে আমার জন্মস্থান একবার দেখে আসার ইচ্ছা ছিল। যুদ্ধের ডামাডোলে, দুর্ভিক্ষ ও দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্যে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়া সম্ভব ছিল না। এখন চল না একবার সেই দেশটা দেখে আসি। আমার বিয়ের পর আর ওখানে যাওয়া হয়নি।

শিবনাথ রাজি হলেন।

॥ পঁয়ত্রিশ ॥

দিন দশেকের মধ্যে গানের মাস্টার আর শিবানীকে নিয়ে শিবনাথ রওনা হলেন। শিবানীর আনন্দ ধরে না। পঁয়ত্রিশ বছর পরে তিনি বাপের দেশে যাচ্ছেন। জন্মস্থান দেখবেন। অনেক দিন পরে পুরানো জায়গায় যাওয়ার সম্ভাবনা অন্তরে একটা অদ্ভুত অনুভূতি সৃষ্টি করে। কত মুখ, কত কথা, কত ঘটনা মনের কোণে আনাগোনা শুরু করে দেয়। প্রথমে গাড়ি, তারপর স্টীমার,

তারপর যাত্রীর নৌকা। চওড়া নদী ক্রমে শীর্ণ হয়ে গেছে। তাঁরা দেখলেন, নদীর একটা ঘাটে একটি ছোট ডিঙ্গি বাঁধা আছে। জলের ধারে ডাঙ্গার উপর আট-দশ বছর বয়সের একটি ছোট মেয়েকে ঘিরে কতগুলি প্রৌঢ়া আর যুবতী মরা কান্না কাঁদছে। ছোট মেয়েটির মুখ চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। সকলে ইনিয়ে বিনিয়ে সুর করে কাঁদছে। পরে বোঝা গেল, মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি যাবে। তার মা আর পাড়ার মেয়েরা তাকে বিদায় দিতে এসেছে। যেন যমের বাড়ি যাওয়ার জন্যে শেষ বিদায় দিচ্ছে। রোরুদ্যমানা রমণীদের পশ্চাতে ফেলে যাত্রীবাহী বড় নৌকাখানি স্রোতের টানে চলতে লাগল। নদীর দুদিকে চরের উপর জরাজীর্ণ বহু নৌকা অর্ধ-প্রোথিত অবস্থায় পড়ে ছিল। শিবনাথ শুনলেন, জাপানীদের ভয়ে ইংরেজ গভর্নমেণ্ট নৌকাগুলি বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছিল। এই অছিলায় তারা দেশের অভ্যন্তরে চাল-ধান জিনিসপত্র আমদানি রপ্তানির পথ রুদ্ধ করে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করেছিল। একদিকে বাংলার মুখ্য মন্ত্রী সুরাবর্দীর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, আর একদিকে বাংলার লাটের দুর্ভিক্ষ সৃষ্টির পরিকল্পনা যে দেশময় বিপর্যয় সৃষ্টি করেছিল, তার শোচনীয় সুদূর-প্রসারী পরিণাম বাঙালী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিল। তার তীব্র আঘাতে বাঙালীর সামাজিক ও নৈতিক জীবন পর্যুদস্ত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল।

নৌকা উপস্থিত হল সেবাগ্রামের ঘাটে। জল থেকে প্রায় চৌদ্দ-পনরোটি সিঁড়ি উপর দিকে উঠে গেছে। নিচের সিঁড়িগুলো বসে গেছে। উপরে চাতালের ছাদের উপর অশ্বত্থ ও বটের চারা জন্মেছে। শিকড়ের টানে ছাদটা একেবারে ভেঙ্গে পড়েনি। তবে এমন জরাজীর্ণ যে, যে-কোন মুহূর্তে হুড়মুড় করে ভেঙ্গে পড়তে পারে।

শিবনাথের মনে পড়েছিল এই ঘাটটির কথা। বর-বেশে গ্রামে প্রবেশ করার আগে তাঁর পালকি থেমেছিল এই ঘাটের চত্বরের উপর। তখনও ঘাটটি পুরাতন, তবে এতখানি জরাজীর্ণ হয়নি।

এক সময় সেবাগ্রাম সমৃদ্ধিশালী গ্রাম ছিল। রামচরণবাবুর বাবা গ্রামের লোকের স্নানের সুবিধার জন্যে ঘাটটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। এখন তাঁর বংশের কোন ছেলে বেঁচে আছে কিনা সন্দেহ। কতকাল পরে শিবানী বসেছেন চাতালের উপর। বিবাহের সময় তিনি পনরো দিন গ্রামে ছিলেন। সে আজ কত দিনের কথা। তিনি রোজ মায়ের সঙ্গে এসে এই ঘাটের সিঁড়িতে বসতেন। মা তাঁকে স্নান করিয়ে দিতেন। গামছা দিয়ে গা মুছে দিতেন।

এই ঘাটেই কনে স্নান হয়েছিল। পাড়ার কত মেয়ে শঙ্খ বাজিয়েছিল। উলুধ্বনি দিয়েছিল। গাঁয়ের কত ছেলেমেয়ে নাড়ু কুড়োবার জন্যে হুড়োহুড়ি করেছিল। তখন তিনি ছিলেন নিতান্ত বালিকা। বিয়ে কি জানতেন না। বর এসেছে শুনেছিলেন। প্রথমটা আনন্দ হয়েছিল। এত লোকজন বাজনা-বাদ্যি, আলো, শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি, হৈ-হুল্লোড় তাঁর বড় ভালো লেগেছিল। ভেবেছিলেন, বিয়ে তো বেশ মজার জিনিস। বরের সঙ্গে চলে যেতে হবে শুনে তাঁর ভয় হয়েছিল। কত কেঁদেছিলেন তিনি। বিয়ে হলে কি বাবা-মাকে ছেড়ে চলে যেতে হয়? যাকে চিনি না, জানি না তার সঙ্গে চলে যাওয়া কেন? বিয়ে হোক না। বিয়ে বেশ ভালো লাগে। চলে যেতে হবে কেন? এই ধরনের কত অর্থহীন প্রশ্ন নির্বোধ বালিকার মনে এসেছিল। তখন কেউ তার উত্তর দেয়নি। কত মর্মান্তিক কথা, কত সুখস্মৃতি বিস্মৃতির আবরণ ঠেলে তাঁর মনে উদয় হতে লাগল আজ এই পঁয়ত্রিশ বছর পরে।

তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। পল্লী-প্রকৃতি নিথর। ভাদ্রের কৃষ্ণপক্ষের নবমীর আঁধার নেমে এসেছে বাঁশঝাড় বন-জঙ্গলের উপর নিবিড় হয়ে। পথে পথিক ছিল না। টর্চটা হাতে নিয়ে মাস্টার গেছে সন্ধান নিতে। একটু পরেই ফিরে এসে বলল, চলুন আপনারা এই বাঁধের নিচে বউদিদির পিসির বাড়িতে। পিসি অনেক দিন আগে মারা গেছেন। তাঁর নাতি ও নাতবৌ আছে। নাতি বাড়িতে নেই। তারা আপনাদের কথা সব জানে। বউটি তাদের বাড়িতে যেতে অনুরোধ করেছে।

মাস্টার সকলকে নিয়ে তাদের বাড়িতে উপস্থিত হল। দশ মিনিটের ভিতর শিবানী সকলকে আপন করে নিলেন। ইতিমধ্যে তাঁর পিসির নাতি সুরেন বাড়ি এসেছে। সন্ধ্যার পর পাড়াগাঁয়ের গৃহস্থ বাড়িতে অতিথি এলে যে অসুবিধা হয় তা উভয় পক্ষের সহযোগিতা ও ভালবাসার আকর্ষণে অন্তর্হিত হল। সুরেন ছুটে গিয়ে খিড়কির পুকুর থেকে মাছ ধরে আনল। এক বাড়ি থেকে দুধ আর আলু যোগাড় করে নিয়ে এল। চা আর তেল মাখানো মুড়ি খেয়ে বাইরের দাওয়ায় বসে মাস্টার গান জুড়ে দিল। বাইরে গানের তরঙ্গ, ভিতরে মেয়েদের গুঞ্জন ও হাসির রোল আর থামে না। অনেক রাত্রে খাওয়া-দাওয়া শেষ করে তাঁরা সেদিন সেখানে রাত কাটিয়ে পরদিন সকালে শিবানীর খুড়তত ভাই-এর বাড়িতে উপস্থিত হলেন।

আগের দিন রাতে শিবানীর খুড়তত ভাই তাঁদের আসার কথা শুনে

শিবানীকে ডেকে সুরেনের বাড়ির সামনে সাধারণের রাস্তার উপর তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিল। বলেছিল, সুরেনের সঙ্গে তার মনোমালিন্য আর দলাদলি চলছিল। এজন্যে সে ও বাড়িতে যাবে না। গ্রামে মাত্র তিন ঘর বামুনের বাস। তাদের ভিতর দুটো দল। শিবনাথ শুনে যেমন আশ্চর্য তেমনি চিন্তিত হলেন। গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হয়ে গেছে। ঝোপ-জঙ্গল বাঁশঝাড়ের রাজত্ব। যে দিকে তাকানো যায় সে দিকেই জঙ্গল দৃষ্টি রোধ করে আছে। এখানেও এরা তুচ্ছ বিষয় নিয়ে দলাদলি করে মরছে। দলাদলি কি বাংলা দেশের পল্লীগ্রামের রীতি? ইংরেজরা দেশ ছেড়ে চলে যাবে কথাবার্তা হচ্ছে। ভারতবর্ষ নাকি স্বাধীন হবে। হিন্দু-মুসলমানের ভিতর তো খণ্ড যুদ্ধ লেগেই আছে। তার উপর আবার হিন্দুর সঙ্গে হিন্দুর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছে। দেখা যাক স্বাধীনতার সোনার কাঠির স্পর্শে এইরূপ মনোভাবের কিছু পরিবর্তন হয় কি না। শিবনাথের সন্দেহ হয়। যে ভাবে স্বাধীনতা আসছে তাতে মানুষ বোধ হয় আরও বেশী উগ্র হয়ে উঠবে। দেশের বৃহত্তর স্বার্থ অবজ্ঞাত হবে।

এ বাড়িতে আসা অবধি শিবানী মনের আনন্দে বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সদর পুকুরের ভাঙ্গা জীর্ণ ঘাট আর তার পাশে হেলে-পড়া শিবমন্দির তেমনই আছে। যে বাড়িতে তাঁর বিয়ে হয়েছিল তার কোন চিহ্ন নেই। আট দশ ঘর জ্ঞাতি ছিল। তাদের বাড়ির কোন হদিস মেলে না। জঙ্গলে ভর্তি ভিটেগুলো পড়ে আছে। ঘুরতে ঘুরতে শিবানী এক বুড়ীর কুঁড়েতে এসে পড়লেন। তিনি বুড়ীকে পরিচয় দিলেন। বুড়ী বলল, ওমা, তুই সেই শিবি? তুই এখন গিন্নি-বান্নী হয়ে গেছিস? আমি যে তোর নাড়ী কেটেছিলাম রে! বিকেল থেকে তোর মায়ের ব্যথা উঠেছিল। তোর বাবা আমাকে সন্ধ্যের সময় খবর দিল। ভোর পর্যন্ত আমি আঁতুড়ঘরে বসেছিলাম। তুই আমার হাতের উপর হয়েছিলি। আমিই তোর নাম শিবি রেখেছিলাম। তোর মার বয়স তখন কুড়ি-একুশ। সকলেই বলেছিল তোর মা বাঁজা। আমি বলেছিলাম, না গো না, অঘোরের ছেলে হবে। মেয়ে হয়েছে শুনে তোর মা বলেছিল, এই মেয়েই আমার ছেলে। আমি মেয়ে প্রসব করে ছেলে পাব। আয় মা, আয়। এই পিড়িটায় বোস। ভাগ্যে বেঁচে-ছিলাম। তোর সঙ্গে দেখা হল। হাঁ মা, তোদের ওখানে যুদ্ধ হয়েছিল? আকাল হয়েছিল?

শিবানী হেসে বললেন, আমাদের ওখানে আরও বেশী হয়েছিল। আকাশ থেকে বোমা পড়ত। কলকাতার কাছে কি না? শত্রুরা তাই ওখানে বেশী অত্যাচার করেছিল। আকালের সময় কত লোক মরে গেল।

—আচ্ছা মা, মুখপোড়ারা আকাশ থেকে অমন আগুন ছুড়ে ফেলে কেন? ওদের কি কোন জ্ঞান-গম্যি নেই? সামনা-সামনি যুদ্ধ কর না, বাপু, বুঝি কার কত তেজ। অমন চুপি সাড়ে লোক মেরে বাহাদুরি করিস কেন?

বুড়ীর কথা শুনে শিবানী বললেন, কি বলব মা? আজকাল যুদ্ধ ঐ রকমই হয়েছে।

—আমরা যাত্রায় দেখেছি দুজনের মধ্যে সামনা-সামনি যুদ্ধ হচ্ছে। একজনের অস্ত্র ভেঙ্গে গেল। তখনই তাকে আবার অস্ত্র দেওয়া হল। নইলে সে দিনের মতো যুদ্ধ বন্ধ থাকল। পরে দুজনেই অস্ত্র নিয়ে আবার যুদ্ধ করল। সেকালে দেবতা কি মানুষের যুদ্ধে এই রকম হ'ত। আজকাল হল কি? ঘোর কলিকাল। মানুষ আর মানুষ নেই, মা, পশু হয়ে গেছে।

বুড়ী কিছুতেই ছাড়তে চায় না। বলে, দু-একটা দিন থাক। শিবানী বলেন, বাড়ি থেকে দুজনে চলে এসেছি। ছেলেরা বাড়িতে নেই। বউয়েরা আছে। কালই যেতে হবে। চল না, মা, আপনার জামাইকে দেখে আসবেন। বুড়ী ধড়মড়িয়ে উঠে একখানা ভালো কাপড় পরে জামাইকে দেখবার জন্যে শিবানীর সঙ্গে এ বাড়িতে এল। শিবনাথকে দেখে বলল, যেমন রানীর মতো মেয়ে, তেমনি রাজার মতো জামাই। তোদের বিয়ের দিন আমি বলেছিলাম, ও অঘোর, দেখে আয়। তোর রাজা জামাই এসেছে। শিবানী হেসে বললেন, বুড়ো জামাই-এর এত সুখ্যাতি।

—ছেলে কখন মায়ের কাছে বুড়ো হয়, মা? তোরা বাপু যা মুখে আসে তাই বলিস। বলে, বুড়ী একটু রাগ করতে লাগল। সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত বুড়ী ওখানে ছিল। বিদায় নেবার সময় শিবানী পাঁচটি টাকা তার হাতে দিলেন। বুড়ী সকলকে আশীর্বাদ করতে করতে চলে গেল।

শিবানী খুড়তত ভাইকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আচ্ছা দাদা, তুমি আমার খোঁজ খবর নাও নি কেন? তুমি কি ভেবেছিলে আমি নেই? ভাগ্যিস এসেছিলাম তাই দেখা হল।

—আমি তোদের সংবাদ রাখি। দাদার বই এখানকার স্কুলেও পড়ানো হয়। আমার আনন্দ হয়। ছেলেদের বলি, জানিস্ তোরা কার বই

পড়ছিস্? তিনি আমাদের আপনার লোক। তারা বিস্ময়ে আমার দিকে চেয়ে থাকে।

—তবে একবারটিও তো যাও না?

—তোর কাছে যেতে বড় লজ্জা করে।

—কেন, লজ্জা কিসের? ছোট বোনের বাড়ি দাদা যাবে, তাতে লজ্জা কি?

—তোর সম্পত্তি আমি অপহরণ করেছি।

—সম্পত্তি? আমার সম্পত্তি?

—কেন, কাকাবাবুর জমি, বাস্তুভিটে?

—আমার দুর্বুদ্ধি হয়েছিল। সেটেলমেণ্টের সময় আমিনকে ঘুষ দিয়ে কাকাবাবুর সম্পত্তি নিজের নামে করে নিয়েছিলাম।

হাকিমকে বললাম, কাকার কোন উত্তরাধিকারী নেই। কাকা ও কাকী মারা গেছেন। তাঁর একটি মেয়ে ছিল, শিশু অবস্থায় সেও মারা গেছে। আমিই বংশের একমাত্র উত্তরাধিকারী। কাকার সম্পত্তি আমার নামে লিখে দিন। আমি পরচা পেয়ে গেলাম।

শিবনাথ বললেন, আপনি জানতেন, আপনার বোন বেঁচে আছে?

—হাঁ, জানতাম তো বটেই। শিবি বেঁচে আছে। আপনি আছেন। খোঁজখবর নিয়ে সব জেনেশুনে আমি সম্পত্তির লোভ সম্বরণ করতে পারিনি। ফাঁকতালে কাকাবাবুর সম্পত্তি হস্তগত করেছিলাম।

—তা নিয়েছেন, ভালোই করেছেন। দশ-পনরো বিঘা সম্পত্তির জন্যে কে এই ধাপধাড়া গোবিন্দপুরে আসত, বলুন?

—কেউ আসুক আর না আসুক, আমি তো অন্যায় করেছি। বোন-ভগ্নীপতি আর ভাগ্নেদেরও বঞ্চিত করেছি—জেনেশুনে প্রতারণা করেছি। এই বলে তিনি অনুতপ্ত হলেন।

ওঁর চোখে জল দেখে শিবানী বললেন, আমার ছেলেপুলেরা জমি ভোগ করত। না হয় আপনি ভোগ করছেন। তাতে ক্ষতি কি?

তিনি পাগলের মতো চেঁচিয়ে উঠলেন, ক্ষতি হয়নি? যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। ছোটবোনের মুখ থেকে তো আহার কেড়ে নিয়েছিলাম। ভোগ করল কে? জমি কোথায় গেল? তোকে প্রতারণা করার এক মাসের মধ্যে বাড়িতে কলেরা ঢুকল। পর পর তিনটি ছেলে, একটি মেয়ে তিন

দিনের মধ্যে মরে গেল। তারপর তোর বউদিদির ক্ষয়কাশি দেখা দিল। চার-পাঁচ বছর ভুগল। সব জমি বিকিয়ে গেল। নিজের জমিও গেল। বাস্তুভিটে আর ঘরটুকু ছাড়া আর কিছু রইল না। দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লাম। কলকাতায় সকলের অন্নের সংস্থান হয়। জহরলাল পান্নালালের দোকানে চাকরি নিলাম। একদিন তোর মেজছেলে দোকানে কাপড় কিনতে যায়। পাকে-প্রকারে কথা-বার্তায় বুঝতে পেরেছিলাম সে তোর ছেলে। আমি খুঁটিয়ে তোদের কথা জিজ্ঞাসা করছি দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল। আমি বলেছিলাম, শিবনাথবাবুর নাম শুনেছি কিনা? এইজন্যেই জিজ্ঞাসা করলাম। তোর বাড়ির ধারের স্টেশন দিয়ে কতবার যাতায়াত করেছি। কতবার মনে করেছি, তোর সঙ্গে দেখা করি। এমন কি একবার গাড়ি থেকে নেমেই পড়েছিলাম। কিন্তু লজ্জায়, ঘৃণায় যেতে সাহস পাইনি। পাপ-মন নিয়ে তোদের কাছে মুখ দেখাতে বিবেকে বেধেছিল।

শিবনাথ বললেন, ঐ তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে আপনি অত ব্যথিত হচ্ছেন কেন? জমি আছে জানলেও আমরা কোনদিন এতদূরে জমি দখল করতে আসতাম না। ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যেই, জানবেন।

—কী ভালো হল, দাদা? সম্পত্তি গেল। ভোগ করবার মানুষ গেল। বেনো জল ঢুকে ঘোলা জল বের করে নিল। আমি শ্মশানে বসে আছি। এখন চাষীর দুটো ছেলেকে এনে কাছে রেখেছি। ওরা একমুঠো ভাত দিচ্ছে। চাষীকে মনে পড়ে তো? সে মারা গেছে, শুনেছিস্?

তারপর শিবানীর হাত দুটো ধরে বললেন, শিবি, তুই, দিদি আমাকে ক্ষমা কর। তুই হঠাৎ এসে পড়েছিস্। ভগবান তোকে শান্তির দূত করে পাঠিয়েছেন। ক্ষমা কর, ভাই, ক্ষমা কর।

কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ বেরিয়ে পড়ল। বহুকাল অদর্শনের পর মিলনের আনন্দ এই পরিণতি লাভ করবে, কেউ ভাবে নি। দাদার ক্ষমা প্রার্থনায় ও অনুতাপে শিবানী অভিভূত। শিবনাথ নিস্তব্ধ! মাস্টার নির্বাক!

কতক্ষণ পরে শিবানী বললেন, দাদা, এতকাল পরে বাবার সম্পত্তির খোঁজ নেওয়ার জন্যে আমি আসিনি। স্বপ্নেও এ ধারণা মনে স্থান পায়নি।

আমি বাবার ভিটে দেখতে এসেছিলাম। এই আমার সুখ। তোমাকে দেখতে পাব ভাবিনি। ও-সব অপ্রিয় কথা আর আলোচনা করো না। আমি সরল-মনে সন্তুষ্ট-চিত্তে বলছি, তোমার উপর আমার কোন অভিমান বা দুঃখ নেই। আমার বাবার ভিটেয় তুমি এখনো সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালছ। এই আমার আনন্দ, শান্তি ও সুখ।

ভাই-বোন নিরস্ত হলেন। ভাই বললেন, তুই আমাকে ক্ষমা করেছিস্, শিবি। অনেকদিন পরে আজ থেকে আমি শান্তিতে ঘুমোতে পারব। বলে, তিনি সকলের খাওয়া-দাওয়ার জোগাড় করতে উঠে গেলেন।

মাস্টার বলল, দেখুন, দাদা, ধর্মের ঢাক আপনিই বাজে। কোথা থেকে কি হয় বলা যায় না।

শিবনাথ বললেন, শুধু বাজে নয়, বেজে ফেটে যায়। লোভ বা স্বার্থ-সিদ্ধির বশে মানুষ কত গর্হিত কাজই না করে। যাদের সুবুদ্ধির উদয় হয় তারা শেষ পর্যন্ত অনুতপ্ত হয়, শান্তি পায়।

মাস্টার বলল, এ যেন গরু মেরে জুতো দানের ফলের মতো। জেনে-শুনে অনিষ্ট করার পর অনুতাপের ফল কি ?

—নাই-মামার চেয়ে কানা-মামা ভালো। অন্যায় করে অন্যায় স্বীকার করা উদারতার লক্ষণ। দুর্বল মুহূর্তে মানুষ গর্হিত কাজ করে ফেলে। শোধরানোর চেষ্টা তো ভালো। ভুল স্বীকার করলে মনে শান্তি আসে।

—হাঁ, মন্দের ভালো। তবে অনুশোচনার কি পাপ ঢাকা পড়ে ?

—পড়ে বৈকি ! মানুষই পাপ করে। মানুষ গাছ-পাথর নয়। মানুষ আছে, সমাজ আছে, সৎভাব আছে, সৎকাজের প্রেরণা এখনও শুকিয়ে যায় নি। সৃষ্টির মহাকাব্য তাই এত মধুর, এত সরস, এত সুন্দর, এত মহান্ !

শিবানী চুপ করে তাদের কথা শুনছিলেন !

বাড়িতে কোন স্ত্রীলোক ছিল না। পুরুষ-মানুষের ঘরকন্না। শিবানীর দাদা রান্না করছিলেন। ভাগ্নেরা সাহায্য করছিল। তাদের কষ্ট দেখে শিবানী হেঁসেলে গিয়ে বললেন, দাদা, আমি উপস্থিত থাকতে তোমরা কষ্ট করবে কেন ? একটা মেয়েছেলে বসে খাবে আর পুরুষ-মানুষ রাঁধবে ? এ আমি দেখতে পারি না। দাদা বললেন, তুই একদিন রেঁধে দিলে কি আমার কষ্টের লাঘব হবে ? বরং দাদার হাতের রান্না খেলে কোনদিন

তোর গরীব দাদাকে ভুলতে পারবি না। আমি ভালো রান্না করতে পারি। মানুষ অভ্যাসের দাস।

—বুড়ো বয়সে এত কষ্ট কর কেন? বড় ভাগ্নেটির বিয়ে দিয়ে বউ নিয়ে এস।

—হাঁ, তাই করব মনে করছি।

সকলের কাছে বিদায় নিয়ে তারা ভোরে স্টীমার ধরার জন্যে রাত্রে খেয়ে-দেয়ে ছোট নদীতে নৌকায় দশ মাইল দূরে স্টেশনে উপস্থিত হল। তারা শুনল, স্টীমারের কল বিগড়ে গিয়েছে। সেদিন স্টীমার ছাড়বে না। তেপান্তরের মাঠে একদিন আর একরাত্রি গাছতলায় পড়ে থাকা উচিত নয় ভেবে তারা একখানি নৌকা ভাড়া করল।

নদীপথে পনরো মাইল নৌকায় যেতে হবে শুনে শিবানী আঁৎকে উঠলেন। তিনি কোনদিন নৌকায় চড়েন নি। সাঁতার জানেন না। তিনি মরতে ভয় পান না। তবে জলে ডুবে মরতে পারবেন না। নাকে কানে মুখে জল ঢুকে দম বন্ধ হয়ে যাবে, তা তিনি ভাবতে পারেন না। ডাঙ্গার উপর জন্মেছেন, ডাঙ্গার উপর মরবেন। জলে ডুবে মরতে যাবেন কেন? ডাঙ্গার অভাব আছে নাকি? তাঁর আকুলি-বিকুলি দেখে শিবনাথ বললেন, নৌকায় গেলে যে ডুবে মরতেই হবে, তা কে বলেছে? দেখ না, কত ছেলেমেয়ে, কত ছোট ছেলে, কত পুরুষ নৌকায় উঠে বসল। ওদের কি জীবনের মায়া নেই?

—ওদের অভ্যেস আছে। চিরকাল আমি জলকে ভয় করি। সাঁতার জানি না।

মাস্টার হেসে বলল, আপনি জলে নামবেন কেন? নৌকার উপরে থাকবেন।

—এত বড় চওড়া নদী। এতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে। কত জীবজন্তু আছে। বড় বড় ঢেউ ওঠে। এ কি আমাদের কংসাবতী? বালি তর তর করছে? তলা পর্যন্ত আয়নার মতো দেখা যায়। মাত্র এক হাঁটু জল। কোথাও গোড়ালি ডোবে না। তার জলে বসে ঘটি ঘটি জল তুলে মাথায় ঢেলে চান করা হয়। দ-ছাড়া কোথাও ডুব জল থাকে না। কোনদিন আমি দ-এর দিকে যাই নি। এই নদীর এপার-ওপার দেখা যায় না। বর্ষাকালে কংসাবতী মাঝে মাঝে একটু ক্ষেপে ওঠে, কিন্তু

তাও অল্প সময়ের জন্যে, দু-এক মাস। তারপর শুকনো। কিন্তু এই নদী? এ কী নদী? এ তো সমুদ্দুর। সমুদ্র কোনদিন দেখি নি। শুনেছি তার দিশ্‌ পিশ্‌ নেই। কংসাবতীকে দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছে করে, আর একে দেখলে ভয়ে বুক কাঁপে। আমি নৌকায় উঠব না। এইখানে ঐ চালায় পড়ে থাকব। কাল স্টীমারে যাব।

শিবানী বেঁকে বসলেন। মাস্টার বোঝাতে যায়। দাবড়ি খেয়ে চুপ করে। বেগতিক দেখে শিবনাথ নিস্তব্ধ। অন্য একখানি নৌকার তিন্‌-চারটি মেয়ে বলল, আপনার ভয় নেই, মা! চলুন। নদী এখন পুকুরের মতো শান্ত। আপনি জলের দিকে তাকাবেন না। চোখ বুজে শুয়ে থাকুন। ভাঁটার টানে নৌকা দু ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবে।

সত্যই নদীতে ঢেউ ছিল না। শিবানী চোখ বুজে মাথায় কাপড় জড়িয়ে শুয়ে পড়লেন। ভাটার টানে নৌকা তীরের মতো বেগে চলতে লাগল। ঘণ্টা তিনেকের ভিতর গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেল। 'ঐ ঘাটে নৌকা ধর, ঐ ঘাটে নৌকা ধর' যাত্রীদের কথা শুনে শিবানী উঠে বসলেন। দেখলেন, নৌকা ঘাটে ধরেছে।

তাঁকে লক্ষ্য করে মাস্টার বলল, বউদিদির কি সলিল সমাধি হল? আহা! মানুষটা নাকানি-চোবানি খেয়ে অকালে মারা গেল!

শিবানী নৌকা থেকে উঠে ডাঙ্গার উপর দাঁড়িয়ে নির্ভয়ে হাসতে লাগলেন। শিবানী আর শিবনাথ কুসুমপুরের বাড়িতে এলেন। মাস্টার দেশে চলে গেল।

॥ ছত্রিশ ॥

বৈশাখ মাস। মাস্টারের ছেলের পইতে হবে। শিবনাথ শিবানীকে নিয়ে দেশে এসেছেন। মাস্টারের অনুরোধে শিবানী তার ছেলের উপনয়নের সমস্ত খরচ দিতে রাজি হয়েছেন। তাঁকে ছেলের ভিক্ষা-মা হতে হয়েছে। ছেলেরা কেউ আসে নি। উপনয়ন শেষ হয়ে যাওয়ার পরেও শিবনাথ ও শিবানী ওখানে আরও কয়েকদিন রইলেন।

একদিন দুপুরে বাড়ির সকলে ঘুমোচ্ছিল। শিবানী একা তাঁর শ্বশুরের

ভিটে দেখতে গেছেন। জীর্ণ ভগ্ন বাড়ি। ছাড়া গরু চালের খড় টেনে খেয়েছে। ছাঁচের কামড়া বেরিয়ে পড়েছে। রামনাথ সপরিবারে কলকাতায় থাকে। সদর দরজায় চাবি দেওয়া। বাগান গাছ-পালা পুকুরের সে জলুস নেই। সব যেন ছন্নছাড়া, ফাঁকা ফাঁকা। চারদিক খাঁ খাঁ করছে। রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। দুটো গরু গাছের শীতল ছায়ায় শুয়ে জাবর কাটছে। দু-চারটে ছাগল এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই তাঁর শ্বশুরের বাস্তুভিটে। যেন শ্মশানপুরী! এর প্রতি ইঞ্চি স্থান তাঁর নখ-দর্পণে আছে। এর প্রতিটি গাছ তাঁর কৈশোরের লীলা সহচর। এর প্রতিটি ধূলিকণা তাঁর পরিচিত। শুধু স্থানটা পড়ে আছে। গোটা কয়েক বড় গাছ দাঁড়িয়ে আছে। ঐ সেই আঁকাবাঁকা পল্লীপথ। এর উপর দিয়ে একদিন তিনি বালিকা-বধূ-বেশে স্বামী-গৃহে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন। ঐ অপ্রশস্ত পথ ধরে ঘোমটা-মাথায় তিনি কংসাবতী থেকে জলভর্তি কলসী নিয়ে বাড়ি ঢুকতেন। ঐ সেই ঢেঁকিশালের দাওয়া, যেখানে দুপুরে ভব-তারিণী মাদুর পেতে শুতেন, আর তাঁর ছোট বউটি মাথায় পাকা চুল তুলে দিত। যে খিড়কি পুকুরের ঘাটে তিনি বাসন মাজতেন, জল তুলতেন, তার জল এখন শুকিয়ে গেছে। যে জামরুল গাছটার ডালে উঠে চঞ্চলা পাকা সুস্বাদু রসভরা ফল পাড়ত, আর তিনি ফল কুড়িয়ে কোঁচড় ভর্তি করতেন, এবং ঝোপের ভিতর লুকিয়ে বসে তার সদ্ব্যবহার করে নিদাঘ-তপ্ত ক্রীড়া-ক্লান্ত-দেহের অবসাদ দূর করতেন, সেই গাছটা এখনও তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পত্রপল্লবের সে শ্যামলতা নেই। তার গায়ের ছাল এবড়োখেবড়ো, শুষ্ক। যে তেঁতুল গাছটার পাশ দিয়ে বাঁশবনের ভিতর দিয়ে গিয়ে তারা ঘোষালবুড়ীর রান্নাঘরের পান্তাভাত আর মাছের টক চচ্চড়ি চুরি করে খেয়েছিল, সে গাছটা এখনও দাঁড়িয়ে আছে। ঘরের সামনের 'দলিজ'টাও আছে। সেখানে বসে রামজয় বিনিদ্র মধ্যাহ্নে শনের দড়ি কাটতেন, কুশের আসন বুনতেন, গরুর দড়ি পাকাতেন, গরু বাঁধার জন্যে ব্যাঁখারির 'ম্যাক' তৈরি করতেন। সুখদুঃখের কত চিত্র, কত পুরাতন কথা, কত স্মৃতি তাঁর মনে ভীড় করে এসেছিল। এই জনশূন্য পরিত্যক্ত স্থানটুকু কত মধুর, কত পরিচিত, কত আপনার। তিনি আনমনা হয়ে বসে পড়েছেন বড় মোটা জামগাছের ছায়ায়। তার মগডালে বসে দুটো নাম-না-জানা পাখি যেন কি বলাবলি করছিল। পুকুর পাড়ে বাঁশঝাড়ের

পাশে বাদাম গাছের ডালে বসে একটা কোকিল কুহু গান করে যেন মধ্যাহ্নের রিক্ততাকে সরস করে তুলছিল। একটা শালিক তাঁর পাশ দিয়ে যেতে যেতে যেন বলছে—তুমি কাদের বাড়ির মেয়ে গো? তুমি তো বামুনদের বড় বউ! আমি তোমায় চিনি গো চিনি।

দুপুরের তন্দ্রা ভেঙ্গে যাওয়ার পর শিবনাথ শিবানীকে মাস্টারের বাড়িতে দেখতে না পেয়ে তাঁকে খুঁজতে খুঁজতে এসে পড়লেন তাঁদের পরিত্যক্ত ভিটায়। দূর থেকে তাঁকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এসে বললেন, তুমি এখানে? ঠিক দুপুরবেলা একা বসে কি করছ? ভয় পায় নি তোমার? কেউ কোথাও নেই এই নির্জন পুরীতে।

শিবানী হেসে বললেন, ভয় কিসের? এ তো আমার চিরপরিচিত স্থান, আমার ছেলেবেলার খেলাঘর, কৈশোরের কর্মভূমি, মুকুলিত যৌবনের পুষ্পিত উপবন।

—তোমার ভিতর এত কবিত্ব কোথায় ছিল? তোমার উচ্ছ্বাস দেখে আমি অবাক্ হয়ে গেছি! কোনদিন তো একটা কবিতা বা একখানা নভেল পড় নি।

শিবানী সহাস্যে বললেন, তোমার মুখেই তো শুনেছি মানুষ মাত্রই স্বভাব কবি। তুমিই তো বলেছ, প্রেম-ভক্তি-ভালবাসা প্রভৃতি ভাব দিয়েই বিধাতা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। যাদের উপর মা সরস্বতীর কৃপা হয় তারা মনের ভাবকে লেখায় প্রকাশ করতে পারে। অপরে তা পারে না। তারপর তামাশা করে বললেন, তোমার মতো অত বড়ো পণ্ডিতের স্ত্রী কবি হতে বাধ্য। আমার তো বই-পড়া বিদ্যে নেই বললেও চলে। তোমাদের কাছে শুনে শুনে যা কিছু শেখা।

—পড়লে না কেন?

—আট বছর বয়স থেকে তো আমি পাড়াগাঁর বউ। সেকালে বউরা বই ছুঁতে পারত না, পড়া তো দূরের কথা।

—তা আমি জানি। এখন কি করবে বল?

—অনেকদিন পরে এই স্থানটিকে নতুন করে পেলাম। কাল চলে যাব। চল, একটু বেড়িয়ে সব দেখে আসি।

—কোথায় যেতে চাও?

—আগে বড়ঠাকুরঝির বাড়ি যাব। তারপর কংসাবতী দেখব।

—আচ্ছা, চল।

তারপর তাঁরা দুজনে শশিভূষণের বাড়ি গেলেন। তাঁর সে দোতলা টিনের বাড়ি নেই। প্রাচীর-ঘেরা প্রশস্ত উঠন নেই। ঠাকুর ঘর ভেঙ্গে পড়েছে। তাঁদের আসতে দেখে ভিটার এক কোণে একটা ছোট কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল দুর্গাচরণের বিধবা বউ কালিন্দী আর তার একটি কঙ্কালসার উলঙ্গ ছেলে। কালিন্দীর পরনে ময়লা থান। তাঁদের দুজনকে আসতে দেখে কালিন্দীর আনন্দের সীমা ছিল না। বসার জন্যে দুজনকে দুটো পিঁড়ি পেতে দিল। শিবানীকে পান-দোক্তা দিয়ে আপ্যায়িত করে বলল, ঠাকুরঝি, অনেক কাল পরে গরীবের বাড়িতে পায়ের ধুলো দিলি। কি খেতে দেব, বল। আমার তো, ভাই, বিদুরের সংসার। খুদ-কুঁড়ো ছাড়া তো আর কিছুই নেই। আচ্ছা, পান্তাভাত খাবি? বেশ টক টক পান্তা আর ফলিত জলের মতো আমানি আছে। খাস তো বল। খর খর নুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে পোস্তর বড়া ভেজে দি। শিবানী বললেন, তোর বাড়িতে কবে পোস্ত বড়া দিয়ে টক পান্তা খেয়েছিলাম এখনও মুখে লেগে আছে।

—ঠাকুরজামাই বসে সিগারেট খান। আমি এখুনি উননে শুকনো বাঁশপাতা জেলে পোস্তর বড়া ভেজে আনছি। কালিন্দী আনন্দে লাফাতে লাফাতে চলে গেল।

শিবানী বললেন, দেখ, একদিন এই বাড়িতে ঠাকুরজামাই কত জাঁক-জমক করে দুর্গাপূজা করতেন। কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, গলায় বেল-পাতার মালা, হাতে কাতান নিয়ে তিনি গম্ভীরস্বরে 'মা, মা' বলতে বলতে পাঁঠা বলি দেবার জন্যে ঠাকুরঘর থেকে বেরিয়ে আসতেন। সে দৃশ্য মনে পড়লে আমার গা কাঁটা দিয়ে উঠে। আর মনে পড়ে পূজোর সময় তাঁর কাছ থেকে একখানি চওড়া-পাড় শাড়ি পাবো বলে আমি কেমন সারা বছর উদগ্রীব হয়ে বসে থাকতাম। আজ তাঁরই আদরের বউ কালিন্দীর অবস্থা দেখে আমার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে।

শিবনাথ বললেন, চিরদিন কারোর সমান যায় না। শশীবাবুর দুগ্রস্থ বাড়ি ছিল। চল্লিশ-পঞ্চাশ বিঘা ধানজমি ছিল। বছরে পাঁচ শ টাকা খাজনা আদায় ছিল। কত ধুমধাম করে দুর্গোৎসব করতেন।

শিবানী দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বললেন, কেন এমন হল? সে সব

কোথায় গেল? এখন ঐ ভাঙ্গা কুঁড়ে আর নড়নড়ে ঠাকুরঘর পড়-পড় হয়েছে।

—তিনি উকিলের মুহুরি ছিলেন। তাঁর আয় একটা উকিলের আয়ের চেয়ে বেশী ছিল। তিনি দুর্দান্ত লোক ছিলেন। কত বিধবার চোখের জল ফেলে জমি করেছিলেন। কত মক্কেলের টাকা ফাঁকি দিয়ে উপায় করতেন। তিনি বালির উপর ঘর ফেঁদেছিলেন। অন্যায় কাজের অনিবার্য ফল এই!

এখন ভেবে দেখ বাবার কথা। তাঁর সেই সাত বিঘা জমি আজ এক শ বছর আছে। তিনি জীবনে একটা মিথ্যা কথা বলেন নি। একবারও আদালতে যান নি। কারোর একটি পয়সা ধার রেখে মরেন নি। শশীবাবু যখন অন্যায় করতেন তখন বাবা ভয়ে কাঁপতেন!

কালিন্দীর গলার আওয়াজ পেয়ে তাঁরা চুপ করে গেলেন। কালিন্দী ঠাঁই করে একটা মেটে পাথরের খোরায় টক পান্তা আমানি আর একটা বাটিতে খান পনরো পোস্ত ভাজা সাজিয়ে শিবানীকে খেতে দিল। এক গ্লাস বাতাসার সরবৎ শিবনাথের হাতে দিল। খাওয়া শেষ করে শিবানী বললেন, বউ, তোর পরার কাপড় নেই, দেখছি। এখন এই দশটা টাকা রাখ। আমি গিয়ে নতুন কাপড় পাঠিয়ে দেব। তাঁরা বিদায় নিলেন।

কালিন্দীর বাড়ির পাশে কংসাবতীর বাঁধ। একটু দূরেই নদী। তাঁরা জলে নামলেন, মুখ হাত ধুলেন। শিবানী বললেন, দেখ, এখানকার সব জিনিসই বদলেছে, বদলায় নি শুধু এই নদী। ছেলেবেলা যেমনটি দেখেছি এখনও তেমনি আছে। এর ঝির্‌ঝিরে কাকচক্ষু জলের স্রোত তেমনিভাবে বালুর উপর দিয়ে নিঃশব্দে গড়িয়ে চলেছে। স্নানের সময় ওই দ-র কালো জলে একদিন গা ডুবিয়ে বসেছিলাম। চাঁড়াল-বুড়ো গরু বাঁধতে এসে আমাকে দেখে বলেছিল, ও মা, খুকী তুমি কাদের বাড়ির বউ গো? দ-র জল থেকে উঠে যাও। ওখানে পাথর আছে; মানুষকে গভীর জলে টেনে নিয়ে গিয়ে তার বুকের উপরে বসে রক্ত চুষে খায়। বুড়োর কথা শুনে আমি ভয়ে ধড়মড়িয়ে উঠে এসেছিলাম। স্নান করতে এসে আর কোনদিন ওদিকে যাই নি।

শিবনাথ বললেন, ভালোই করেছিলে। নদীর জলে কত কি জন্তু থাকে তা বলা যায় না। বন্যার সময় সমুদ্র থেকে উজান বেয়ে হাঙ্গর কুমীর

উঠে আসে। বন্যার জল ভাঁটিয়ে গেলে তারা আর সমুদ্রে ফিরে যেতে পারে না। দ-র গর্তে থেকে যায়। পাথর না হোক কুমীরও তো টেনে নিয়ে যেতে পারত।

তাঁরা দুজন এক হাঁটু জলে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন। এমন সময় গানের মাস্টার দাদা ও বৌদিদির খোঁজে এসে হাজির হয়েছে। সে দূর থেকে দেখল, তাঁরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন। শিবানীর পরনে একখানি চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি। সীমন্তে সিঁদুর। অস্তগামী সূর্যের সোনালী আভা তাঁর মুখের উপর পড়েছে। এই শুচিশুভ্র মাতৃমূর্তি দেবী প্রতিমা দেখে বিস্মিত হয়ে সে থমকে দাঁড়াল। শিবানীর এমন রূপ সে আর কোনদিন দেখে নি। তারপর অগ্রসর হয়ে বলল, আপনারা যুগলে এখানে? আমি চারদিক খুঁজে মরছি! ভাবলাম, দাদা বোধ হয় বৌদিদিকে নিয়ে কোথায় ভেসে পড়লেন! শিবনাথ বললেন, ভাসবো আর কোথায়? ভাসার মতো জল নদীতে নেই।

—লোকে বলে, গাই-বাছুরে ভাব থাকলে বনে গিয়ে দুধ দেয়। কথাটা সত্যি দেখছি।

—এ তো ছাড়া গরু নয়, বাঁধা গরু। গোয়ালেই দুধ দেয়। কষ্ট করে বনে যেতে হবে কেন?

শিবানী হেসে বললেন, কেমন? উত্তরটা ঠিক হয়েছে তো?

—ঠিক হবে না? দাদা পণ্ডিত লোক। ওঁর সঙ্গে কথায় পারবার জো আছে?

শিবনাথ বললেন, কেন, কাজে কি আমি কম?

—সত্যি বলছি, দাদা আমি তো মুখ্যু মানুষ। আপনার গুণের কথা বলা আমার সাজে না। আমাদের এই দু-তিনটে জেলায় আপনাকে জানে না কে? আত্ম-পরিচয় না দিয়েও আমি অনেক পণ্ডিতকে আপনার প্রশংসা করতে শুনেছি। অধ্যাপনায়, গান-রচনায়, প্রবন্ধ-লেখায় আর বক্তৃতায় এ অঞ্চলে আপনার জুড়িদার নেই। কত ছেলে আপনার বই পড়ে মানুষ হয়ে গেল, বড়রা আপনার প্রবন্ধের তারিফ করে। আপনি হয়ত জানেন না কিন্তু লোকে জানে।

শুনে শিবানী বললেন, দাদাকে খুব ফুলিয়ে দিচ্ছ, দেখছি, মাস্টার। কোন কাজ আছে নাকি?

—কাজ কিছু নেই।

—তবে অহেতুক কৃপা কেন?

—ছিঃ ছিঃ! এ কি কথা বলছেন, দিদি? আমি কৃপা করব?

শিবানী অপ্রতিভ হয়ে বললেন, কিছু মনে করো না, ভাই। মুখ ফস্কে আমি কথাটা বলে ফেলেছি। তোমাকে অনেক কষ্ট দিলাম। চল, এখন বাড়ি চল। সন্ধ্যা হয়ে এল।

তারপর তাঁরা বাড়ির দিকে চলতে লাগলেন।

॥ সাঁইত্রিশ ॥

শহরের একটি প্রসিদ্ধ ওষুধের দোকান। মালিক অবস্থাপন্ন বনেদী ভদ্রলোক। ওষুধের দোকান ছাড়া তাঁর একখানা ভালো খাবারের দোকান ছিল। শ্রেষ্ঠ পান্‌তোয়ার জন্যে বিখ্যাত। পাকা ব্যবসায়ী-সুলভ ভদ্র আচরণ। সদালাপী। মিষ্টমুখ। কেউ কোনদিন তাঁকে রাগ করতে দেখে নি। ডাক্তারবাবুকে কেন্দ্র করে প্রতিদিন সন্ধ্যায় জন কয়েক ভদ্রলোক ডাক্তারখানায় আসতেন। তাঁদের চা-পান তামাক দেওয়ার খোলা হুকুম ছিল। ভদ্রলোক নিজে আফিংখোর। নেশার মহিমা বুঝতেন। জানতেন তামাক চায়ের নেশার জালে লোক সহজে জড়িয়ে পড়ে। রোজ সন্ধ্যায় ডাক্তারখানায় আড্ডা বসত। বাঙালীর আড্ডা দেওয়ার প্রবৃত্তি অস্থিমজ্জাগত। বাঙালীর আড্ডা ইংরেজদের ক্লাব নয়। ক্লাবে নিয়মের অত্যাচার। আড্ডায় সে বালাই নেই। বাঙালীর সকল কাজ একটু ঢিলে-ঢালা। ব্যবসায় বল, সভাসমিতিতে বল, এমন কি দক্ষিণ-হস্তের ব্যাপারে বল, বাঙালী নিয়ম মেনে চলে না। তারা কর্তাভজার জাত নয়। নব্যন্যায়ের দেশের লোক তারা। তারা বিচার করে, তর্ক করে। কোন কিছু মেনে নিতে চায় না। তারা অতিমাত্রায় স্বাধীনতা ভালবাসে। এজন্য স্ব-স্ব প্রধান। বাকপটু। ভাবপ্রবণ। আদর্শবাদী। সাময়িক উত্তেজনায় দপ্ করে জ্বলে ওঠে। আবার খপ্ করে নিভে যায়। তারা মিলেমিশে একসঙ্গে কোন কাজ করতে পারে না, বড় কাজ করা তো দূরের কথা।

ওখানে সেরা আড্ডাধারী ছিলেন ডাক্তার সরকার। মোটা-সোটা

নাদুস-নুদুস চেহারা। রুগী থাক আর নাই থাক ডাক্তারখানায় দুবেলা হাজির দিতেন। এক হাত ছাড়া বজ্রাঘাত হলেও সন্ধ্যার সময় আসা চাই। রাত্রি দশটা পর্যন্ত ঠায় বসে থাকতেন আর বিড়ি ফুঁকতেন। বলতেন, সিগারেট বা তামাক আমার ধাতে সয় না। 'তলব' না এলে নেশা করে লাভ কি ? গেরামভারী লোক। কথা বলতেন কম, শুনতেন সব। তর্কাতর্কির সময় রুল জারি করতেন। শিবনাথ তাঁর নাম দিয়েছিলেন ডক্টর জনসন। ফৌজদারি আদালতের মোক্তার বিপিনবাবু মুখ-পাতলা লোক। খেউড় গাইতেন। স্থূল ধরনের রসিকতা করে হাসতেন। তাঁর গ্যারিক নাম দেওয়া হয়েছিল। শিবনাথ বেশী কথা বলতেন। ডাক্তার তাঁকে মিস্টার বার্ক বলত। আড্ডায় একজন উকিল আসতেন। তাঁর কবিতা লেখার বাতিক ছিল। বোকা আর গুডিগুডি ধরনের লোক। তাঁকে বলা হত গোল্ডস্মিথ্। মাঝে মাঝে এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক আসতেন। হরিভক্ত বোষ্টম। গলায় মোটা তুলসীর মালা। মাথা জোড়া টাক। ধর্ম নিয়ে বক্ বক্ করতেন। একদিন কথায় কথায় তিনি বললেন, আমি ফটো তুলতে জানি। শুনেই শিবনাথ চিৎকার করে উঠলেন, ইউরেকা, ইউরেকা, পেয়েছি রে পেয়েছি! এতদিনে আমাদের আড্ডাখানা পূর্ণ হল। একজন রিনল্ডসের দরকার ছিল। সেদিন থেকে সকলে তাঁকে রিনল্ডস্ বলত। তিনি বললেন, আজকাল আর ছবি তুলি না। বড় costly pastime. বিনা পয়সায় ছবি তুলতে সকলে চায়। তাগিদের ঠেলায় প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়। ছবি তোলায় মেয়েদের বেশী ঝোঁক। সেজেগুজে গালে ঠোঁটে রঙ মেখে বসে। মনে করে রঙ মাখলে ছবি ভালো উঠবে। তাই লজ্জায় আমি ফটো তোলা ছেড়ে দিয়েছি।

উকিলবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, ডাক্তার, তোমরা তো বল হোমিওপ্যাথি জলপড়া। কিন্তু তাতেও তো রোগ সারে। তোমরা তো রোজ নতুন ওষুধ আবিষ্কার করে রুগীর উপর হাত সাফাই করছ।

—বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে তা অনিবার্য। পরীক্ষা করতে করতে ঠিক ওষুধ পাওয়া যাবে।

শিবনাথ বললেন, নিত্য নতুন পরীক্ষা চলতে থাকলে আসল জিনিসটা কবে পাওয়া যাবে বলা যায় না। তাহলে আন্দাজে চিকিৎসা করে লোককে মারা কেন ?

—রুগীকে মারবার জন্যে তো চিকিৎসা করা হয় না। সকল কাজে উদ্দেশ্যটা দেখা প্রয়োজন। সত্যকে পেতে হলে পরীক্ষা করে অগ্রসর হতে হয়।

—চিন্তাশক্তি আর দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে আমরা কাজ করি। ভাবি, সত্য আবিষ্কার করেছি। কিন্তু সত্য বহু দূরে। সত্যকে পাবার জন্যে সকলের যাত্রা, কিন্তু সে যাত্রা কবে শেষ হবে তা জানা নেই।

পাশে স্বামিজী ছিলেন। তিনি বৈদান্তিক। তিনি বললেন, সত্য দুরকমের—আপেক্ষিক আর পারমার্থিক। দৈনন্দিন জীবনে আমরা আপেক্ষিক সত্য নিয়ে কারবার করি। পারমার্থিক সত্য আত্মজ্ঞান বা অহং জ্ঞান। অহং জ্ঞানের ব্যত্যয় হয় না। সুতরাং অহং জ্ঞানই পারমার্থিক সত্য।

উকিলবাবু বললেন, ওসব তত্ত্ব-ফত্ত্ব মাথায় ঢুকছে না, মশাই।

শিবনাথ বললেন, তা ঢুকবে কেন? এ তো আর রামের সম্পত্তি শ্যামকে দেওয়া নয়? জাল দলিল ও মিথ্যা সাক্ষীর ব্যাপার নয়? এ সব কথা আর একদিন হবে। আজ বড় হাকিমের মেয়ে অর্থাৎ আমার ছাত্রীর বিয়ে। আমার নিমন্ত্রণ আছে। আজ উঠি।

সকলে উঠলেন।

ছাত্রীকে উপহার দেবার জন্যে বই-এর দোকান থেকে একখানা 'সঞ্চয়িতা' কিনে নিয়ে শিবনাথ উপস্থিত হলেন বিয়ে বাড়িতে। চারদিক আলোয় আলোময়। ঘটার কোন অভাব ছিল না। অনুষ্ঠানের কোন ত্রুটি ছিল না। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকেরা আসতে শুরু করেছেন। তাঁদের ভিতর অনেকে খদ্দরের ধুতি-পাঞ্জাবী পরেছেন। কেউ কেউ প্যাণ্ট-কোট পরে এসেছিল। আশীখানি কণ্ট্রোলের দোকান বিলি করার ক্ষমতা বড় হাকিমের হাতে। দোকানের মালিকরা এসেছে। স্টকিস্টরা এসেছে। আড়তদাররা এসেছে। প্রায় সকলে খদ্দর পরেছে। কারোর মাথায় গান্ধী টুপি। দুর্ভিক্ষের বাজারে এরা ধান-চালের কালোবাজার করে লাল হয়ে গেছে। কংগ্রেস স্বাধীনতা এনেছে দেখে এই সব বর্ষার ব্যাঙের দল রাতারাতি ভোল পাল্টে ফেলেছে। উৎকট কংগ্রেসী হয়ে গিয়েছে। এরা এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। বড় হাকিমের আশে-পাশে ঘুরঘুর করছে।

একখানা বড় হলঘর উপহারের বস্তুতে ঠেসে গিয়েছে। বেনারসী, দামী শাড়ি, ব্লাউজ, গরদের ধুতি-উড়ুনি দেওয়ালের গায়ে ঝুলছে। হীরের

আংটি, সোনার হাতঘড়ি ও বোতাম কয়েকটা সাজিয়ে রাখা হয়েছে। একটা ঘরে আলমারি, বুককেস, খাট, আলনা, গ্রামোফোন, হারমোনিয়ম, সেলাই-এর কল, রেডিও সেট। টিন টিন ঘি সর্ষের তেল সরু চাল মাছ দৈ সন্দেশ, এমন কি ঝুড়ি ঝুড়ি মাটির গ্লাস, খুরি, কলাপাতার মোট, আলু-পটলের বস্তাতে ভাঁড়ার থৈ থৈ করছে। কে এনেছে, কোথা থেকে এনেছে, কখন এনেছে, তা কেউ দেখেনি।

দাড়ি-গোঁফ কামানো বেশ ফিটফাট আধ-বয়সী একটি ভদ্রলোক রান্না-চালায়, ভাঁড়ার ঘরে, ছাদের উপর, উঠনে ছুটোছুটি করছেন, যেন তাঁরই মেয়ের বিয়ে। তাঁর পরনে মিহি খদ্দরের ধুতি ও পাঞ্জাবী। কাঁধে একখানা তোয়ালে। এই কালোবাজারীদের রাজা বিয়ে বাড়ির তদ্বিরকারী শম্ভুবাবু শিবনাথকে দেখে বললেন, কি মাস্টারমশাই, আপনি দাঁড়িয়ে কেন? চলুন উপরে। ছাদে জায়গা হয়েছে। শিবনাথ বললেন, যাচ্ছি, একটু দাঁড়িয়ে দেখছি।

দুর্ভিক্ষের সময় তিনি চাল ধান কাপড়ের চোরা কারবার করে বেশ দু-পয়সা কামিয়ে নিয়েছেন। হুজুরের বদলি হয়ে যাওয়ার আগে তাঁর মেয়ের বিয়ের সব বন্দোবস্ত করে তাঁর ঋণ কতকটা শোধ করতে চেয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভালো কাজ করেছেন বলে হুজুরের পদোন্নতি হয়েছে দেখে তাঁকে হাতে রাখলে ভবিষ্যতে আরও সুবিধা হবে ভেবে তিনি হুজুরকে কন্যাদায় হতে মুক্ত করার জন্যে এত উৎসাহ দেখাচ্ছেন।

এদিকে বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হয়েছে। ছাতনাতলায় মেয়েরা শঙ্খ বাজাচ্ছে, উলুধ্বনি দিচ্ছে। চাকর-বাকর ঝি-ঝিউড়ীরা ব্যস্তসমস্ত। হাতে সোনার চুড়ি আর দামী বেনারসী পরে এয়োতীরা বরণ জুড়ে দিয়েছে। পিঁড়ির উপর বসিয়ে কনেকে সাতপাক ঘোরানো হচ্ছে। স্ত্রী-আচারের তুমুল উলুধ্বনি, শঙ্খ আর সানাই-এর হট্টগোলের ভিতর নাপিত হরমোহন ছড়া কাটছে—

কড়ি দিয়ে কিনলাম
দড়ি দিয়ে বাঁধলাম
হাতে দিলাম মাকু
ভ্যা করতো বাপু!

পাত্রী-সম্প্রদান কাজ আরম্ভ হল। পুরোহিত মন্ত্রপাঠ করছে—যদিদং হৃদয়ং মম, তদিদং হৃদয়ং তব।

ছাদের উপরে সারি সারি বরযাত্রী, কনেযাত্রী ও নিমন্ত্রিতদের পাতে পোলাও তরকারির সুগন্ধ ভুর ভুর করছে। চর্ব্যচূষ্যের ছড়াছড়ি। পান্তোয়া সন্দেশের গড়াগড়ি। দলে দলে লোক খেয়ে চলে যাচ্ছে। নিচে রাস্তার ধারে এঁটো পাতা, খুরি গেলাসের স্তূপ জমে গিয়েছে। উচ্ছিষ্ট দ্রব্য নিয়ে ভিখিরী ও কুকুরের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে। একজন কর্তা-ব্যক্তি শিবনাথকে জিজ্ঞাসা করলেন, মাস্টারমশাই, খাওয়া হয়েছে তো? শিবনাথ মাথা নেড়ে হাঁ জানিয়ে ভুক্ত অতিথিদের সঙ্গে বেরিয়ে এলেন। তাঁর খাওয়া হল না। ছাত্রীকে উপহারটিও দেওয়া হল না।

॥ আটত্রিশ ॥

সেদিন সন্ধ্যায় শিবনাথ আড্ডাখানায় উপস্থিত হলেন। তখনও আড্ডা জমেনি। মাত্র ডাক্তারবাবু ও উকিলবাবু ছিলেন। ডাক্তার চিন্তিত। উকিলবাবু নিস্তব্ধ।

শিবনাথ জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপারখানা কি? তোমরা অমন চুপচাপ বসে কেন?

উকিলবাবু বললেন, ডাক্তার, মেয়েদের বিয়ের কথা ভেবে চিন্তিত।

শিবনাথ বললেন, ডাক্তার, মেয়েদের বিয়ের কথা ভাবছ?

তিনি বিমর্ষভাবে বললেন, না ভাই, বিয়ের কথা ভাবছিনে। দুটো মেয়ে এম. ই. পাস করে আজ দু বছর ঘরে বসে আছে। বিয়ে দিতে পারছি না, আর পড়াতেও পারছি না। বর খুঁজে খুঁজে তো হয়রান। এক ভদ্রলোক মেয়ে দেখতে এসে মেয়েকে জিজ্ঞেস করলে, তুমি মোটর চালাতে পার? শোন কথা! পাড়াগাঁয়ের মেয়ে মোটর চালাতে জানবে কি করে? তারপর বলে, গান করতে পার? গীটার বাজাতে পার? উলের কাজ জান? পোলাও কোর্মা রাঁধতে জান? আমি তো শুনে অবাক্!

শিবনাথ বললেন, অর্থাৎ তিনি যাকে পুত্রবধূ করবেন সে হবে রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী আর একাধারে বাবুর্চি ও সোফার। টাকার খাঁই কত?

—তিনি বড়লোক। মেয়ের এই সকল গুণ থাকলে দেনাপাওনার জন্যে কোন অসুবিধা হবে না।

—পাত্রটি কি করে?

—বাপের ব্যাবসা দেখে—অর্থাৎ গাঁটকাটার ছেলে গাঁট কাটে। বাপ যুদ্ধের বাজারে সাবান, সাজিমাটি ও কেরোসিন তেলের কণ্ট্রোলের ব্যাবসা করে লক্ষপতি হয়েছে।

—আর কোথাও চেষ্টা করনি?

—কন্যাদায়গ্রস্ত বাপমার চোখে কি ঘুম আছে? কত জায়গায় গেছি। সবাই বলে, কত খরচ করতে পারেন, বলুন। টাকা পছন্দ হলে পাত্রী পছন্দ হয়ে যাবে। দেখছি, মেয়ের বিয়ে দেওয়া অসম্ভব। এজন্যে মেয়েদের অন্ততঃ বি. এ. পাস করিয়ে দিতে চাই। তারপর যা হয় হবে। উকিলবাবু বললেন, এই জন্যে আমি বলি, মেয়েদের বি. এ. এম. এ. পাস করিয়ে ছেড়ে দাও। তারা নিজেদের ব্যবস্থা নিজেরা করে নেবে।

—কিন্তু পড়াব কোথায়? এখানে তো মেয়েদের একটা হাইস্কুল পর্যন্ত নেই। একটা বাজে এম. ই. স্কুল মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসছে। কলকাতায় বোর্ডিং-এ রেখে দুটো মেয়েকে পড়ানো মানে মাসে দুটি শ টাকা। পারব কি করে? দেখ না ভাই মাস্টার, এখানে একটা মেয়েদের হাইস্কুল করতে পার কি না।

উকিলবাবু বললেন, মাস্টার করিতকর্মা লোক। চেষ্টা করলে ও পারবে।

শিবনাথ বললেন, আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি। দিন কয়েকের ভিতর দেখতে পাবে। আজ উঠি। একটু দরকার আছে।

শিবনাথের চলে যাওয়ার পর উকিলবাবু বললেন, ঐ একটা লোক বটে! যেমন বিদ্বান, তেমন কর্মী। দেখছ না এই কয়েকটা বছরের ভিতর ছেলেদের হাইস্কুলটাকে একেবারে ঢেলে সাজিয়েছে। এক একটি সেকেলে অপদার্থ বুড়ো মাস্টার চলে যাচ্ছে, আর তার জায়গায় বি. এ. এম. এ. পাস ভালো ভালো মাস্টার নিয়োগ করছে। প্রতি বছর ছাত্ররা জলপানি পাচ্ছে। দেখবে, ও শীঘ্রই মেয়েদের হাইস্কুল আরম্ভ করে দেবে।

—এই জন্যেই তো আমি ওকে গুঁফো সরস্বতী বলি। ওর মতো বলিয়ে কইয়ে লিখিয়ে বিদ্বান ব্যক্তি এখানে তো নেই, অন্যত্রও বিরল। তবে দেখে

নিও, অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনি গেঁয়ো যোগী ভিখ পাবে না। আমরাই ওর পিছনে লাগব। বাঙালী জাতটা একেবারে জাহান্নমে গেছে। তারা কারোর প্রতিষ্ঠা সহ্য করতে পারে না। নিজেরা কিছু করে না, আর অপরকেও করতে দেবে না।

—মানুষের স্বভাব এই, সে যে-কোন জাতের, যে-কোন দেশের মানুষ হোক না। মাস্টারের অনেক গুণ আছে। তার একটা দোষ, সে লোকের মুখের উপর ক্যাটকেঁটে কথা শুনিয়ে দেয়।

—দেবে না কেন? সে তো বিপিন মোক্তারের মতো মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে কথা বলতে জানে না। বিশেষতঃ বড় হাকিম সাহেব যদি বলেন, পুকুরের ওদিকের জল উঁচু, আমাদের মোক্তার বন্ধু বলেন, আজ্ঞে হাঁ, হজুর, ওদিকের জল উঁচু। আমাদের মতো নিম্ন আদালতের উকিল মোক্তাররা হাকিমদের তেল মাখিয়ে প্র্যাকটিস জমিয়ে দু পয়সা কামিয়ে নেয় সত্যি, কিন্তু আমাদের বন্ধু হাকিম-তোষণ কর্মে ওস্তাদ। এ বিষয়ে ভূভারতে তাঁর জোড়া নেই।

—চাণক্য বলেছেন, অপ্রিয় সত্য বলতে নেই।

—ওটা কূটনীতির কথা। সত্য চিরকালই অপ্রিয়। সত্যবাদী অপ্রিয়ভাষী।

—সংসারে তা চলে না। শত্রু সৃষ্টি হয়। স্পষ্ট কথায় বন্ধু বিগড়ে যায়।

—আপাত সুবিধার জন্যে আমরা সত্য বলি না বলেই তো সমাজে যত দুর্নীতি। মাস্টার বলে, অপরের মতো আমরাও যদি শক্তিমানের খোশামোদ করি, সত্য বলতে ভয় করি, তাহলে ছাত্ররা কি শিখবে? ও সব কথা থাক। রাত হয়ে গেছে। চল বাড়ি যাই।

এর পাঁচ-সাত দিন পরে ভারত-বিভাগের পর ইংরেজরা শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর করেছিল। এক নতুন উদ্দীপনায় দেশ ভেসে গেল।

এদিকে শিবনাথ সকালে স্কুলগৃহে কয়েকটি এম. ই. পাস ছাত্রী নিয়ে সপ্তম শ্রেণী খুলে দিয়েছেন। তাঁর অনুরোধে আরও তিন জন শিক্ষক মেয়েদের ক্লাস নিতে রাজী হয়েছেন। রাস্তার ধারে বাড়ির দেওয়ালে হাটে-বাজারে হাতে লেখা পোস্টার মারা হয়ে গেল। তাতে লেখা ছিল, মাস্টারমশাই বকনা বাছুরের খোঁয়াড় খুলেছেন। রাত্রে খুললে ভাল হয়। খেল চলবে ভালো! দেখে, শিবনাথ আশ্চর্য হয়ে যান! ভাবেন, যে-স্থানের লোক নিজেদের মেয়ে-বোনদের নিয়ে প্রকাশ্যে এমন কুৎসিত ইঙ্গিত প্রচার করতে লজ্জাবোধ করে না, তারা মানুষ, না পশু? শুনে,

শিবানী বললেন, পাগলে কি না বলে আর ছাগলে কি না খায়! দেশ স্বাধীন হল। নেতারা দেশের কাজ করার জন্যে মেয়েদের আহ্বান করছেন। মেয়েরা মুখ্খু হয়ে থাকবে আর বাসন মাজবে? আমাদের সে যুগ আর নেই। তখন ছেলে-মেয়েদের বিয়ে দিয়ে বাপ-মা তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতেন। সে কাল আর নেই। সে সমাজও নেই। প্রাচীনের কঙ্কালকে আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে না। 'অষ্টম বর্ষে ভবেৎ গৌরী' করার দিন চলে গেছে। দেশকে বড় করতে হলে ছেলে-মেয়েদের সমান তালে পা ফেলে চলতে হবে। হয়তো তার ফল প্রথমে একটু খারাপ হবে। নির্বোধ ব্যক্তিরা ঠাট্টা তামাশা করবে। নিন্দুকরা অমন কত কথা বলবে। তুমি তাদের কথায় কান দিও না। প্রত্যেক বছর একটির পর একটি ক্লাস বাড়িয়ে চার বছর পরে এম. ই. স্কুলটিকে মেয়েদের হাইস্কুলে পরিণত কর।

শিবানীর উৎসাহ, ডাক্তারবাবুর অনুরোধ আর উকিলবাবুর আগ্রহ দেখে শিবনাথ দ্বিগুণ উৎসাহে কাজে অগ্রসর হলেন।

॥ উনচল্লিশ ॥

—বিনুদা, গতকাল রাত্রি বারোটার সময় তো আমরা খুব হৈ হুল্লোড় করে শহিদ-বেদীতে মালা দিয়ে জাতীয় পতাকা তুলে স্বাধীনতার প্রথম উৎসব দিবস পালন করলাম, কিন্তু আমরা কি সত্যই স্বাধীনতা পেলাম? সুশোভন জিজ্ঞাসা করল বিনয়কে বিকেল বেলা শিবনাথের বৈঠকখানায় বসে চা খেতে খেতে। বিনয় জেলা কোর্টে পাঁচ বছর ওকালতি করছে। সুশোভন তার জুনিয়র হয়ে কোর্টে বেরোচ্ছিল। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দুর্ভিক্ষের জন্যে কোর্টের অবস্থা শোচনীয় দেখে সে ক্লেমস্ অফিসের আইন বিভাগে তেত্রিশ টাকা বেতনের চাকরি নিয়েছিল। উভয়েই ছেলে-বেলা থেকে রাজনীতি করে। বিনয় গান্ধীবাদী দক্ষিণপন্থী। সুশোভন সুভাষ বোসের দলের উগ্র বামপন্থী।

বিনয় বলল, তোদের মতে আপস করে যে স্বাধীনতা হয়, তা সত্যিকার স্বাধীনতা নয়। সব ঝুটা।

সুশোভন উত্তর দিল, আমাদের এই স্বাধীনতার আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী

ইংরেজ ওত পেতে বসে রইল। সুযোগ পেলেই তার তাঁবেদার পাকিস্তান আর অনুগত গোলামদের সাহায্যে গোলমাল বাধিয়ে সব পণ্ড করে দেবে।

—তোদের সব বাড়াবাড়ি। আগে গাছে ওঠ, তারপর ফল পাড়বি।

—এত কষ্ট করে গাছে উঠলাম। সে কি কাঁচা টক ফল পাড়বার জন্যে?

—গাছে উঠে কাঁচা ফল পেড়ে পাকিয়ে নিতে হয়। ক্ষমতা হাতে এসেছে। দেখবি, দশ বছরের ভিতর ফল পাকবে। আমাদের দেশ-নেতারা সব বোকা, আর তোরাই যত বুদ্ধিমান!

—তোমরা যতই বাহাদুরি কর না কেন, গান্ধীজীর নপুংসক অহিংস নীতির জয়গান যতই কর না কেন, সুভাষ বোসের ঠেলা না পেলে ইংরেজ ভারত ছেড়ে পালাত না, ভারত স্বাধীন হত না।

—তোদের ঐ সকল চর্বিতচর্বণ কথা শুনে কান ঝালাপালা হয়ে গিয়েছে।

এমন সময় কল্যাণী প্রবেশ করে বলল, বউদি, মা আর আমি সিনেমা দেখতে যাচ্ছি। আজ 'ভুলি নাই' ছবি দেখানো হবে।

—সিনেমা হলের মালিক তো খুব চালাক লোক দেখছি হে। ছোকরা হলে কি হয়। ব্যাবসা বুদ্ধি বেশ টনটনে। সুযোগ বুঝে দু পয়সা কামিয়ে নেবার সুন্দর ব্যবস্থা করে ফেলেছে। যা, দেখে আয় কারা বুকের রক্ত দিয়ে স্বাধীনতার পথ তৈরি করেছে। দেখে আয় বিনুদার দেশপূজ্য অহিংস নেতাদের কেরামতি।

সুশোভন ঝোপ দেখে কোপ মেরেছে দেখে কল্যাণী হাসতে হাসতে চলে গেল।

তারপর পূর্বের কথার জের টেনে সুশোভন বলল, দেশ বিভাগের ফলে স্বাধীনতা তো দূরের কথা, এমনকি হিন্দু-মুসলমান সমস্যার সমাধান হয়নি এবং তার নৈতিক ফলও ভালো হয়নি। যেটা সাম্প্রদায়িক বিবাদ ছিল তা এখন আন্তর্জাতিক বিবাদে পরিণত হল।

—তার মানে?

—তার মানে তোমরা বুঝেও বুঝতে চাইবে না। ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের পক্ষে যেটা দূষণীয় বলে বিবেচিত হয় তা রাষ্ট্রিক স্বার্থের খাতিরে অনুচিত বলে মনে হয় না। কারণ, রাষ্ট্রের নীতির বন্ধন নেই, নৈতিক দায়িত্ববোধ নেই। শক্তিই তার একমাত্র সম্বল। এবার শুধু শক্তির লড়াই চলবে।

—ভারতকে শক্তিশালী হতে হবে। দুনিয়ায় দুর্বলের স্থান কোথায় ?

—যেখানে ব্যক্তি বা সমাজ রাষ্ট্রের উপর চাপ না দিতে পারে, সেখানে রাষ্ট্র সর্বেসর্বা হয়ে পড়ে। এর ফল ভালো হয় না। স্বাধীনতার বিনিময়ে একটি ক্ষতস্থান সৃষ্টি হল।

—ভালো দাওয়াই-এর ব্যবস্থা করতে পারলে ঘা বাড়তে পারবে না।

এরপর তারা রেডিও থেকে প্রচারিত সংবাদ শোনার জন্যে উঠে গেল।

॥ চল্লিশ ॥

দেশ-বিভাগের পর মুসলমানদের হিন্দু-বিতাড়ন নীতি পুর্ববঙ্গের লাখ লাখ বাস্তুহারাকে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল। সেখানকার হিন্দু ছাত্ররা কলকাতার স্কুল কলেজে ভিড় জমিয়েছিল। তিল ধারণের স্থান ছিল না। এ অঞ্চলের মফঃস্বলের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার অসুবিধা দূর করার জন্যে শহরে এবং এমন কি সুদূর পল্লীগ্রামে কতগুলি নতুন স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়েছিল। বাস্তুহারা শিক্ষকদের জীবন-ধারণের কতকটা সুরাহা হল। অন্যান্য স্থানের দৃষ্টান্তে শিবনাথ এখানে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করতে মনস্থ করলেন। যৎকিঞ্চিৎ চাঁদাও উঠল। কিন্তু সামান্য অর্থ হাতে নিয়ে এতো বড় ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয় ভেবে থমকে গেলেন। তরুণ এস্. ডি. ও-র শরণাপন্ন হলেন। তিনি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

শহরের মধ্যস্থলে একটি পুষ্করিণীর জঙ্গলপূর্ণ পাড়ে একখানি একতলা পড়ো বাড়িও পাওয়া গেল। এস্. ডি. ও. সাহেবের চেষ্টার ফলে দিন কয়েকের ভিতর প্রায় পনরো হাজার টাকা সংগ্রহ হল। স্থানীয় স্কুল থেকে কয়েকখানি বেঞ্চি, চেয়ার এবং ব্ল্যাক বোর্ড চেয়ে আনা হল। এস্. ডি. ও.-কে সভাপতি করে এবং কয়েকজন বন্ধু ও ছাত্রকে নিয়ে পরিচালক সমিতি গঠিত হল। কলেজ খোলার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন পাওয়া গেল। শিবনাথ সেই একতলা বাড়িতে প্রথম বার্ষিক শ্রেণী খুলে দিলেন। সতরোটি ছেলেমেয়ে ভর্তি হল। শিবনাথের আনন্দের সীমা রইল না। নবজাত রুগ্ন অস্থিচর্মসার সন্তান তার স্নেহময়ী জননীর মনে কত না আশা ও সুখের কথা জাগিয়ে তোলে! সেই দীঘির জরাজীর্ণ শান-বাঁধানো

ঘাটে একাকী বসে শিবনাথ তাঁর সদ্যোজাত শীর্ণ মানস-সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কত রঙীন স্বপ্ন দেখেন। ভাবেন, সেদিন বেশী দূরে নয় যখন সেই জনবিরল জঙ্গলপূর্ণ স্থানটি ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ-কলরোলে মুখরিত হয়ে উঠবে, যখন সেই পানাভর্তি দীঘির শূন্য পাড়গুলি বিরাট ইমারতে পূর্ণ হয়ে উঠবে এবং পণ্ডিতাগ্রগণ্য অধ্যাপক এবং জিজ্ঞাসু বিদ্যার্থীদের জ্ঞান-বিজ্ঞান সাধনার পীঠস্থানে পরিণত হবে। পরমূহূর্তে আবার কঠোর বাস্তবের সংঘাতে তাঁর এই কাল্পনিক ছবিটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত। তাঁকে শুনিয়ে কেউ বলত, এ ধরনের কলেজের কোন প্রয়োজন নেই। আজকাল বি. এ. এম. এ. পাস করে ছেলেরা ঘাস কাটছে। পেটে অন্ন জোটে না। ইচ্ছা করলে আমরাও এই ধরনের একটা গোয়াল তৈরি করতে পারতাম। চিরকালটা গেল মাস্টারি করে, এখন তিনি একটা ঢকেরটাঠি কলেজ করে বাহাদুরি করছেন! এই সব কলেজ কতকগুলো মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো তরুণ-তরুণীর প্রেম করার আড্ডাখানা হয়ে উঠবে। একদিন একটি ভদ্রলোক শিবনাথের মুখের উপর বললেন, সারা জীবন আপনি স্কুলে লাহিড়ীর সিলেক্ট পোয়েমস্ পড়িয়ে এসেছেন। কলেজের ছাত্রদের পড়িয়ে বিদ্যা জাহির করার জন্যে কলেজ করলেন। আপনার মতো পণ্ডিত যে কলেজের অধ্যাপক হবে, সে কলেজে যে বেটা ছাত্র ঢুকবে সে আর কোনদিন বেরিয়ে আসবে না। দশ ইঞ্চি ইট ঝেড়ে বেটাদের মাথা কানা করে দেব।

এদিকে আবার কয়েকজন স্থানীয় ভদ্রলোকের নাম দিয়ে একখানি দরখাস্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দেওয়া হয়েছিল। তাতে লেখা হয়েছিল, কয়েকটি স্কুলের টাকা মেরে দেওয়ার জন্যে শিবনাথবাবুর কয়েকবার জেল হয়েছিল। কলেজের নামে চাঁদা তুলে টাকা ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে শিবনাথবাবু একটা কলেজ ফেঁদে বসেছেন। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব স্বয়ং তদন্ত করে জেনেছেন যে এই অভিযোগ মিথ্যা এবং অহেতুক বিদ্বেষ-প্রসূত।

এই ধরনের নির্দয় উক্তি, কঠোর সমালোচনা, অহেতুক শত্রুতা শিবনাথের মনকে হতাশায় ভারাক্রান্ত করে তুলল।

এস. ডি. ও. সাহেব শিবনাথবাবুকে ডেকে বললেন, আপনি ঘাব্ড়াবেন না। নিজের কাজ করে যান। আমাদের দেশের লোকের প্রকৃতি এই রকম।

॥ একচল্লিশ ॥

কলেজ-কমিটি শিবনাথকে অধ্যক্ষ করে দিলেন। তাঁরা বললেন, কলেজটির উন্নতির জন্যে আপনাকে প্রয়োজন। দরদ দিয়ে চেষ্টা না করলে কোন নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে না। এখানে বেশী বেতন পাওয়া যাবে না বলে বাইরের কোন লোক আসতে চাইবে না। এলেও বেশী দিন থাকবে না।

শিবানী বললেন, তাঁরা ঠিক কথা বলেছেন। কোন কাজকে সার্থক করতে গেলে টাকা আর উপযুক্ত মানুষ দরকার। মানুষের মতো মানুষ কাজ হাতে নিলে টাকা আপনিই আসে। টাকার অভাবে কোন সৎ কাজ পণ্ড হয় না। 'ধরি মাছ, না ছুঁই পানি' করলে কোন কাজ সফল হয় না। সন্দেহ, দ্বিধা ত্যাগ করে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়। পুরো দায়িত্ব নিয়ে প্রাণ দিয়ে চেষ্টা কর।

শিবনাথ বললেন, একটি কলেজ যে কত বড় প্রতিষ্ঠান, সে সম্বন্ধে তোমার ধারণা নেই। অন্ততঃ লাখ টাকা দরকার। বাড়ি ছাড়াও পঞ্চাশ-ষাট হাজার টাকা যোগাড় করতে না পারলে আনুষঙ্গিক খরচ চালানো যাবে না। আকাশ থেকে টাকা তো আর ঝনঝন করে পড়বে না? অত টাকা কে দেবে? কোথায় পাব?

একটু চুপ করে থাকার পর শিবানী সাহস দিয়ে বললেন, ঐকান্তিক ইচ্ছা থাকলে পথ খুঁজে পাওয়া যায়। চেষ্টা কর। ভিক্ষে কর। চাঁদা তোল।

শিবনাথ বললেন, ভিক্ষে করব কার কাছে? সাধারণ গৃহস্থরা তো ভিক্ষে আর চাঁদা দিতে দিতে ফতুর হয়ে গিয়েছে। এখন ভিক্ষে করা ও চাঁদা তোলা তো একটা পেশায় দাঁড়িয়েছে।

শিবানী বললেন, সত্যই, সাধারণ গৃহস্থদের আয় অল্প, খরচ বেশী। জিনিস-পত্র দুর্মূল্য। ছেলেদের লেখাপড়ার খরচ আছে। কুটুম-কুটুম্বিতা আছে। পিতৃ-মাতৃদায় আছে। মেয়ের বিয়ে আছে। বারো মাসে তেরো পার্বণ আছে। ইচ্ছা থাকলেও তারা বেশী কিছু দিতে পারে না। কিন্তু

আশে-পাশে তো পাঁচ-সাতটি পাট ও সুতার কল আছে। তাদের মালিকরা বড়লোক। তারা হাত ঝাড়লে পর্বত হয়।

শিবনাথ বললেন, হাত ঝাড়লে তো হবে? তারা হয় অবাঙালী, না হয় বিদেশী। হিন্দু অবাঙালী মিলমালিকরা ধর্মের কাজে বেশ কিছু টাকা খরচ করেন। তীর্থস্থানে বিরাট ধর্মশালা নির্মাণ করেন। কিন্তু এখানকার নতুন কলেজটির জন্যে চাঁদা চাইলে বলেন, দেশ এখন স্বাধীন হয়েছে। শিক্ষার জন্যে জাতীয় সরকার টাকা দেবেন। আমরা কি করতে পারি? বিদেশী মিলমালিকরা তো এই সকল বাজে কাজের জন্যে চাঁদার কথা কানে তুলতেই চায় না।

শিবানী জিজ্ঞাসা করলেন, বাঙালী ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কিছু টাকা উঠতে পারে না?

শিবনাথ বললেন, তারা যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সময় কালোবাজার করে বেশ কিছু টাকা কামিয়েছে সত্য। তাদের আঙ্গুল দিয়ে জল গলে না। তারা চালে কাঁকর, চিনিতে কাঁচ গুঁড়ো মিশিয়ে আর ভেজাল সর্ষে তেল বিক্রি করে লাল হয়ে গিয়েছে। দুর্ভিক্ষের সময় যারা গড়ে একজন লোক মেরে এক হাজার টাকা লাভ করেছে, তারা হৃদয়হীন। তারা শিক্ষার জন্যে দান করবে? বড়কর্তাদের ঘুষ দেওয়ার সময় তারা থলির মুখ খোলে। পৃথিবীর সব পয়সাওয়ালা লোক এক জাতের, জেনো।

শুনে, শিবানী আশ্চর্য হয়ে যান। জিজ্ঞাসা করেন, আচ্ছা জমিদারদের কাছে কিছু পাওয়া যায় না? তারা এককালে টোল পাঠশালা স্কুল স্থাপন করেছে। বড় বড় দীঘি কাটিয়ে দিয়েছে। রাস্তা তৈরি করেছে। অনেক কিছু জনহিতকর কাজ করেছে। শিবনাথ বললেন, কিন্তু তারা এখন নিঃস্ব। তারা প্রজার কাছে খাজনা আদায় করেছে। ইংরেজকে রাজস্ব দিয়েছে। উদ্বৃত্ত টাকা নিয়ে ছিনিমিনি খেলেছে। টাকা ব্যবসায় খাটিয়ে মূলধন বৃদ্ধি করেনি। বড় জোর শতকরা সাড়ে তিন টাকা সুদের কোম্পানির কাগজ কিনে পুরুষানুক্রমে পায়ের উপর পা দিয়ে বসে খেয়েছে। ভুঁড়ি মোটা করেছে। স্ফূর্তি করেছে। যাত্রাদল গড়েছে। আফিং মদ গাঁজা খেয়েছে। তাদের ভাঁড়ে মা ভবানী। নগদ টাকা কোথায় পাবে যে দান করবে? একমাত্র ভরসা ছিলেন উৎসাহী এস্. ডি. ও. সাহেব। তিনিও বদলি হয়ে গেলেন। আজকাল এস্. ডি. ও. বা ম্যাজিস্ট্রেট ছাড়া

আর কেউ মোটা টাকা তুলতে পারে না। ভয়ে বা কিছু স্থবিধা পাবার প্রত্যাশায় ব্যবসায়ীরা তাঁদের চাঁদা দেয়। আমাদের মতো লোক মাথা কুটলেও মোটা টাকা আদায় করতে পারে না। যৎকিঞ্চিৎ পেতে পারে। আজকাল দানের জন্যে লোক দান করে না। দানের বিনিময়ে কিছু স্থবিধা লাভের জন্যে দান করে। এ তো দান নয়। এক প্রকারের ঘুষ।

শিবানী বললেন, এ দেশের ঠাকুর দেবতারাও ঘুষ খান। মানুষ তো কোন ছার!

শিবনাথ হেসে বললেন, ঠিক কথা বলেছ।

—আমি মেয়েছেলে। ঘরেই থাকি। তোমার কাছে সব শুনে ভুল ভেঙ্গে গেল।

এদিকের কলেজের তহবিল প্রায় শূন্য। ছাত্র-সংখ্যা অল্প। তাদের মাইনের আয়ে খরচ চলে না। অনেকে আবার ঠিক সময়ে মাইনে দেয় না। সকলেই ফ্রি চায়। কলেজের যেন জমিদারি আছে! ব্যাঙ্কে দশ-বিশ হাজার টাকা জমা আছে! আজ বিশ তারিখ। এখনও অধ্যাপকদের গত মাসের বেতন দেওয়া হয়নি। পকেটে রসিদ বই নিয়ে ঘুরে বেড়াই। এক টাকা চাঁদা আদায়ের জন্যে দু-তিনবার যাই। কেউ রসিদ কেটে নেয়। বলে, টাকাটা দু-এক দিনের ভিতর পাঠিয়ে দিচ্ছি। আর উপুড় হাত করে না। কারোর কাছে ধন্না দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকি। তারপর রিক্তহস্তে ফিরে আসি। চাঁদা আদায়ের মতো এমন জঘন্য কাজ আর নেই। দূর থেকে আমাকে দেখে লোক সরে পড়ে। আমি যেন শত্রু বা গাঁটকাটা।

—সেদিন যে চ্যারিটি শো দিলে তাতে কিছু টাকা হল না?

—আশা করেছিলাম একসঙ্গে কিছু টাকা পাওয়া যাবে। যাঁরা দয়া করে বিনা পয়সায় 'শো' দিতে এলেন, তাঁদের চা জলখাবার, রাস্তা খরচ, ড্রেস ভাড়া, কনসার্ট ভাড়া দিতে টিকিট বিক্রির তিনভাগ টাকা বেরিয়ে গেল। পরিশ্রম করাই সার হল। লাভের গুড় পিঁপড়েতে খেয়ে নিল। চ্যারিটি শোতে টাকা হয় না, আর লোকের দান করার প্রবৃত্তি নষ্ট হয়ে যায়। তবে অন্য উপায়ে বেশ কিছু মোটা টাকা পাওয়া যেতে পারে। এই সেদিন এক ভদ্রলোক বললেন, আমি সিনেমার ঘর নির্মাণ করছি। এস্. ডি. ও-কে বলে আমাকে পাঁচ শ বস্তা সিমেণ্টের পারমিট করে দিন।

আমি পাঁচ শ টাকা চাঁদা দেব। ধান, চাল, কাপড় ও চিনি প্রভৃতির পারমিট করে দিতে পারলে এখুনি বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা পাওয়া যেতে পারে। এও তো এক প্রকার ঘুষ। এই ভাবে টাকা নিলে সৎ কাজ আর সৎ থাকে না। আমি তা পারব না।

সেদিন একজন বাঙালী শিল্পপতি কলেজের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করে গেলেন। বক্তৃতা দিতে উঠে তিনি বললেন, আমি ছিলাম দরিদ্র পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। শৈশবে আমার পিতৃবিয়োগ হয়। মা ঝিগিরি করে অতি কষ্টে আমাকে মানুষ করতেন। বারো বৎসর বয়সে আমি বউবাজারে একটা ফার্নিচারের দোকানে আড়াই টাকা বেতনে চাকরের কাজ নিলাম। ফার্মের মালিক আমাকে ভালবাসতেন। টুকরো পিচ পাইন কাঠে তৈরি কম দামী চেয়ার ও টেবিল ঘাড়ে করে রোজ রাস্তায় বিক্রি করতাম। লাভের কিছু অংশ তিনি আমার নামে জমা রাখতেন। বছর আট পরে আমি সেই টাকায় একটি ছোট ফার্নিচারের দোকান খুলি। ক্রমে ছোট দোকানটি একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এখন আমি একটি চট কল এবং একটি লোহার কারখানার মালিক। একটি বড় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করেছি। উপসংহারে তিনি ছেলেদের লক্ষ্য করে বললেন, হে আমার স্বদেশবাসী যুবকগণ, তোমরা আমার দৃষ্টান্ত সামনে রেখে জীবনের দুর্গম পথে অগ্রসর হও। আমার জীবনই বাণী। এই নব প্রতিষ্ঠিত কলেজটি আমার সাহায্যে অচিরে একটি উচ্চ শ্রেণীর কলেজে পরিণত হবে। বিপুল হর্ষধ্বনি ও কর-তালির মধ্যে তিনি বক্তৃতা শেষ করলেন।

সভা শেষ হল। একটি সন্দেশ ও এক গ্লাস লেবুর রস খেয়ে তিনি মোটর হাঁকিয়ে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় শিবনাথকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলে গেলেন।

যথা সময়ে শিবনাথ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। তিনি বললেন, আমি ভুলিনি। নিশ্চিন্ত থাকুন। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। শিবনাথ আরও পাঁচ-সাতবার তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। ভদ্রলোকের সেই এক কথা শুনে এলেন—আমি ভুলিনি। সময়ে সব ঠিক হয়ে যাবে। লোক বড় বড় কথা বলে। বাহাদুরি করে। কাজে কিছুই করে না। ঠেলায় না পড়লে বড় লোকেরা টাকা দেয় না। শিবানী হতাশ হয়ে বললেন, তাহলে কি হবে? শিবনাথ বললেন, হবে আর কি? দু বছরের ভিতর তোমার কয়েক থান

গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা এনেছি। সুদ দিতে পারিনি। প্রায় ষাট-সত্তর ভরি সোনা বিক্রি হয়ে গেছে।

শিবানী বললেন, তা হোক্। তুমি মোটেই ভেবো না। এখনও তো আট ভরির হার আর বারো ভরির চুড়ি আছে। বন্ধক দিও না। বিক্রি করে দাও। বেশী টাকা পাবে। এখন সোনার ভরি একশ কুড়ি টাকা। চব্বিশ শ টাকা পাবে। তিন চার মাস চলবে। এরই ভিতর নিশ্চয় একটা সুবিধা হয়ে যাবে।

তিরিশ বছর আগে আমরা যখন সিংহগড়ে ছিলাম, তখন এক ভরি সোনার দাম কুড়ি টাকা আর একখানা গিণির দাম পনরো টাকা ছিল। এক শ টাকা মাইনে হলেও সেখানে জিনিসপত্র জলের দরে বিক্রি হত। আমি টেনেটুনে সত্তর ভরি সোনার গয়না আর পঁচিশখানা গিণি করেছিলাম। মশাই তো শুধু বই কিনতেন। আমি ঝগড়া করে গয়না গড়াতাম। তারপর হেসে বললেন, এখন মশাই, বুঝে দেখুন। গয়নাগুলো ছিল বলে অসময়ে কত কাজে লাগল।

শিবনাথ বললেন, তা তো লাগল। কিন্তু তোমার হাতে কি রইল?

শিবানী বললেন, আমি গয়না গড়াতাম বটে, কিন্তু চলতি দু-একখানা ছাড়া সব গয়না কোনদিন পরিনি। গয়না পরে পুতুল সেজে বেরোতে আমার লজ্জা করত। আমার গয়না বাক্সই পরত। আমি পরতাম না। পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হয়ে গেল। বুড়ী হয়ে গেছি। গয়নাগুলো থাকলে বউরা পেত, এইমাত্র। কিন্তু তাদের বাপের বাড়ির গয়না আছে। আর বেশী গয়না কি হবে? মানুষ সোনা রাখে আটক রক্ষা করার জন্যে। আমার গয়না সার্থক হল। এই আমার আনন্দ। তোমাকে সামনে রেখে আর ছেলেপুলেদের সুস্থ রেখে শাঁখা সিঁদুর নিয়ে মরতে পারি তো আমি স্বর্গে যাব। তিনি হার ও চুড়ি এনে শিবনাথকে দিলেন। তারপর বললেন, যখন দায়িত্ব তোমার ঘাড়ে, তখন যে কোন উপায়ে কাজ উদ্ধার করতে হবে। আমার গয়না তোমার কাজে লাগল। তাতেই আমি সুখী। তুমি লজ্জিত হয়ো না। আমার স্থির বিশ্বাস কলেজের এই দুর্দিন কেটে যাবে। কষ্টের মধ্যে ফেলে ভগবান মানুষকে পরীক্ষা করেন। কষ্টের পর সুখ আসে। সন্তানের মুখ দেখে মা প্রসব বেদনার কষ্ট ভুলে যান। সৃষ্টির দুঃখ আছে। আবার আনন্দও আছে।

শিবনাথ বললেন, তা জানি। তবে তোমার দান হিসাবের খাতায় লিখতে হবে। শিবানী বললেন, কোন বন্ধুর দান বলে লিখবে। নাম থাকবে না। এ কি আর দান? প্রকৃত দান হিসাবের ভিতরে ধরা দেয় না। বিদ্যাসাগর মশাই কি হিসাব করে দান করতেন? হিসাব করে দান আর ওজন করা প্রেম ব্যবসাদারী। অতি জঘন্য বস্তু। আমাদের কথা মানুষ জানবে না। তারপর আকাশের দিকে আঙ্গুল তুলে বললেন, ওঁর কাছে কিছু লুকানো থাকে না।

তুমি মাঝে মাঝে বিরক্ত হয়ে বল, এখানকার লোক বড় মন্দ। এদের জন্যে কাজ করতে ইচ্ছা হয় না। শুনে, আমি বেদনা পাই। তুমি পুরুষ মানুষ। তোমার কাজ ঘরের বাইরে। তুমি কত লোকের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ পাও। তার উপর তুমি বিদ্বান। কত বই পড় নিজের জ্ঞান লাভের জন্যে। কত বই লেখ অপরকে শিক্ষা দেবার জন্যে। আমি মধ্যবিত্ত বাড়ির বউ। আমার কাজ ঘরের ভিতরে। আমি লেখাপড়া কম জানি। কিন্তু লোক-চরিত্রে তোমার জ্ঞান অল্প। তুমি মানুষ চেন না তোমার বিদ্যা ছাত্রের কাজে লাগে। সাংসারিক জ্ঞানে তুমি বালক। তুমি আদর্শবাদী। স্পষ্ট কথা বল। পৃথিবীতে আদর্শবাদীর স্থান নেই। স্পষ্টবাদীর শত্রু সৃষ্টি হয়। তুমি সকলকে ভালো মনে কর। বিশ্বাস কর। তাদের ব্যবহার দেখলে পিছিয়ে পড়। তুমি ভুলে যাও যে, কাজ করতে গেলে প্রশংসা আছে, নিন্দাও আছে। মানুষের মুখে হাত চাপা দেওয়া চলে না। যে যা বলে বলুক। কাজ করে যেতে হবে। কাজ করতে বসে কাজ করতে ইচ্ছে হয় না বললে নিজের কাছে অপরাধী হতে হয়।

শিবানীর কথা শুনে শিবনাথ মৃদু হেসে বললেন, নিজের কাছে অপরাধী হয়েছি বটে। আবার তোমার কাছেও অপরাধী হয়ে আছি।

শিবানী ভাবলেন, হয়তো তাঁর গয়নাগুলি নিয়েছেন বলে শিবনাথ তাঁর কাছে নিজেকে অপরাধী মনে করছেন। বললেন, তুমি অপরাধী হবে কেন? আমি তো স্বইচ্ছায় হাসিমুখে তোমার কাজে কিছু সাহায্য করার জন্যে কর্তব্যবোধে গয়নাগুলি দিয়েছি।

শিবনাথ বললেন, না, না, সেজন্যে নয়। তোমাকে না জানিয়ে তোমার নামে আমার নিজের লাইব্রেরিটি কলেজকে দিয়ে দিয়েছি।

—ভালোই করেছ। এটা কি অপরাধ? কলেজের একটি অভাব মিটে গেল।

—তুমি কি পাগল? কলেজের লাইব্রেরি সম্বন্ধে তোমার কোন ধারণা নেই। কলেজের লাইব্রেরির অভাব এত সহজে ও সস্তায় মিটে না। কলেজ লাইব্রেরিতে বড় বড় পণ্ডিতদের লেখা নানা বিষয়ের দামী বই রাখতে হয়। এ তো আর বটতলার ডিটেক্‌টিভ্‌ সিরিজের বই নয়। কলেজের জন্যে একটা ভালো লাইব্রেরি করতে গেলে অন্ততঃ লাখ খানেক টাকা প্রয়োজন।

—তোমার লাইব্রেরিতে বিশ-পঁচিশ হাজার টাকার বই ছিল নিশ্চয়ই।

—তা কখন হয়? বড় জোর দশ হাজার টাকার বই হতে পারে।

—সে কি গো? তুমি তো সারাজীবন বই কিনছ। কত লোকের কত রকমের শখ আছে। তোমার শখ বই কেনা, বই পড়া, বই বাঁধিয়ে সোনার জলে নাম লিখিয়ে আলমারিতে সাজিয়ে রাখা। বই কেনার সময় তুমি দামের কথা ভাব না। হাতে পয়সা না থাকলে বই-এর দোকান থেকে ধারে বই কেন।

তারপর অবাক হয়ে বললেন, সব বই দিয়ে দিলে? তুমি বাঁচবে কি নিয়ে?

—কেন, কলেজের লাইব্রেরি থেকে বই এনে পড়ব।

—কিন্তু বইগুলি তো তোমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পুঁজি। ছেড়ে দিতে কষ্ট হল না?

—বাঙ্গালী মেয়েদের শ্রেষ্ঠ পুঁজি গয়না—যাকে স্ত্রীধন বলা হয়। অর্থাৎ স্বামীর অবর্তমানে বেঁচে থাকলে গয়নাই তার স্বামী-পুত্রের কাজ করে। এজন্যে মেয়েরা গয়নাকে আঁকড়ে থাকে। তোমার শ্রেষ্ঠ পুঁজি তুমি ছেড়ে দিতে পারলে। আমি আমার শ্রেষ্ঠ পুঁজি ছাড়তে পারব না কেন? ভালবাসার বস্তুকে হাসিমুখে ত্যাগ করাই তো প্রকৃত ত্যাগ। এই ধরনের ত্যাগই যথার্থ ভোগ।

॥ বিয়াল্লিশ ॥

কুসুমপুরের বাড়ির কাছে স্টেশনে যাওয়ার রাস্তার ধারে তেলেভাজা ও চায়ের দোকান। ফুটো টিনে ছাওয়া ছিটে বেড়ার ঘর। একটা বারকোশে সাজানো বেগুনি, ফুলুরি আর দশ-পনরোখানি পুরির তাক। পাশে ডাঁটি ভাঙ্গা দশ-বারোটা সস্তা দামের চায়ের বাটি। দোকানের মালিক সোনাদা এ অঞ্চলের বিখ্যাত মানুষ। বয়স চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ। গম্ভীর প্রকৃতির লোক। ললাট কুঞ্চিত। চোখ দুটি আমড়ার মতো গোল। ওষ্ঠাধর হাসির রেখাবর্জিত। মুখ-চোখে চপলতার লেশ মাত্র নেই। চটকলের কুলীমজুররা তাঁর বাঁধা খদ্দের। ধারে খেত। শনিবার হপ্তা পেলে ধার শোধ করত। সোনাদা বসতেন একখানা ময়লা পুরু চটের আসনের উপর চায়ের জল গরম করার জন্যে কয়লার আঁচের উনুনের ধারে। বাইরে একখানা নড়বড়ে বেঞ্চি। সেখানে পাড়ার ছেলেরা জটলা পাকাত। সোনাদাকে ঘাঁটিয়ে তাঁর লাখ-পঞ্চাশী কথা শুনত, গাল খেত আর হাসত। রাস্তার পরিচিত অপরিচিত পথচারীদের সোনাদার খপ্পরে পড়তে হত। অপরিচিতদের নাম ধাম ও ঠিকানা বলতে হত। পরিচিতদের খুঁটিনাটি খবর দিতে হত। দোকানটা যেন পুলিসের আউটপোস্ট।

শিবনাথবাবু দোকানের সুমুখ দিয়ে যাচ্ছেন দেখে সোনাদা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন। শিবনাথ থমকে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, সোনাবাবু, কোন দরকার আছে?

সোনাদা ধীরভাবে বললেন, আজ্ঞে, এমন কিছু নয়। তারপর সবিনয়ে বললেন, দয়া করে এদিকে একটু আসুন।

শিবনাথ দোকানের দিকে এগিয়ে গেলেন। সোনাদা দৌড়ে গিয়ে ছোট একটা টুল এনে তাঁকে বসতে দিলেন। পাশ থেকে একটি পরিষ্কার পেয়ালায় গরম চা ভরতি করে তাঁর হাতে দিয়ে বললেন, একটু চা খেতে হবে। ছাড়ছি নে।

শিবনাথ দেখলেন, বাঘে ছুঁলে আঠার ঘা। সোনাদার বিনয় ও ভদ্র ব্যবহার দেখে শিবনাথ তাঁর অনুরোধ ঠেলতে পারলেন না। তিনি চা

খাচ্ছেন, এমন সময় এক মেছুনীকে এক ঝাঁকা মাছ নিয়ে রাজারে যেতে দেখে সোনাদা ছুটে গিয়ে তার ঝাঁকা নামিয়ে বললেন, তোর এই ছটকা চিংড়ির দাম কত? মেছুনী রেগে বলল, তুমি কি চোখের মাথা খেয়েছ? গলদা চিংড়ি দেখতে পাচ্ছ না? তিনি বললেন, যা যা মাগী, বেশী বকিস নে। আমাকে আর গলদা চিংড়ি দেখাতে হবে না। একি গলদা চিংড়ি? আমরা ছেলেবেলা ছকু চক্কোত্তির পুকুরের গলদা চিংড়ির খোলায় চড়ে পুকুরের এ-পার ও-পার হয়েছি। আর একজন মেছুনী বললে, বাবু এই রুই মাছটা দেখুন না। সোনাদা হাত নেড়ে অঙ্গভঙ্গী করে বললেন, এ আবার রুই মাছ? ওরে, ছকু চক্কোত্তির দীঘির রুই মাছ যখন ঘাই দিত তখন লোকের বাড়ির দোর-জানালা থর থর কেঁপে উঠত। মেছুনী চটে গিয়ে বলল, এক পয়সার মাছ কিনবে না। বড় বড় কথা শোনাচ্ছে! যাও যাও, আর মাছ দেখতে হবে না। ছেড়ে দাও। বাজারের বেলা হয়ে যাচ্ছে। সে চলে গেল। সোনাদা দৌড়ে গিয়ে আর একটি মেয়ের মাথা থেকে আনাজের ঝোড়া নামিয়ে বললেন, তোর এই কড়ির মতো বেগুন, কড়ে আঙ্গুলের মত ঢেঁড়স, কুলের মতো গোল ঝিঙ্গে খদ্দের পয়সা দিয়ে কিনবে? পয়সা এত সস্তা না কি রে? গয়লাকে দেখতে পেয়ে মেয়েটির আনাজের ঝোড়া ছেড়ে দিয়ে তাকে বললেন, তোর দুধ জোলো। দই জলবৎ তরল। পাতে দিলে স্রোত বইবে। একে মানুষ খায় না কি? গয়লা কথা না বলে চলে যাচ্ছে দেখে সোনাদা বললেন, বেটা একেবারে লাট সাহেব। তর সয় না। যা বেটা, মর গে যা।

সোনাদা এসে দোকানে বসলেন। শিবনাথ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, সোনাবাবু, আপনার দোকানটি বিশ বছর একভাবে আছে দেখছি। কিছু উন্নতি হল না?

সোনাদা মৃদু হেসে বললেন, দেখুন, উন্নতি হলেই অবনতি হয়। চিরকাল সমান চলে না। কাজ কি এমন উন্নতি করে? চোখের সামনে দেখলাম কত বেটা জাল-জোচ্চুরি করে কাঁকর-মেশানো চাল, ভেজাল তেল-ঘি বিক্রি করে দু-পাঁচ বছরের ভিতর বড় লোক হল। পাকা বাড়ি তুলল। মোটর হাঁকাল। সোনাদানায় বউ-এর গা ভরে দিল। এখন তাদের কি হাল হয়েছে দেখুন। বাড়ি বন্ধক পড়েছে। গাড়ি বিক্রি হয়ে গেছে। বউ-এর হাতে শাঁখা আর গলায় একটা সুতার মতো হার। কোথায় গেল

বাড়ি-গাড়ি, শালদোশালা, বেনারসী শাড়ি, সোনাদানা? আমি কিন্তু ঠিক আছি। ভাগ্যের দাবা খেলা দেখছি। তার ঘুঁটি হতে চাই না। তাই তো বলি—

কত লোক হল নিপাত,
বসে দেখছি ভূতনাথ।

আমার বাড়তি-কমতি নেই। ওঠা-নামা নেই। কথায় বলে—

অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে।
অতি ছোট হয়ো না ছাগলে মুড়িয়ে খাবে।

এমন সময় হঠাৎ সোনাদার চোখে পড়ল দু-তিনটি প্রৌঢ়া মেয়ে একটি দশ বছরের বালিকাকে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সে কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করে বলছে, তোমরা আমায় ছেড়ে দাও গো। আমি অমন মুখপোড়া বরের ঘর করব না গো। সোনাদা দৌড়ে গেলেন। শুনলেন, মেয়েটির বর তাকে একখানা লাল ডুরে শাড়ি কিনে দিতে পারেনি বলে সে রাগ করে বাপের বাড়িতে পালিয়ে এসেছে। সোনাদা পাশের দোকান থেকে একখানা লাল ডুরে শাড়ি কিনে মেয়েটির হাতে কাপড়খানি আর আট আনা পয়সা দিয়ে বললেন, এবার বরের কাছে যা। মেয়েটি আনন্দে হাসতে হাসতে চলে গেল।

দোকানে ফিরে এসে বাক্স থেকে দুটি টাকা বের করে শিবনাথবাবুকে বললেন, গরীবের এই দুটি টাকা চাঁদা নিতে কোন বাধা আছে কি? শিবনাথ আনন্দিত হয়ে বললেন, সৎকাজের জন্যে চাঁদা নিতে আবার বাধা কি? অনেকে আট আনা পর্যন্ত দিয়েছে। আপনার দু টাকার মূল্য দু লাখ টাকা। টাকা নিয়ে রসিদ কেটে দিয়ে সোনাদাকে ধন্যবাদ জানিয়ে শিবনাথ চলে যাচ্ছেন, এমন সময় পাশ থেকে একটা দুষ্টু ছেলে চেঁচিয়ে বলে উঠল— ওরে, আমাদের সোনাদা ছাই-ঢাকা আগুন রে! সে একটা মেয়েকে নতুন কাপড় কিনে দিল, আবার নগদ দু টাকা চাঁদা দিয়ে ফেলল! আমাদের সোনাদা যেমন দরদী তেমনি দানী! সোনাদা চটেমটে কটমট চেয়ে বললেন, দ্যাখ ছোঁড়া, ভদ্রলোকের সামনে ফাজলামি করিস নে। লঘুগুরু জ্ঞান নেই? ইয়ার্কি করার জায়গা পাওনি! ছেলেটা ভয়ে দৌড়ে পালিয়ে গেল।

পথে আসতে আসতে শিবনাথ ভাবলেন, দুষ্টু ছেলেটা ঠিক বলেছে।

সোনাদা সত্যিই ছাই-ঢাকা আগুন। শক্ত পাথরে গাছ জন্মায় না, কিন্তু তার নিচে স্নিগ্ধ জলের ধারা বয়ে চলে। সোনাদার মতো ছাপোষা দরিদ্র লোকের প্রাণ আছে কিন্তু টাকা নেই। পুঁজিপতিদের টাকা আছে, হৃদয় নেই। এদের উপর নির্ভর করে ব্যয়সাধ্য একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সম্ভব নয়। এজন্যে স্থায়ী নির্ভরযোগ্য আর্থিক সাহায্য প্রয়োজন।

॥ তেতাল্লিশ ॥

এদিক-ওদিক থেকে সংগৃহীত সামান্য চাঁদা, ছাত্রদত্ত বেতন এবং শিবানীর গয়না বিক্রির টাকায় মৃতকল্প প্রতিষ্ঠানটির জীবন কোন রকমে রক্ষা পেল। কিন্তু বিধাতার মঙ্গল হস্তস্পর্শে অনেক সময় কালের কুটিলা গতিও সহজ সরস হয়ে যায় এবং জীবনের মোড় ফিরে যায়।

কলকাতার কলেজগুলি থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের ভিড় কমানোর জন্যে গ্রামাঞ্চলের সদ্যোজাত উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিকে সাহায্য করার জন্যে জাতীয় সরকার প্রচুর অর্থ বরাদ্দ করেছিলেন। তাদের এই কালোপযোগী সাহায্য উষর ক্ষেত্রে শীতল বারিপাতের মতো ফলপ্রসূ হয়েছিল। শিবনাথ এই স্বর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে বিলম্ব করেন নি। সরকার সন্তুষ্ট হয়ে নানাভাবে সাহায্য করলেন। কলেজটির স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না। প্রতিষ্ঠান-টির জীবনের এবং উন্নতির রাস্তা খুলে গেল।

আনন্দে শিবনাথের চোখে জল এসে গেল। এত দিনে সার্থক রূপ পেল শিবনাথের সাধনা।

শিবনাথ কলেজের অফিসে বসে কাজ করছেন। তখন পরীক্ষার ফি এবং কলেজের বেতন জমা দিতে দুদিন বাকী আছে। একটি ছেলে দরজার পর্দা সরিয়ে ভয়ে ভয়ে ঘরে ঢুকে শিবনাথের টেবিলের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগল। তার কান্নার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, স্যার, আমি অত্যন্ত গরীব। কলেজে একশ একুশ টাকা জমা না দিলে পরীক্ষা দিতে পারব না।

শিবনাথ বললেন, কেঁদো না। কত টাকা যোগাড় করেছ?

সে উত্তর দিল, মার একটি সরু হার বন্ধক দিয়ে মাত্র পঞ্চাশ টাকা যোগাড় করেছি। আমার বাবা নেই, মা ধান ভেনে সংসার চালান। ঠিক সময়ে বেতন দিতে পারেন না।

—এতদিন চুপ করে বসেছিলে কেন ? সময় থাকতে জানালে কোন ব্যবস্থা করা যেত।

—বলতে সাহস হয়নি। দেখছি আপনি টাকার জন্যে কত ছুটোছুটি করছেন। আপনার চেষ্টায় কলেজটি হয়েছে বলে পড়তে পারছি। এত সুবিধা পাচ্ছি। জেনেশুনে আপনাকে বিরক্ত করতে লজ্জা বোধ করেছি। তার কথাগুলি শিবনাথের হৃদয় স্পর্শ করল।

ছেলেটি সে বছর আই. এ. পরীক্ষা দেবে। বয়স আঠারো-উনিশ। পায়ে জুতা নেই। পরণে আধময়লা সাধারণ ধুতি। গায়ে একখানা আধময়লা সুতীর চাদর। মাথার চুল উস্কো-খুস্কো। মুখে ঈষৎ গোঁফের রেখা।

তার কাতর নিবেদন ও বিবেচনার কথা শুনে শিবনাথ বললেন, তোমাদের মতো দরিদ্র ছেলেদের জন্যেই এই কলেজ হয়েছে। বড় লোকের ছেলেরা বেশী টাকা খরচ করে কলকাতার কলেজে পড়তে পারে। তোমাদের মতো দরিদ্র ছেলেরা ঘরের খেয়ে আর বেতনের কয়েকটা টাকা যোগাড় করে দিতে পারলে এখানে পড়াশুনা করতে পারে। এই কলেজটি গরীবের জন্যেই হয়েছিল। আচ্ছা, তুমি নগদ পঁচিশ টাকা দাও। পরীক্ষার ফি আমি যোগাড় করে দেব। বেতনের বাকী টাকা ছেড়ে দিলাম। আর পঁচিশ টাকা হাতে রেখো। জলটল খাবে।

ছেলেটি কৃতজ্ঞতায় অভিভূত হয়ে কেঁদে ফেলল। শিবনাথ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, ভাল করে পড়াশুনা করো। যেন প্রথম বারেই পাস করতে পার। সে তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে চলে গেল।

একটি দুস্থ বাঙালী পরিবারের এই ছেলেটির মা নিজের একমাত্র সম্বল একভরি সোনার হারখানি বন্ধক দিয়ে ছেলেকে টাকা দিয়েছেন। ধান ভেনে সংসার চালিয়েছেন। কষ্টেসৃষ্টে দেড় বছর ছেলের বেতন জুগিয়ে এসেছেন। লেখাপড়া শিখে ছেলে মানুষ হবে। তাদের দুঃখের শেষ হবে। এই তাঁর আশা। মানুষ হওয়ার জন্যে ছেলেটির অদম্য উৎসাহ, অনাথিনী জননীর ত্যাগ স্বীকার, দুঃখ বরণ বাংলা দেশেই সম্ভব। পাস করে সে হয়তো শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি করবে। হয়তো একটা ছোটখাটো

চাকরি যোগাড় করে কোনরকমে দিন গুজরান করবে। কিন্তু তার মা ও সে তা ভাবে না। ছোটবেলা থেকে সে নকরি করতে ছোটে নি। গামছা কাপড় ফেরি করে টাকা জমিয়ে ভবিষ্যতে শেঠজী হতেও চায়নি। সে চায় লেখাপড়া শিখতে। আত্মোন্নতি করতে। মানুষ হতে। আর পেট চলার মতো সামান্য টাকা উপায় করতে। এই ক্ষুদ্র সাধারণ ঘটনাটি বাঙালী জাতির প্রকৃতি ও মনোভাবের উপর আলোকপাত করে। বাঙালী ছেলেকে মূর্খ বড়লোক করতে চায় না। অন্য জাতির সঙ্গে বাঙালীর এই প্রভেদ। এই তার জাতীয় বৈশিষ্ট্য। আবার এই জন্যেই তার এত আর্থিক কষ্ট।

একটু পরে একটি ভদ্রলোক অফিসে উপস্থিত হলেন। ভদ্রলোকের নাম কালিবাবু। যুদ্ধের বাজারে ধান, চাল ও কয়লার কণ্ট্রোলের দোকানের মালিক ছিলেন এই কালিবাবু। কালোবাজার করে বেশ দু পয়সা কামিয়ে নিয়েছিলেন। ইংরেজ যুগে অফিসারদের তাঁবেদারী করতেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ইনি ভোল পাল্‌টে ফেললেন। খদ্দরের নামাবলী গায়ে দিয়ে উৎকট কংগ্রেসী হয়ে গেলেন। বিদ্যে থার্ড ক্লাস পর্যন্ত হলেও একটা হাইস্কুলের সেক্রেটারি। স্থানীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। উপরের কংগ্রেস মহলে খুব নাম। কংগ্রেসের অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। বিধান সভায় কংগ্রেস-মনোনীত প্রার্থীর দালাল। ইলেকশনের সময় রাত্রে ঘুম কামাই করে লণ্ঠন হাতে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান। ঘাটিতে ঘাটিতে লুকিয়ে দালালদের এবং গ্রাম-প্রধানদের টাকা ও গম দিয়ে আসেন। তিনি বললেন, আমার গোমস্তার একটি ছেলে এ বৎসর আপনার কলেজ থেকে পরীক্ষা দেবে। বড় গরীব। তার কলেজের মাইনে ছেড়ে দিতে হবে। শিবনাথ বললেন, কলেজের খুব টানাটানি চলেছে। আপনার গোমস্তার ছেলের মাইনেটা তো আপনিই দিতে পারেন। আপনার অভাব কি? তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, অতশত কথা শুনতে আসিনি। টাকা ছেড়ে দেবেন কি না বলুন। শিবনাথ দৃঢ়কণ্ঠে বললেন, না। অনুগ্রহ চাইতে এসে অত মেজাজ দেখাচ্ছেন কেন, মশায়? কলেজে একটা কানা কড়ি চাঁদা দেননি। কোন রকম সাহায্য করেননি। বরং পঞ্চমুখে এই নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির নিন্দা করেছেন। আজ কোন্ মুখে টাকা ছেড়ে দেবার জন্যে অনুরোধ করছেন?

—আচ্ছা দেখা যাবে। সাবধানে থাকবেন।

এই কথা বলে তিনি গট্‌গট্‌ করে চলে গেলেন।

অর্থ ও ক্ষমতা গর্বে স্ফীত এই ভদ্রলোকটির উদ্ধত কথা শুনে শিবনাথ ব্যথিত হলেন। ভাবলেন, এককালে ইংরেজের প্রসাদপুষ্ট এই দাঁড়কাকগুলো এখন ময়ূর হয়ে গেছে। পূর্বে এরাই পুলিসের গোয়েন্দাগিরি করেছে। কত ছেলেকে জেলে পাঠিয়েছে। এরাই এখন স্বাধীনতা দিবসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে দেশভক্তির উচ্ছ্বাসে বিহ্বল হয়ে উঠে। বল্ মা তারা, দাঁড়াই কোথায়! বেলা হয়ে গেছে দেখে শিবনাথ অফিস থেকে উঠে গেলেন।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

কয়েক বৎসর কেটে গেছে। শিশু প্রতিষ্ঠানটি কৈশোরে পদার্পণ করেছে। ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে আয়ও বৃদ্ধি হয়েছে। ক্ষমতা লাভের জন্যে শিবনাথের গুণমুগ্ধ বন্ধু এবং ভক্তিমান প্রাক্তন ছাত্র সদস্যদের গোপন চক্রান্ত এবং দলীয় রাজনীতি একটি অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। একদিন সন্ধ্যার সময় বেদনাবিক্ষুব্ধ চিত্তে শিবনাথ দীঘির পাড়ে শান-বাঁধানো বেদীর উপর বসে নিজের ভবিষ্যৎ কর্ম পন্থার কথা ভাবছিলেন। আট বছর আগে এই দীঘির জঙ্গলপূর্ণ পাড়ে বর্ষার জলসিক্ত শ্যামায়মান তৃণাস্তরণের উপর বসে একদিন শিবনাথ তাঁর সদ্যোজাত মানস সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুখস্বপ্নে বিভোর হয়েছিলেন। আজ তাঁর স্বপ্ন সফল হতে চলেছে। এই সময় কালবৈশাখীর ঘনায়মান মেঘের নিচে তাঁর মাথার উপর কদম গাছের শুষ্ক পল্লবের ভিতর দিয়ে প্রবল ঝড়ের তাণ্ডব আরম্ভ হল দেখে তিনি উঠে গেলেন। যে গৃহের প্রতিটি ইট তাঁর বুকের রক্তে গাঁথা, যে পবিত্র স্থানের প্রতিটি ধূলিকণা তাঁর পদস্পর্শে মুখর, যেখানকার প্রতিটি নারিকেল ও আম্র বৃক্ষ তাঁর নিজ হস্তে রোপিত, তাঁর স্বহস্ত রচিত পুষ্পোদ্যানের মালতী বিতান, মাধবী গুচ্ছ, কৃষ্ণচূড়া ফুলের রক্ত মঞ্জরী, আর প্রান্তসীমার বেড়ার প্রস্ফুটিত কেতকী—নিষ্ঠুর হস্তে তাদের মায়াজাল ছিন্ন করে তিনি তাদের সকলের কাছে বিদায় নিলেন। যারা তাঁকে একটি গুরুভার

কর্তব্যের দায়িত্ব থেকে মুক্তি দিয়েছে তিনি তাদের আশীর্বাদ করে বললেন, তোমারি ইচ্ছা হউক পূর্ণ, করুণাময় স্বামী!

কয়েক দিন হল শিবনাথ কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। সুশোভন বিনয়কে জিজ্ঞাসা করল, স্বাধীনতা আসা সত্ত্বেও এ-দেশের মানুষের মন বিন্দুমাত্র বদলায় নি কেন? দেখছি ইংরেজ আমলের দুষ্ট-প্রকৃতির লোকগুলো রাতারাতি দেশ-সেবক হয়ে উঠেছে। বিপ্লবের আগুনে এরা পুড়ে ছাই হয়ে গেলে হয়তো আমাদের সমাজ-জীবন নতুন করে গড়ে উঠত। বিনয় উত্তর দিল, পৃথিবীতে অনেক স্বাধীন দেশ আছে। সেখানেও তো কত কালাপাহাড়, কত দুঃশাসনের জন্ম হয়েছে। তারা কত অনর্থ সৃষ্টি করেছে।

—কিন্তু তাদের সমাজে এত দুর্নীতি আছে কি?

—নিশ্চয়ই আছে। দুর্নীতি কোথায় নেই? শুনছি স্বর্গেও নাকি আছে।

—কিন্তু বাংলা দেশের সমাজে ও পরিবারে লোক এত স্বার্থপর হয়ে গেল কেন? আগে তো এমন ছিল না। তখন মা-বাবা স্ত্রী-পুত্র ভাই-বোন স্বামী-স্ত্রী এক সংসারেই থাকত। কেউ বেশী, কেউ কম টাকা উপায় করত। প্রত্যেকে হাসিমুখে ত্যাগ স্বীকার করত। এখন সব উল্টে গিয়েছে। পরিবারের যে ব্যক্তি বেশী টাকা উপায় করে, তার ছেলেমেয়েরা ভালো জামা কাপড় পরে; দুধ খায়, লুচি খায়, ভালো স্কুলে পড়ে। যে কম উপায় করে বা করে না, তার ছেলেমেয়েরা খালি গায়ে থাকে, ছেঁড়া জামা কাপড় পরে, মুড়ি খায়, লেখাপড়া শেখে না। এখন টাকা ভালবাসার স্থান দখল করেছে। এখন টাকাই ধর্ম, টাকা ইহজগৎ, আর পরজগৎ হয়ে উঠেছে। মানুষ ত্যাগ করতে ভুলে গিয়েছে। আত্মকেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছে। সকলেই স্বার্থের দাস হয়ে উঠেছে। ঠাকুরদা গরীব ছিলেন। বাবার লেখাপড়ার জন্যে পয়সা খরচ করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যায়নি। তিনি টিউসন করে নিজের ভাই-এর কলকাতায় পড়ার খরচ চালিয়েছেন। ছোট ভাই বার বার ফেল করেছে। তবু তার পড়া বন্ধ হয়নি। চাকরি করার পর তিনি ভাইকে মাসে মাসে পড়ার খরচ পাঠিয়েছেন। বাড়িতে বাবা-মাকে টাকা দিয়েছেন। বন্ধুর বিলেত যাওয়ার দেনা শোধ করেছেন। বাবার নামে জমি কিনেছেন। মা-বোন ভাইবউ

ও স্ত্রীকে গয়না গড়িয়ে দিয়েছেন। নিজের ছেলেমেয়ের মতো ভাই-এর মেয়েদের খাইয়েছেন, পরিয়েছেন, বাছ-বিচার করেন নি। ভাই কি পর? এক জোড়া শাড়ি এনে দিলে মা একখানা নিজে পরেছেন, আর একখানা কাকীমাকে দিয়েছেন। তাঁরা যে একবাড়ির বউ। দু জা দু বোনের মতো হাসিমুখে ঘরকন্না করেছেন। এজন্যে সংসারে সুখ ছিল, শান্তি ছিল; অভাব থাকলেও হিংসা ছিল না। দেশ স্বাধীন হল, আর পরিবারে ও সমাজে সব ওলট-পালট হয়ে গেল!

—এটা স্বাধীনতার দোষ নয়। চল্লিশ বছর আগে পরিবার কৃষি-নির্ভর ছিল। জমিই ছিল একমাত্র সম্পত্তি। জমিতে প্রচুর ধান হত। ধান ছিল ভরণপোষণের একমাত্র উপায়। মেয়েরা চরকায় সুতো কেটে কাপড় বুনিয়ে নিত। বিলাসিতা ছিল না। বাস্তু-সংলগ্ন ডাঙ্গায় তরিতরকারি ফলত। জমির ধান, পুকুরের মাছ, আর গোয়ালের গরুর দুধ ছিল। সকলের মাথার উপর একজন কর্তা ছিলেন। তাঁর কথা সকলে মেনে চলত। তিনি ছিলেন সকলের যোগসূত্র। চাকরি করার জন্যে কেউ বাইরে যেত না। ইংরেজ বণিক সস্তা মাল আমদানি করল। ভারতবর্ষের টাকা বাইরে চলে যেতে লাগল। কিন্তু অন্নের স্বচ্ছলতা ছিল। ধনের মর্যাদা এত বেশী ছিল না। টাকাকে এত উচ্চ আসন না দেওয়ার ফলে আমাদের মনে হীনতা ছিল না। সামান্য একটু ইংরেজী শিখে লোক অফিস আদালতে, সওদাগরী প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে লাগল। মাস কাবার হলে নগদ টাকার মুখ দেখতে লাগল। আয়ের তারতম্য ঘটল। তার সঙ্গে রুচি ও জীবন ধারণ প্রণালীর তারতম্য হল। চাকরির জন্য মানুষ পরিবার থেকে দূরে থাকতে বাধ্য হল। কেন্দ্রচ্যুত হয়ে গেল। এজন্যে পরিবার ও সমাজের রূপ বদলে গেল।

এখন পরিবারের সমস্ত লোক একটা আস্ত জিনিস নয়। আলাদা ব্যক্তি মানুষ। সে ভাবে না তার ভাই আর ভাই-এর ছেলে মেয়ের কথা, আত্মীয়-স্বজনের দুরবস্থার কথা। সে নিজের ছেলেটিকে পড়াতে চায়, মেয়েটির ভালো বিয়ে দিতে চায়। নিজের আলাদা বাড়ি চায়। স্ত্রীকে গয়না কাপড় দিয়ে ভালো করে সাজাতে চায়। নিজের লোকগুলিকে ভালো খাওয়াতেপরাতে চায়। চাইবার সময় অপরের কথা ভাবে না। আগে অভাব কম ছিল। সামান্য পরিশ্রমে সে অভাব সহজে মোচন হত। এখন

প্রত্যেকে নিজের সুখের জন্যে অভাব বাড়িয়ে চলেছে। অভাব ক্রমে বেড়েই চলেছে। এজন্যে অনেক পরিবার ভেঙ্গেছে, আরও ভাঙ্গবে। পরিবারের সঙ্গে সমাজও ভেঙ্গেছে। পরিবার নিয়েই তো সমাজ। পরিবারের লোক স্বার্থপর হয়ে গেল, আর সমাজ খাঁটি থাকবে?

—এজন্যে কি মানুষ দল বেঁধে অন্যায় করবে? কেউ প্রতিবাদ করবে না?

—পৃথিবীতে কত বড় বড় অন্যায় করা হচ্ছে। তার প্রতিকার কে করবে? প্রতিকার করার মতো সাহস ও মনোবল কোথায়?

—মানুষ এমন হয়ে গেল কেন?

—এর কারণ আদর্শহীনতা ও সৎদৃষ্টান্তের অভাব। তবে আমরা এখন একটা বিরাট পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে চলেছি।

Old order changeth, yielding place to new. রাষ্ট্রে সমাজে পরিবর্তন স্বাভাবিক নিয়ম। নিয়ম মেনে চলতে সকলে বাধ্য। সময়ের কাছে মানুষ চিরকাল অসহায়। সময় সমস্যা সৃষ্টি করে। সময়ই তার সমাধান করে। আমরা জোর করে কিছুই করতে পারি না।

—পরিবর্তনটা কি শুধু খারাপের দিকে হয়? ভালোর দিকে হয় না?

—পরিবর্তন ভালোর দিকেও হচ্ছে। সেটা তোদের চোখে পড়ছে না।

—তা আর চোখে পড়ছে না? স্বাধীনতার রাঙ্গা ফল খেয়ে আমাদের পেট ভুটভুট করছে। বল কি? পরিবর্তন চোখে পড়ছে না? মানুষ খেতে পাচ্ছে না। পরতে পাচ্ছে না। মাথা গুঁজে থাকার স্থান পাচ্ছে না। গ্রাম-বাংলার দুর্দশার সীমা নেই। সব জায়গায় বাস্তুহারার ভিড়। লক্ষ লক্ষ লোকের বস্তিতে বাস। লক্ষ লক্ষ বেকার। ভিক্ষুকের জ্বালায় পথ চলার উপায় নেই। রেলগাড়িতে, ট্রামে, বাসে শান্তিতে বসে যাওয়ার জো নেই। সারা দেশটা ভিক্ষুকে ভরে গেল যে! বল কি বিনয়দা? পরিবর্তন আমাদের চোখে পড়ছে না? শাসকদের গায়ের রঙ পালটেছে। পেন্টালুনের জায়গায় খদ্দরের ধুতি চাদর, হ্যাটের জায়গায় গান্ধীটুপি, রাজারানীর ছবির জায়গায় গান্ধীজীর ছবি, ইউনিয়ন জ্যাকের জায়গায় তিনরঙ্গা পাতাকা, লাটের জায়গায় রাজ্যপাল আর ডজন তিনেক মন্ত্রীর গাঁদি লেগে গেছে। একি পরিবর্তন নয়? আসল কথা কি জান, বিনয়দা?

মানুষের প্রকৃতিকে সম্পূর্ণ বদলাতে না পারলে প্রতিষ্ঠানকে বদলানো যায় না। কারণ, তার অপরিবর্তনীয় অংশটি পরিবর্তনের ভিতরেও উঁকিঝুঁকি মারে আর পরিবর্তনের পালা শেষ হয়ে গেলে মানুষের ভিতর অপরিবর্তনীয় বস্তুটি আত্মপ্রকাশ করে।

বিনয় বলল, দেশ উন্নয়নের জন্যে কাজ বেড়ে গেছে। এজন্যে কর্মীর সংখ্যা বাড়াতে হয়েছে। দোষ ধরাই কতগুলো লোকের অভ্যাস। দু শ বছর শোষণ করে ইংরেজ ভস্মস্তূপ রেখে চলে গেছে। কেবলমাত্র কৃষির উন্নতিতে অর্থনৈতিকে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। একদিকে যেমন বৃহৎ কারখানা ও ভারী শিল্পের দ্বারা উৎপাদন বাড়াতে হচ্ছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষি ও কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবন করা চলেছে। সেচের জন্যে খাল কাটা হচ্ছে। নদী নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। বাঁধ বাঁধা হচ্ছে।

—তাই তো তোমরা বিদেশ থেকে কোটি কোটি ডলার ধার করে টিকি বিক্রি করে দিচ্ছ। কনট্রাক্টারদের পেট মোটা করছ। উপরওয়ালাদের পকেট ভরাচ্ছ। সরকারী মহলের দুর্নীতি বেসরকারী মহলের দুর্নীতিকে পুষ্ট করছে। দুর্নীতিতে গোটা দেশটা ভরে গেল যে!

আগে পুলিস ঘুষ খেত। জমিদারের ও কোর্টের আমলারা, রেজিস্ট্রি অফিসের কেরানীরা ঘুষ খেত। এখন আরো অনেকে ঘুষ খায়। নানা প্রকারের ঘুষ চলছে। কত টাকা যে বরবাদ হয়ে যাচ্ছে, তার আর ইয়ত্তা নেই।

—কাজ করতে গেলে ক্ষয়ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। অভিজ্ঞতার অভাবে বা দৈবদুর্যোগের জন্যে কিছু বরবাদ হচ্ছে স্বীকার করি। দুর্নীতি অন্য স্বাধীন দেশেও আছে। স্বাধীনতা এসেছে বলে দেশের সকল লোক রাতারাতি ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির হয়ে যাবে? তা সত্ত্বেও কত ভালো কাজ হচ্ছে। চোখের সামনে উন্নয়নের কাজগুলিকে কি দেখতে পাও না? শুধু গেল গেল বলে চিৎকার করলেই হল! সরকারী মহলে এমন অনেক কর্মচারী আছেন, যাঁরা সৎ, যাঁরা আন্তরিকতা ও দরদের সঙ্গে পরিকল্পনাগুলি সফল করতে চেষ্টা করছেন। আর দেখ, ঘুষ চিরকালই আছে। কখন বেশী, কখন কম। উন্নয়নের নতুন নতুন নানা কাজে প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে।

—সরকার শুধু ব্যয়ের অঙ্ক ঘোষণা করেন। কাজের বেলা অষ্টরম্ভা দেখি। নদীর জলে টাকা ঢেলে দিলেই কি উন্নয়ন হয়? উন্নয়নের প্রসাদে

সব অভাব মিটে গেছে, অভাব শুধু অন্ন-বস্ত্রের। আমাদের বড়কর্তারা ঘোড়ার সামনে গাড়ি দিচ্ছেন। তাদের ঘাড়ের উপর উন্নয়নের ভূত চেপে বসেছে!

—উন্নয়ন কোথায় হয়নি? রাশিয়ায় হয়েছে। চীনে হয়েছে। তাদের দেশের লোক ত্যাগ স্বীকার করেছে।

—হাঁ। তা করেছে। তারা একটা বড় আদর্শের প্রেরণায় ত্যাগ স্বীকার করেছে। ত্নিয়ার সকল দেশ থেকে ঋণ নিয়ে তাদের নেতারা উন্নয়নের পাগলামিতে উন্মত্ত হয়ে ওঠেনি। তাদের নীতি cut your coat according to your cloth. তোমাদের নীতি ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। ঢাকের দাম দিতে তোমাদের মনসা ঠাকুর বিক্রি হয়ে যাবে। লোকের মনে ত্যাগ করার প্রেরণা না দিতে পারলে দেশ উন্নয়ন হয় না। আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখায়। সৎ দৃষ্টান্ত চাই। মানুষকে পেট পুরে খেতে না দিয়ে বড় হাসপাতাল নির্মাণ করলে কি রোগ হবে, না রোগ সেরে যাবে? স্কুল-কলেজের ইমারত না তুললে কি শিক্ষার মান উন্নত হবে, না শিক্ষা-ক্ষেত্রের অব্যবস্থা দূর হয়ে যাবে? চালাঘরে কি লেখাপড়া হয় না? ভূমি ব্যবস্থার পরিবর্তন না করে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদ করলে কি লোকের দুঃখকষ্ট ঘুচে যাবে? দেশ ধনধান্যে পূর্ণ হয়ে উঠবে? পাড়াগাঁর চালাঘরে বিদ্যুতের আলো দেওয়ার ব্যবস্থা করলে কি চালাঘর অট্টালিকা হয়ে যাবে? গান্ধীজীর ছবির নিচে সত্যমেব জয়তে লিখে প্ল্যাকার্ড টাঙ্গালে কি সরকারী মহলে দুর্নীতি দূর হয়ে যাবে? কতকাল আগে পাইলেট তামাসা করে জিজ্ঞাসা করেছিল—what is truth? সে তার উত্তর পায়নি। দু হাজার বছর পরেও তার উত্তর মিলছে না। কখনো মিলবে কি না জানি না।

—থাম, থাম! অত তড়পাচ্ছিস কেন? চোখ বুজে থাকিস কেন? এক দিনেই তো পাকিস্তান ও ভারত নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হল। এখনও পাকিস্তান টাল সামলাতে পারছে না। অল্প দিনের মধ্যে আমরা সংবিধান রচনা করেছি। প্রজাতন্ত্র-প্রবর্তন করেছি। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দিয়েছি। গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা চালু করেছি। স্ত্রী-পুরুষের সমানাধিকার দিয়েছি। উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যবস্থা করেছি।

—এর ফল তোমরা জনকয়েক লোক পুরামাত্রায় ভোগ করছ। শিল্পপতিরা নিজেদের স্বার্থে শাসকগোষ্ঠীর নির্বাচনী তহবিলে লক্ষ লক্ষ টাকা জমা দিচ্ছে। তোমরা তো তাদের পলিটিক্যাল পার্টি। সরকারী অর্থে পুষ্ট

এক শ্রেণীর পণ্য ব্যবসায়ী জোতদার সরকারী দলের ঝাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে রাজনীতির আসরে প্রবেশ করে গ্রামে গ্রামে মোড়লি করছে। শাসকদলের মনোনীত প্রার্থীর জন্যে ভোট সংগ্রহ করছে। তোমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতি ভোট ভাঙ্গানোর জন্যে মুসলমান বা হিন্দুদের শ্রেণী বিশেষের প্রার্থী খাড়া করে জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার উস্কানি দিচ্ছে। সরকারী অর্থে টিউবওয়েল বসিয়ে, রিলিফের টাকা মঞ্জুর করে, গম, চাল, খয়রাতি করে, নির্বাচনী সভায় সরকারের অনুগ্রহ-পুষ্ট কবি ও লেখকদের আবৃত্তি ও গান শুনিয়ে, নৃত্যশিল্পীদের নাচ দেখিয়ে ভোটদাতাদের মনোরঞ্জন করে, সরকারী কর্মচারীদের কতকাংশের সাহায্যে কৌশলে মূর্খ দরিদ্র লোকদের ভোট আদায় করে তোমরা সংখ্যা-গরিষ্ঠতা এবং জনসমর্থনের বড়াই করছ। এইভাবে তোমরা গদি আঁকড়ে থাকার মোহে লোককে নীতিভ্রষ্ট করে দিচ্ছ। নয়া গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করছ। গণতন্ত্রের আবরণে স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করছ। প্রচুর টাকা ছড়িয়ে তোমরা লোকসভা ও বিধান সভায় আসনগুলি দখল করছ। তোমরা ভুলে গিয়েছ যে পার্টির চেয়ে দেশ বড়। নিরঙ্কুশ সংখ্যাধিক্যের শাসন ডিক্টেটারশিপের নাম। তোমাদের রাজ্য সভা এবং বিধান পরিষদের পিঁজরাপোলে প্রসাদপ্রার্থী বা বৃদ্ধ জরদ্গব রাজনীতিকদের পুরে দিয়ে তাদের পরলোক গমনের পথে শান্তিময় বিশ্রাম স্থান রচনা করছ।

বিনয় বিরক্ত হয়ে বলল, তোদের চোখে ন্যাবা ধরেছে। তোরা সব হলদে দেখছিস। কোন কাজ নিখুঁত হয় না। ভুলচুক দোষত্রুটি থাকেই। এজন্যে কি সব ঝুটা হয়ে যায়? ক্রমে সব ঠিক হয়ে যাবে। সবুর কর। যারা নিজেরা কিছু করে না তারা অন্যের শুধু দোষ ধরে।

—বাঙ্গালী-সংসার থেকে অলক্ষ্মীকে বিদায় দেবার অজুহাতে তোমরা পুঁজি সৃষ্টি করতে চাচ্ছ। ফলে, ধনী আরও ধনী, দরিদ্র আরও দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে।

—তোদের পুঁজিবাদ-বিরোধী তত্ত্ব কথা যুবসমাজের মুখ-রোচক, কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অচল।

—তোমাদের দোষ কোথায় জান? তোমরা ভাব, শাসন-ক্ষমতা তোমাদের হাতে আছে বলে একমাত্র তোমরাই দেশকে ভালবাস। আর কারোর হাতে শাসন-ভার গেলে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়বে।

—তা না হোক। যারা নতুন কাজ করবে তাদের ভুল বেশী হবে। শাসন কাজের জন্যে পাকা লোক দরকার।

—তা বটে, কিন্তু ভুলের ভিতরেই ভুল শোধরাবার পথ আছে। জবরদস্তি কি ভুল শোধরাবার উপায়? রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মন্দকে যত না ভয় করতে শিখেছি, ভালো করার জবরদস্তিকে তার চেয়ে বেশী ভয় করি।

বিস্‌মিল্লার গলদ থাকলে এমনই হয়। শোষক ও শোষিত শ্রেণীর সমাজে গণতন্ত্র একটা প্রকাণ্ড ধাপ্পাবাজী। ধনতান্ত্রিক কাঠামোয় রাষ্ট্রিক সামাজিক আর্থিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর সমানাধিকার একটা উদ্ভট বস্তু। কিলিয়ে কাঁঠাল পাকাতে গেলে রাষ্ট্রে দুর্নীতি, সমাজে অশান্তি জীবনে দুঃখ এবং পরিবারে ব্যভিচারের রাজত্ব চলে।

সুশোভনের বাস্তবধর্মী অভিযোগের সন্তোষজনক উত্তর দেওয়া বিনয়ের পক্ষে সহজ ছিল না। শেষ পর্যন্ত আপসে তারা মতানৈক্যের তীব্রতা দূর করতে চেষ্টা করেছিল। উভয়ে স্বীকার করল, যে নারী-পুরুষের সমানাধিকার, সম্পত্তি বণ্টনের সুষ্ঠু উপায়; গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপ, ব্যষ্টি-সমষ্টির সম্পর্ক, এক দেশের সঙ্গে অন্য এক দেশের বোঝাপড়া সম্বন্ধে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছে। এখনও তার একটা অবিসংবাদী সর্বজন-গ্রাহ্য কল্যাণকর রূপ দেখা দেয়নি। এজন্যে খাদ্য সমস্যা, রাষ্ট্রনৈতিক অর্থ নৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সমাধানে ব্যর্থতা বা অপচয়ের অভিযোগ শুধু এ-দেশে নয়, সকল দেশেই আছে। উদ্দেশ্য সৎ হলে ব্যতিক্রম দূষণীয় হয় না।

॥ পঁয়তাল্লিশ ॥

সেদিন সকালবেলা চা খাওয়ার পর শিবনাথ বৈঠকখানায় বসে গুড়গুড়ির নল টানতে টানতে একখানি নতুন বই-এর প্রুফ সংশোধন করছিলেন। এমন সময় এক দীর্ঘকায় স্বাস্থ্যবান প্রবীণ ব্যক্তি হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করলেন। অতি-পরিচিতের মতো হাসতে হাসতে তিনি বললেন, কি রে, শিবু, প্রুফ দেখছিস নাকি? স্কুলপাঠ্য বই নাকি রে? তোর তো স্কুলের বই লেখার বাতিক ছিল।

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে এবং চেহারা দেখে শিবনাথ আশ্চর্য ও আনন্দিত হয়ে বললেন, দীপু? তুই? কতকাল পরে দেখা হল! তারপর ঝড়ের মতো আধ ডজনখানেক প্রশ্ন চলতে লাগল—কি করছিস্? কোথায় আছিস্? কেমন আছিস্? কোত্থেকে এলি? শুনেছিলাম তুই নাকি সন্ন্যেসী হয়ে গিয়েছিস? কি নাম নিয়েছিস? দীপানন্দ টিপানন্দ হবে বোধ হয়?

আগন্তুক মৃদু হেসে ধীরে ধীরে বললেন, পরে সব বলব। তুই এখনো পাঠ্য পুস্তক লিখিস?

—না, এটা পাঠ্য পুস্তক নয়। অন্য বই। চীনের ইতিহাস। আজকাল পাঠ্য পুস্তক লেখার উঞ্ছবৃত্তি ছেড়ে দিয়েছি।

—কেন, আগে তো এই সকল বই লিখে অনেক পয়সা পেয়েছিলি?

—ওতে আর পয়সা নেই। এখন প্রত্যেক স্কুলমাস্টার পাঠ্য পুস্তক লেখে আর পাইকারি হারে টিউসনি করে। এখন স্কুলমাস্টারগুলো তো ছ্যাকড়া গাড়ির ঘোড়ার মতো পেটের দায়ে দিন রাত খেটে মরে। কেউ কেউ আবার লাইফ ইনসিওরেন্সের দালালি করে।

—কেন? আজকাল তো মাস্টারদের প্রচুর মাইনে বেড়েছে।

—তাই তারা রাস্তায় নেমে মাইনে বাড়ানোর জন্যে আন্দোলন করছে। জিনিসপত্রের দাম দশগুণ বেড়েছে। দু-এক টাকা মাইনে বাড়িয়ে কি মানুষকে সন্তুষ্ট করা যায়? দ্রব্যমূল্য না কমলে এই পাপচক্রের হাত থেকে অব্যাহতি নেই। আজকাল সব জায়গাতেই ব্যাবসাদারী। গৌরী সেন না থাকলে বই ছাপা, অনুমোদন করা, স্কুলে স্কুলে ক্যানভাসার পাঠিয়ে বই চালানো সম্ভব হয় না। নামজাদা লেখক না হলে বিক্রির তিন ভাগ টাকা প্রকাশকদের গর্ভে ঢোকে। বলাও যায় না কিছু। তারা টাকা খরচ করে, পরিশ্রম করে, খোশামোদ করে। সুতরাং তাদের ভাগ বেশী না হলে চলবে কি করে? আবার দরিদ্র অনামী ব্যক্তিদের দিয়ে বানানো পাণ্ডুলিপিতে বিদ্যাদিগ্‌গজরা প্রকাশকদের কাছে বেশ মোটা টাকা বাগিয়ে নিয়ে দ্বিধাহীন চিত্তে নিজেদের স্বাক্ষর দিয়ে পাঠ্যপুস্তকের দুনিয়াকে পাপের পঙ্কিল পথে টেনে নিয়ে গেছেন।

শুনে, দীপঙ্কর আশ্চর্য হয়ে বললেন, তাই নাকি? এই ব্যাপারেও ব্যাবসাদারী! এখানেও কালোবাজার! ভগবান রক্ষে কর! এ যে কালোবাজারের যুগ।

তারপর আলোচনার মোড় ফিরিয়ে দীপঙ্কর জিজ্ঞাসা করলেন, তুই তো এখন বাড়িতেই আছিস্। সময় কাটাচ্ছিস কেমন করে? অথণ্ড অবসরের একঘেয়েমি ক্লান্তিকর। এতে দেহ ও মনের অবসাদ আসে।

শিবনাথ হেসে বললেন, কেন, বই আছে, বউ আছে, উষ্ণ চায়ের পেয়ালা আছে, আর তাম্রকূট-দেবীর সেবা আছে।

দীপঙ্কর বললেন, এ বয়সে কি বেশী বই পড়া চলে, না বিগত-যৌবনা সহধর্মিণীর সঙ্গ-সুখ ভোগ করা সুখের হয়? বুড়ো বয়সে স্ত্রী-পুরুষের ভিতর ঝগড়া লেগেই থাকে, দেখি। আবার এটাও দেখি, কেউ কারোকে ছেড়ে একদণ্ড থাকতে পারে না। দুধটুকু মরে ক্ষীরটুকু হয় কিনা!

শিবনাথ বললেন, তুই সন্ন্যেসী মানুষ, বেরসিক। কি বুঝবি তুই? বৃদ্ধ বয়সে দাম্পত্য কলহ কড়া হলেও মিষ্টি লাগে। একটু ঝাঁঝালো, তবে অম্লমধুর। রবিঠাকুর পড়ে দেখ না। তোকে এই সব বলা আর অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্ সমান কথা।

দীপঙ্কর বললেন, দীর্ঘকাল মাস্টারি করলে নীতিকথা শুনিয়ে শুনিয়ে মানুষ কাঠখোট্টা হয়ে যায়। চেহারায় তরুণ হলেও মনে বুড়ো হয়ে যায়। যৌবন তো বহুকাল আগে সময়ের বালুচরে শুকিয়ে গেছে। বুড়ো বয়সে তোর ভিতর এখনো এত রস আছে?

শিবনাথ বললেন, ওহে, প্রেমের উত্তাপে রস জারিত হলে মিছরির মতো মধুর হয়।

দীপঙ্কর হেসে বললেন, তোর প্রেমের কাণ্ডারী আর রসের ভাণ্ডারী, সেই রসবতী কোথায়?

—কেন, স্বস্থানে? তিনি এখন রসনা-রস পরিবেশনের তদ্বির করছেন। একটু বোস। তাঁকে ডেকে নিয়ে আসছি। শিবনাথ বাড়ির ভিতর চলে গেলেন। একটু পরে শিবানীকে সঙ্গে নিয়ে শিবনাথ ঘরে ঢুকলেন। অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোককে দেখে শিবানী মাথার কাপড়টা সামনের দিকে একটু টেনে দিলেন। তাঁকে দেখে দীপঙ্কর দূর থেকে হাত তুলে সোচ্চারে নমস্কার জানালেন। শিবানীর সলজ্জভাব লক্ষ্য করে শিবনাথ রসিকতা করে বললেন, ও মাধবী, এত দ্বিধা কেন? পেট-রোগা বুড়ীর আবার লজ্জা কি? দীপঙ্কর আমার বাল্য বন্ধু। তুমি তাকে কোনদিন

দেখনি। আজ সে হঠাৎ ধূমকেতুর মতো এখানে উদয় হয়েছে। ও আমার ছোট ভাই-এর মতো।

শিবানীর পরনে আটপৌরে চওড়া লাল পাড় শাড়ি। বাঁ হাতে একখানা সরু শাঁখা ও সোনা বাঁধানো নোয়া। ডান হাতে একখানা রুলি। গলায় সরু হার। কাঁচাপাকা চুলের সিঁথিতে সিঁদুরের প্রলেপ। মসৃণ ললাটের দুধারে আধপাকা অলকগুচ্ছ। দোক্তাযুক্ত তাম্বুল-রসে ঈষৎ রাঙ্গা ঠোঁট দুটি। আলতা-রাঙ্গা মাংসল পায়ের পাতা। রক্তিম গণ্ডদ্বয়ে সময়ের দু-একটি আঁচড় লেগেছে। স্থূলাঙ্গী রাসভারী গৃহস্থ গৃহিণী। যেন জীবন্ত দেবী প্রতিমা। তাঁর সামনে দীপঙ্করের সমস্ত প্রগলভতা, চপলতা কোথায় মিলিয়ে গেল। চেয়ার থেকে উঠে এসে ভক্তিভরে প্রণাম করে তাঁর পদধূলি নিতে এগিয়ে এলেন দীপঙ্কর। বয়স্থ ভদ্রলোককে প্রণাম করে দেখে শিবানী অপ্রতিভ হয়ে, আঃ কি করছেন, আপনি? বলে লজ্জায় উঠে দাঁড়ালেন।

দীপঙ্কর শিবনাথকে বললেন, সকলেই বলে, তুই ভিক্ষে করে কত কষ্টে কলেজ গড়ে তুলেছিলি। দরিদ্র সামান্য স্কুল মাস্টার তুই। রিক্তহস্তে ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজে হাত দিয়েছিলি। কলেজের দুঃখের দিন কেটে গেল। সুদিন এল আর তুই কিনা চলে এলি?

—ঘটনাচক্রে এমনিই হয়।

—বন জঙ্গল পরিষ্কার করলি। মাটি কোপালি। গাছ বসালি। ফল ভোগ কর।

—মানুষ গাছ বসায় সব সময়ে কি নিজে ফল ভোগ করার জন্যে? নিজের ভোগে না আসে ক্ষতি নেই। দশ জনের ভোগে এলেই তার সার্থকতা।

—ব্যাপারটা কি বলত?

—ব্যাপার কিছুই নয়। কাজ করতে বসে আমি দেখলাম, মানুষের মুখে হাসি, অন্তরে বিষ। মানুষ সংসারে আবরণ দিয়ে চলে। যার পয়সা নেই সে বড়লোক সাজে। যার বিদ্যা নেই, সে পাণ্ডিত্য জাহির করে। যার ক্ষমতা নেই, সে ক্ষমতার ভান করে। যার ক্ষমতা আছে, সে তার অপব্যবহার করে। সত্যকে চেপে রেখে অন্যায় করে।

—তা করে কিন্তু সময়ে সত্য সকলে জানতে পারে। সত্য ধামা চাপা দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না। আবার ঢাক পিটিয়ে তাকে জাহির করতে হয় না।

—সমাজে মানুষ লোক ঠকিয়ে চলে।

—কিন্তু বেশী দিন ঠকানো যায় না। কতগুলি লোককে কিছুকাল ঠকাতে পারা যায়। সকল লোককে চিরকাল ঠকানো যায় না।

—কার্যক্ষেত্রে এ যুগে বন্ধুর বিরুদ্ধে বন্ধু, শিক্ষকের বিরুদ্ধে ছাত্র, বাপের বিরুদ্ধে ছেলে চক্রান্ত করতে ছাড়ে না। রক্ষক ভক্ষক হয়। পদস্থ ব্যক্তি স্বার্থের খাতিরে সহজে দুষ্ট লোকের দলে ভিড়ে যায়। ছাত্র, পুত্র ও বন্ধুর কৃতঘ্নতা দেখলে বলতে ইচ্ছা হয়—মাতা বসুন্ধরা, তুমি দ্বিধা-বিভক্ত হও। আমি তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। প্রাণপ্রতিম প্রিয় বন্ধুর কৃতঘ্নতা দেখে সীজার বড় দুঃখে বলেছিলেন, ব্রুটাস্, তুমিও? পৃথিবীতে একজন জুডাস ইস্কারিয়েটের জন্ম হয় নি। আমার কি মনে হয় জানিস, দীপু? পঞ্চাশ বছর মাস্টারি করে ছেলেদের শুধু পাস করালাম। মানুষ করলাম কই? তা নইলে ছাত্ররা পিতৃদ্রোহী, গুরুদ্রোহী হয়? এ তো আমাদের দোষ। আমরা, মাস্টাররা, দোকানদার। আমরা পাপ করি আর পাপের প্রশ্রয় দেই। পাপের শাস্তি দুঃখ ভোগ। তাই বলি মাস্টারি পাপ!

—ও কি কথা বলিস রে! আমরা বিদ্যা দানকে যে ধর্মের কাজ বলে এসেছি।

—হয়তো তা এক সময়ে ছিল। এখন নেই। এখন বিদ্যাদান নয়, বিদ্যাব্যাবসা। বিদ্যাবিক্রয়। বিদ্যার কালোবাজারী।

শিবনাথ উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন দেখে শিবানী মৃদু হেসে বললেন, দেখুন, যারা বন্ধু বলে হাসে, ছাত্র বলে ভক্তি করে, যারা ভদ্রলোক বলে পরিচয় দেয়, তাদের ব্যবহার দেখে মানুষের উপর ওঁর ঘৃণা এসে গেছে।

—তা যদি হয় তাহলে ও ভুল করছে। সজ্ঞানে হোক আর অজ্ঞানেই হোক, আপন স্বভাবের কোন একটি বিশেষ ত্রুটি বা দুর্বলতার জন্যে মানুষকে শাস্তি এবং পুণ্যের জন্যে পুরস্কার মাথা পেতে গ্রহণ করতেই হবে। এজন্য মানুষকে ঘৃণা করা পাপ।

দীপঙ্কর বলতে লাগলেন, সমাজে দুষ্ট লোক আছে, জানি। ত্রেতাযুগের সমাজে শকুনি দুঃশাসন ছিল। আর ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরও ছিল। দ্বাপরের সমাজে কৈকেয়ী রাবণ ছিল। আবার ভরত বিভীষণও ছিল। আলো আঁধার নিয়ে দিন। ভালো মন্দ মিশিয়ে মানুষ। মানুষের মধ্যে দীনতা আছে, নীচতা আছে। কুশ্রীতা আছে, পাপ আছে। আবার পবিত্রতা আছে। পুণ্যও

আছে। বিধাতা ভালো মন্দ দুটি বিরুদ্ধধর্মী বস্তুকে একই মানুষের ভিতর রেখে দিয়েছেন। আমাদের জীবন ভালো মন্দর মালা গাঁথা।

দীপঙ্করের কথা শুনে শিবনাথ বললেন, আমি ভাবি পৃথিবী এমন কেন? এমন ভাবে চলে কেন?

—পৃথিবী ঠিক আছে। তার চলার এমন-তেমন ভাব নেই। সে নিজের পথে চলেছে। কারোর দিকে তাকায় না। থমকে দাঁড়ায় না। চরৈবেতি। যেমন নদীর স্রোত চলে, থামে না। বুদ্ধিমান কৃষক তাকে নিজের কাজে লাগিয়ে ফসল ফলায়। আসল কথা কি জানিস? নিজের বিবেক বুদ্ধি অনুসারে মানুষকে কাজ করতে হবে। হাত পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থেকে হা হুতাশ করলে চলবে না। পৃথিবীর উপর, মানুষের উপর দোষ চাপিয়ে যে বসে থাকে সে তো কাপুরুষ। মানুষ যতদিন বাঁচবে, ততদিন তাকে কাজ করতে হবে। নৈষ্কর্ম্য আত্মহত্যা।

—কাজ করব কি? আজকাল মানুষ স্বার্থপর হয়ে গেছে। মানুষকে জানা যায় না।

—ওরে, মানুষ চিরকালই স্বার্থপর। অর্থ ও ক্ষমতার দাস। যারা সারাজীবন মানুষ ঘেঁটেছে তারাও বলে প্রত্যেক মানুষ স্বতন্ত্র। চেহারায় এক হলেও ব্যক্তিত্বে আলাদা। বই পড়ে পশু বা পাখির প্রকৃতি ও স্বভাব জানা যায় কিন্তু মানুষ চেনা যায় না। শুধু এইটুকু জানা যায় যে, মানুষ—মানুষ, বাঘ বা সাপ নয় কিন্তু তার রক্ত মাংসের চামড়ার নিচে বাঘ ও সাপ লুকিয়ে থাকে। খুনে বা ডাকাতদের ছবি দেখলে কি তাদের প্রকৃতি জানা যেতে পারে? তাদের ভিতর কারোর চেহারা ফুলের মতো সুন্দর। কারোর মুখ চাঁদের মতো নির্মল। কারোর চোখে বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য। কারোর ঠোঁটে শিশুর সরল হাসি। জানোয়াররা নিজেদের গোপন করে না। গোপন করতে জানে না। তাদের সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে কিন্তু মানুষ সর্বদা নিজেকে গোপন করে চলে। এজন্যে তাকে চেনা যায় না সুতরাং তার হাত থেকে অনিষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। অভিমান ত্যাগ করে মানুষকে ভালোবাস। মানুষের ভিতর, মানুষের জন্যে ভালো কাজ করলে জীবন সত্যের উপলব্ধি হয়। নইলে অসন্তুষ্টি, দুঃখ, নৈরাশ্য, অশান্তি।

—ভালো কাজের দুর্ভোগ আছে, দুঃখ আছে!

—ভালো কাজের মূল্য দুর্ভোগ। দুর্ভোগের অনুপাতে কাজের মহত্ব।

সক্রেতিস থেকে গান্ধীজী পর্যন্ত কত মনীষী ভালো কাজ করার জন্যে চরম মূল্য দিয়ে গেছেন। তা কি বৃথা হয়েছে? যখন মানুষকে কাজ করতেই হবে, তখন নিজের স্বার্থে কাজ না করে দেশের ও দশের স্বার্থে কাজ করতে হয়। এরই নাম নিষ্কাম কর্ম। তুই তো আগেই বলেছিস, দশ জনের ভোগে এলে কর্ম সার্থক হয়।

সময় কাটাবি কি করে? তুই তো লিখতে পারিস। বই লেখ। সাহিত্য চর্চা কর। আহার ওষুধ দুইই হবে। ভালো ভাবে নিজের সময় কাটবে, আর লোকের উপকার হবে।

—আমি প্রবন্ধ লিখি। প্রবন্ধ কি সাহিত্য? সাহিত্যে রস থাকে। প্রবন্ধ নীরস। ঈশ্বর প্রদত্ত শক্তি না থাকলে মহৎ সাহিত্য রচনা করা যায় না। সৃজনী প্রতিভা দুর্লভ। সে চলে নিজের নিয়মে। তাকে কোন সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ করা যায় না। কবি বা সাহিত্যিক জন্মায়। তাকে ট্রেনিং দিয়ে তৈরি করা চলে না। যা তা লিখলেই সাহিত্যিক হওয়া যায় না।

—আজকাল কতলোক লিখছে। সাহিত্যিক হচ্ছে।

—আরে, লিখলেই হল? ছাই লিখছে। খাড়া-বড়ি-থোড় আর থোড়-বড়ি-খাড়া। আধুনিকাদের প্রেমের কথা ফলাও করে বিরাট আকারের উপন্যাস ছাপিয়ে লোক সাহিত্যিক হচ্ছে। মানব বেদনা থেকে প্রকৃত সাহিত্যের জন্ম হয়। বাজে বই লিখে সময় নষ্ট করার চেয়ে ভালো বই পড়া সহস্রগুণ ভালো।

—সাহিত্যিক হওয়া যদি এতো কঠিন হয়, তবে মঠে গিয়ে ধর্ম কর না। সময়টা কাটবে ভালোভাবে।

—মঠ আর সন্ন্যাসীকে আমি দূর থেকে নমস্কার করি। আমার মনে হয়, মঠে প্রকৃত ধর্ম হয় না। ধর্মের ভড়ং করা হয়। গুরুদেব বা মাতা-ঠাকুরানীর নাম ভাঙ্গিয়ে শিষ্য সংগ্রহ করা হয় আর সম্প্রদায় রক্ষা করা চলে। সহজে মহারাজ সাজা হয়। আজকাল মহারাজগিরি ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। ঐ পদের মান রক্ষা করার জন্যে পরীক্ষা এবং ডিগ্রীর ব্যবস্থা থাকা উচিত। নইলে ধর্মের নামে লোকঠকানো বন্ধ করা যাবে না। এখন চোর ডাকাত খুনে গেরুয়া পরে সন্ন্যাসী সেজে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তারপর হেসে বললেন, আমি মঠে ধর্ম করতে গেলে,—শিবানীর দিকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে—ঐ বুড়ীর কি হবে?

—কেন, বুড়ীও সঙ্গে থাকবে। ভৈরবী সঙ্গে না থাকলে এক মনে ধর্ম করা হয় না। মন উড়ু উড়ু করতে থাকলে ধর্ম তো দূরের কথা, কোন কাজেই মন বসে না। কোন কিছু ভালোভাবে করা যায় না। প্রকৃতিই কাজ করে। পুরুষ দ্রষ্টা মাত্র। উভয়ের মিলনের ফল অপবর্গ। প্রকৃতি দেবী সঙ্গে থাকলে। নিশ্চিন্ত হয়ে ধর্মে মন দিতে পারবি? সর্বোত্তম ফল লাভ হবে?

সকলে হাসতে লাগলেন। শিবনাথ বললেন, আমার প্রকৃতি দেবী ছিষ্টিছাড়া মেয়েমানুষ। উনি ধম্ম-টম্ম ভালবাসেন না। বার-ব্রত করেন না। তীর্থে যান না। আদা জল খেয়ে উপোস করেন না। শুচিবাই নেই। জাত বিচার করেন না। ছোঁয়া-ছুঁয়ি, গঙ্গাস্নান, গঙ্গাজল, গোবর-জল, সন্ধ্যা-আহ্নিক ওঁর ধাতে সয় না। বল তো ভাই, ওঁর ধর্মে মতি আনার উপায় কি? উনি বলেন, যে ধর্মে মনের পবিত্রতা উদারতা না আসে সে রকম লোক দেখানো ধর্মের দরকার কি?

দীপঙ্কর শিবানীকে বললেন, হাঁ, বউদি, এতো বয়স হয়ে গেল, এখনও ধর্মে মতি হল না? আর কবে হবে? জানেন তো, গৃহীত ইব কেশেষু? শিবানী চুপ করে থেকে হাসতে লাগলেন। শিবনাথ উত্তর দিলেন, উনি বলেন, গৃহস্থ ধর্মই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। একটা গৃহস্থ পরিবারে কত প্রকতির, কত মনোভাবের, কত বয়সের, কত রুচির, কত প্রকৃতির ছেলেমেয়ে থাকে। তাদের যথাযোগ্য সম্মান দেখিয়ে ভালবেসে কর্তব্য পালন করতে পারাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সংসার পেতে বসলে অতিথি-অভ্যাগত আসে, ভিখিরী আসে, সাধু-সজ্জন আসেন, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন আসেন। তাদের সেবাই আসল ধর্ম। ছিটে ফোঁটা কেটে চিতা বাঘ সাজলে বক ধার্মিক হওয়া চলে, প্রকৃত ধার্মিক হওয়া যায় না।

দীপঙ্কর বললেন, বউদি সত্যিকার খাঁটি মানুষ। এই তো চাই। তারপর শিবনাথকে বললেন, আচ্ছা, আজকাল তো দেশের স্থানে স্থানে দেশ উন্নয়নের ও অস্পৃশ্যতা দূর করার কত কাজ হচ্ছে সেই কাজে লেগে যা না।

—হাঁ, কিছু কিছু ভালো কাজ হচ্ছে সত্যি। যারা উন্নয়নের কাজ করছে তাদের ভিতর ভালো লোক নেই তা বলছি না। কিন্তু সেখানেও তো নিজের কোলের দিকে ঝোল টানাটানি চলেছে। দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী কর্মচারীদের সাহায্যে সরকারী তহবিল থেকে টাকা বের করে এনে স্কুল

গৃহ নির্মাণ হচ্ছে। হাসপাতালের ইমারত উঠছে। খাল কাটা ও বাঁধ বাঁধা হচ্ছে। পিচের রাস্তা তৈরি হচ্ছে। কনট্রাক্টারকে কাজ বিলি করে মুনাফা ভাগাভাগির ব্যবস্থা হচ্ছে। ও কাজ করতে গেলে বুদ্ধির দরকার। তা আমার নেই।

—কিছু ভালো কাজ হচ্ছে স্বীকার করতে হবে। নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভালো। দেশ সমৃদ্ধশালী হচ্ছে। লোকের আয় বেশী হয়েছে। ক্রয় ক্ষমতা বেড়ে গিয়েছে।

—পাড়াগাঁয়ে বারো আনা দামের গায়ে মাখা সাবান আর চড়া দামে অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্য হুবহু বিক্রি হচ্ছে, দেখে আমাদের বড় কর্তারা এই কথা বলেন। সরকারী পরিসংখ্যানের ভেলকিবাজিতে গড় আয় বৃদ্ধি দেখানো হয়। প্রকৃত পক্ষে তা নয়। তা যদি হত, তাহলে বাংলা দেশে দশ-বারো লাখ বেকার কেন? এত ভিক্ষুক কেন? এত বেশ্যা কেন? মুষ্টিমেয় লোকের আয় বেড়েছে যেমন সত্য, সাধারণ মানুষের দুঃখদুর্দশা বেড়েছে তেমনি সত্য। আমরা নিঃস্বার্থ সেবার কথা ভুলে গিয়েছি। টাকায় রেল কারখানা, সেতু, বাঁধ বাঁধা, খাল কাটা, ইমারত তৈরি করা চলে। মানুষ তৈরি হয় না, বরং টাকা মানুষকে অমানুষ করে। আমাদের শাস্ত্র বলেছেন, ত্যাগই ভোগ। আমাদের ত্যাগ কোথায়? আমরা সকলে ভোগ করতে চাই।

তুই অস্পৃশ্যতা দূর করার কথা বলছিস্? ওটা একটা হুজুগ। সস্তায় নাম কেনা। বাংলা দেশে অস্পৃশ্যতা উৎকট নয়। গোঁড়া হিন্দু আর বিধবাদের শুচিবাই আছে কিন্তু তারাও নীচ জাতের লোকদের ঘৃণা করে না। এখনও অনেক হরিজনের, এমন কি মুসলমানদের সঙ্গে হিন্দুদের ভালবাসার সম্পর্ক আছে। তাদের ভিতর তাদের চাচা দাদা জ্যেঠা খুড়া দাদু আছে। বাংলা দেশে অস্পৃশ্যতা নেই বললেও চলে। যেটুকু আছে তাও দু-এক পুরুষের ভিতর চলে যাবে। মাদ্রাজে অস্পৃশ্যতা আছে। মহাত্মাজীর হরিজন আন্দোলনের কথা শুনে অন্যদেশের লোক জানল যে ভারতের উচ্চবর্ণের হিন্দুরা তথা-কথিত হরিজনদের স্পর্শ করে না। প্রকৃত সত্য তা নয়। সমাজ সংস্কার আইনের দ্বারা হয় না। ফল পাকলে বোঁটা থেকে আপনি খসে পড়ে। খুঁচিয়ে কাঁচা ফল পাড়তে গেলে গাছটা লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। আমরা আইন করে অস্পৃশ্যতা দূর করতে চাচ্ছি। কিন্তু নতুন ধরনের অস্পৃশ্যতা সৃষ্টি করেছি। একটা বড় দরের গভর্নমেণ্টের চাকরি পেলে আমরা কি উচ্চ-

বর্ণের মানুষ হয়ে যাই না? গরীব বেকার অসহায় লোকদের পুলিস দিয়ে কি দূরে ঠেকিয়ে রাখছি না? উচ্চ পর্যায়ের অফিসার বা জনসেবক মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করা কি সহজ? কত কাঠ-খড় পুড়োতে হয়! মহাকরণে প্রতিদিন দর্শনার্থীদের এত ভিড় কেন? সময়মত কাজ হচ্ছে না বলে মানুষ অধৈর্য হয়ে উপরওয়ালাদের সঙ্গে দেখা করার প্রয়োজন বোধ করে।

—বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীদের ভিড়ে কাজ চাপা পড়ে যাবে বলে তো এই ব্যবস্থা হয়েছে।

—কাজ হয় না বলেই তো এত ভিড় হয়।

তারপর একটু থেমে শিবনাথ বললেন, আমি কি ভাবি জানিস, দীপু? আমরা স্বাধীন হলাম কোথায়? ইংরেজ ভূত এখনো আমাদের ঘাড়ে চেপে বসে আছে। আমরা ভাষায় ইংরেজ, পোষাকে ইংরেজ, আদব কায়দায় ও ব্যবহারে ইংরেজ। স্বাধীন হয়েও আমরা বেশীমাত্রায় সাহেব হয়ে গেছি। মেয়েছেলে বড় অফিসার হলে তাঁকে 'স্যর' আর বেটাছেলেকে 'সাহেব' না বললে তারা চটে যায়। বৈদিক যুগে গায়ের রঙ অনুসারে আর্য ও অনার্য বিভাগ ছিল। পরে গুণ ও কর্ম অনুসারে চারটি জাত সৃষ্টি হয়েছিল। স্বাধীনতার যুগে বেতন ও পদ অনুসারে কত নতুন জাত সৃষ্টি হয়েছে। উকিল ডাক্তার মাস্টার কেরানী পুলিস ব্যবসায়ী রাজনীতিক শিল্পী সিনেমা আর্টিস্ট লেখক প্রভৃতি এক একটা জাত হয়ে গিয়েছে। এদের ভাষা, এদের বুলি, আচার ব্যবহার পোষাক কথাবার্তার উপর ট্রেড মার্ক মারা আছে। মানুষের মনের গভীরে যে জাতি বিভাগের সত্যটি লুকিয়ে আছে তা বিধিনিষেধ আইন-কানুন প্রভৃতির কৃত্রিম পালিশ সত্ত্বেও অনিবার্যরূপে প্রকাশ পায়। সত্য অমর। অবস্থা অনুসারে তার রূপ বদলায় মাত্র।

আমি দেখছি এ যুগে শুধু পদের বৈচিত্র্য, নামের বহর। উপাধির জলুস, লাল ফিতার দৌরাত্ম্য, কর্তব্যে অবহেলা, গফিলতি, পরস্পর পিঠচুল-কানি, হাত কুটকুটানি, মুখ চাওয়া-চাওয়ি, স্বজন প্রীতি, দল উপদলের স্বার্থ রক্ষার জন্যে অন্যায় আচরণ ন্যায়নীতি বিসর্জন পুরামাত্রায় চলেছে।

এখন আমাদের শিক্ষা-দীক্ষার মূল উদ্দেশ্য মানুষ গড়া নয়, কাজের মানুষ গড়া। আমরা ভুলে যাই, যে সকল মনীষী দেশের, জাতির গৌরব

তাঁরা কোন দিন প্র্যাক্‌টিক্যাল লোক ছিলেন না। বুদ্ধদেব যিশুখৃষ্ট সক্রেতিস শ্রীচৈতন্য গান্ধীজী আমাদের মতো কাজের লোক ছিলেন না। সত্যের সঙ্গে মিথ্যার, ন্যায়ের সঙ্গে অন্যায়ের, ক্ষুদ্রতার সঙ্গে আদর্শের গোঁজামিল দেওয়ার কৌশল তাঁদের অজানা ছিল। এজন্যে তাঁরা জীবন দান করে প্রকৃত জীবন লাভ করেছেন। প্রকৃত জীবনের পথ দেখিয়ে গেছেন। পৃথিবীর চার আনা লোক প্রাক্‌টিক্যাল বা কেজো। তাতেই এতো দুর্নীতি, মিথ্যা অন্যায়ের রাজত্ব চলেছে। বারো আনা লোক আনপ্রাক্‌টিক্যাল বলে এখনও ধর্ম আছে, নীতি আছে, ন্যায় আছে, সত্য আছে। যে দিন পৃথিবীর বারো আনা লোক প্রাক্‌টিক্যাল হয়ে উঠবে সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা ভাবতেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।

ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনের ন্যাসরক্ষক শিক্ষক, সমাজবিরোধীদের দমন কার্যে নিযুক্ত পুলিস কর্মচারী এবং অপরাধীদের বিচারকও রেলের ভাড়া ফাঁকি দেবার জন্যে গ্রেপ্তার হতে লজ্জা বোধ করে না। প্রেয় এবং শ্রেয়ের অস্পষ্ট ধারণা সামাজিক বিপর্যয়ের মূল কারণ।

—তা ঠিক। মানুষ জীবনের আধ্যাত্মিক মূল্য বোধের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেছে। যে সমাজে বিদ্যার সঙ্গে জ্ঞানের, কর্মের সঙ্গে সেবার, সেবার সঙ্গে ভক্তির সমন্বয় না হয় সে সমাজ অসুস্থ। নীতি-বোধ মানবতা জাগ্রত করে।

—শুধু আমাদের বাংলা দেশে নয়, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে শ্রেয় এবং প্রেমের ধারণার অভাবে এক সর্বনাশা আঞ্চলিক চেতনা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। ফলে, দিনে দিনে ভারতের ঐক্য ও জাতীয় সংহতি বিপন্ন হয়ে উঠেছে।

শিবনাথের কথা শুনে দীপঙ্কর বললেন, তোর কথা বর্ণে বর্ণে সত্য। যখন ভারতের রাষ্ট্রনায়করা কাশ্মীর সমস্যা, চীন সমস্যা এবং দেশোন্নয়ন সমস্যা নিয়ে বিব্রত, তখন ভাষা সমস্যা. রাজ্যপুনর্গঠন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আভ্যন্তরীন বিষয় নিয়ে দেশের এক অংশের সঙ্গে অন্য অংশের বিভেদ সৃষ্টি করলে দেশ গঠনের সুমহান কর্তব্য ব্যাহত হবে, জাতীয় সংহতি চুরমার হয়ে যাবে।

তারপর আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে বললেন, তুই গ্রামে ফিরে গিয়ে লোকের মনে এই ভাব জাগাতে চেষ্টা কর। গ্রামের লোক এখনও অনেকটা সরল, সহজ আছে। প্রকৃতির স্নিগ্ধ ও শান্ত পরিবেশে তোর অবসর

ভালোভাবেই কাটবে মনে করি। তারপর শিবানীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, বউদি, আপনিও ওর সঙ্গে যাচ্ছেন তো?

শিবানী বললেন, আমার ইচ্ছা তাই। আমরা গ্রামের লোক। গ্রামে জন্ম। গ্রামেই মানুষ হয়েছি। আমি পল্লী গ্রামকে প্রাণের মতো ভালবাসি গ্রামের মাটি, নদী, গাছপালা এবং সাদাসিদে মানুষ আমার প্রিয়। আমরা দুজনেই গ্রামে যাব, আপনার কথা মতো কাজ করতে চেষ্টা করব।

এমন সময় দুর্গাঝি কুচানো ফল ও মিষ্টি ভর্তি দুখানা ডিস এবং জলের গ্লাস টেবিলের উপর রেখে চলে গেল। শিবানী বললেন, এখন একটু জল খান। গলা শুকিয়ে গেল যে! বাব্বা! আসা অবধি জিভের বিশ্রাম নেই? কাঠের মুখ হলে কেটে যেত। দীপঙ্কর খেতে খেতে বললেন, আমিই বক্ বক্ করছি? নিজের কর্তাটি কম বক্তৃতাবাজ নন! লোক মনের মানুষের দোষ দেখতে পায় না।

—কেউ কম যান না! দুজনের মুখে খই ফোটে। বলে, শিবানী হাসতে লাগলেন।

দীপঙ্কর বললেন, অনেক দিন পরে শিবুকে দেখতে এসেছিলাম। কথায় কথায় বড় দেরি হয়ে গেল। জরুরী কাজ আছে। এখুনি যেতে হবে।

শুনে, শিবানী বললেন, সে কি? আজ এখানে থাকুন। আপনার কথা শুনতে বড় ভালো লাগে।

দীপঙ্কর বিনয়ের সঙ্গে শিবানীকে বললেন, আপনাকে এই প্রথম দেখলাম। আপনাদের মতো নারী এ দেশের গৌরব। আপনারাই তো সুখে দুঃখে হাসিমুখে আঁধারে দীপ জেলে রাখেন।

কৌতুকের স্বরে শিবনাথ বললেন, একবার চোখে দেখেই বউদির এতো গুণমুগ্ধ!

দীপঙ্কর বললেন, এমন মাতৃস্বরূপিনী জগদ্ধাত্রী তোর ঘরে বাঁধা। তোর দুঃখ কিসের? তুই ভাগ্যবান। বউদি, আজ আসি। ফুরসত করে আর একদিন এসে আনন্দে গল্প করা যাবে। আজ বিদায় হই। শিবানীকে নমস্কার করে দীপঙ্কর চলে গেলেন।

শিবানী বললেন, সত্যই বড় অপূর্ব মানুষ তোমার বন্ধু এই দীপঙ্করবাবু। তিনি যেন দেবদূতের মতো আকাশ থেকে হঠাৎ নেমে এলেন। তাঁর কথা শুনলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। সদানন্দ পুরুষ। যেমন সুরসিক তেমনি জ্ঞানী।

শিবনাথ বললেন, তার মতো কর্মী কে আছে? সে খাঁটি সোনা। স্বদেশী যুগে সে ছেলেদের নেতা ছিল। পুলিসের হাতে কত মার খেয়েছে, কত বার জেল খেটেছে। পুলিসের নজরবন্দী ছিল। তাদের চোখে ধুলো দিয়ে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিল। বন-জঙ্গল পাহাড়-পর্বত ভেঙ্গে পায়ে হেঁটে ছদ্মবেশে ইউরোপে গেছে। মুক্তি ফৌজ গঠন করেছে। বাইরে থেকে দীপঙ্করের মতো ভারত-প্রেমিক বীরদের আক্রমণ, আর ভিতর থেকে গান্ধীর খোঁচা না পেলে ব্রিটিশ সিংহ কি এতো সহজে ধরাশায়ী হত, না, আমরা এত শীঘ্র স্বাধীনতা পেতাম?

রান্নাঘর থেকে দুর্গা কেন ডাকছে শুনে আসি। তুমি একটু বোস। বলে, শিবানী উঠে গেলেন।

দীপঙ্করের কথাগুলি শিবনাথের মনের তারে অনুরণিত হচ্ছিল। ভাবলেন, তিনি তো এখন অস্তগামী চন্দ্র। অতীত ও বর্তমানের সঙ্গে বিবাদ না করে জীবনের শেষ কয়েকটা দিন শান্তিতে কাটিয়ে দেওয়াই তো উচিত। বাংলা-দেশের সুষুপ্তিকালে তাঁর জন্ম। কুসংস্কারের নিদ্রায় নিমগ্ন পল্লী-সমাজের কোলে লালিত। তার স্বপ্নাবস্থায় তাঁর শিক্ষা। কিন্তু নিদ্রার গভীর প্রশান্তি এবং স্নিগ্ধ মাধুর্যকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন না। এখন দেশের জাগ্রত অবস্থায় নতুন যুগের কর্ম-কোলাহল জাগিয়ে পূর্বাশায় অরুণোদয় হচ্ছে। তিনি তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। তিনি বললেন, এসো হে নতুন, এসো। আমি তোমায় অভিবাদন করি। তোমার মহিমায় ভারতভূমি উজ্জ্বল হয়ে উঠুক। জাতীয় জীবনের ধূসর দিন, আঁধার রাত্রি, মোহ নিদ্রা, বুক-ভাঙ্গা নৈরাশ্য, বহু যুগ সঞ্চিত পাপ দূর হয়ে যাক। জগৎ সভায় ভারতের স্থান গৌরবান্বিত হোক।

শিবনাথের মন আশায় ও আনন্দে রঙ্গীন হয়ে উঠল। পৃথিবী গাছ-পালা আকাশ-বাতাস মানুষ জীবজন্তু—সারা বিশ্ব যেন একটা অপূর্ব মাধুর্যে সুন্দর হয়ে দেখা দিল। মনে এলো কেমন করে তাঁর এই অতি-পরিচিত দুঃখ-দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট জন্মভূমিকে নতুন করে গড়ে তোলার জন্যে কত মনীষী, কত বিজ্ঞানী, কত শিল্পী মন প্রাণ ঢেলে দিয়েছেন—কত সাহিত্যিক, কত কবি নতুন ছন্দে তাঁর মহিমা কীর্তন করেছেন। তাঁর দ্বিধা দ্বন্দ্ব অশান্তি সন্দেহ অবিশ্বাসের মেঘ কেটে গেল।

॥ ছেচল্লিশ ॥

দীপঙ্করের চলে যাওয়ার পর কয়েক মাস কেটে গেছে। সে আর ফিরে আসে নি। ছেলে-বউরা বাড়িতে থাকে না। কার্যোপলক্ষে জেলা শহরে বাসায় থাকে। কুসুমপুরের পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। শান্তিপ্রিয় ভদ্রলোকের বাসের পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়েছে। নদীতীরে ঘন-বসতিপূর্ণ তিন-চারখানি পল্লীর উপর অর্থগৃধ্নু পুঁজিপতিদের শ্যেনদৃষ্টি পড়েছে। কৃষি-প্রধান দেশটিকে রাতারাতি শিল্প-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করার সরকারী মনোভাবের সুযোগ নিয়ে অ-বাঙালী পুঁজিপতিরা শিল্পোন্নয়নের অজুহাতে অতিমুনাফা শিকার করে ঐশ্বর্য বৃদ্ধির সুমহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন।

শিবনাথের বাগান-বাড়ির সামনে এবং দু-পাশে শত শত বিঘা উর্বর চাষের জমি উচ্চমূল্যে কিনে নিয়ে একজন অ-বাঙালী শিল্পপতি একটা বিরাট লোহার ঢালাই কারখানা স্থাপন করেছেন। আ-দিগন্ত শস্য-শ্যামল কৃষিক্ষেত্র শ্লাগ ও কয়লার ঘেসে ভরাট হয়ে বিশ্রী কালো রূপ নিয়েছে। লোকের বাগানের গাছের পাতা কয়লার ধুঁয়োয় কালো হয়ে গেছে। কারখানার ড্রেনের পচা জলের দুর্গন্ধ ও কয়লার গুঁড়ো লোকের শ্বাসরুদ্ধ করে দিয়েছে।

পূর্বে এই স্থানটি তপোবনের মতো সুন্দর ও শান্তিময় ছিল। গঙ্গার বন্যারোধী উঁচু বাঁধের কোল পর্যন্ত ধান গাছের সবুজ সমারোহ, পল্লীর বাঁশ বনের, নারিকেল, সুপারি, নিম, অশ্বত্থ, বট, সজিনা, আম, তেঁতুল, জাম, অর্জুন গাছের সবুজ পত্রপল্লব এইস্থানে সবুজের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল। মাঠের ধান ও বিলের মাছ পল্লীবাসীর জীবিকা নির্বাহের উপায় ছিল। এখন সে সুখের দিন ফুরিয়ে গেছে।

বর্ষাকালে প্রতিদিন সন্ধ্যার পর গৃহস্থ, জেলে ও কৃষকদের ছেলেমেয়েরা এক হাতে লণ্ঠন, আর এক হাতে দীর্ঘ কাটারি নিয়ে বৃষ্টিজলে ভরপুর ধানের জমিতে মাছ কাটতে আর আসে না। আশ্বিনের ভরা খেতের মধুর হাসি আর কৃষকের মনে পুলক সঞ্চার করে না। অঘ্রানের পাকা ধানের সোনার শীষগুচ্ছ বাতাসে আর দোল খায় না। ফাল্গুনে আমের মুকুলগুচ্ছের সুগন্ধে

বাতাস আর ভারি হয়ে ওঠে না। বসন্তের কোকিল এখন আর নারিকেল গাছের উচ্চ শীর্ষ থেকে সুমধুর সুরের প্লাবন মুক্ত করে পল্লী দম্পতির মন বিহ্বল করে তোলে না। শিমুল পলাশ কৃষ্ণচূড়া মঞ্জরীর রক্তরাগ পল্লীর বিরহী হৃদয়ে আর কামনার আগুন জেলে দেয় না। সন্ধ্যার পর শত শত লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলো শ্রাবণের মেঘমেদুর আকাশের নিচের অন্ধকারকে আর ভীষণতর করে তোলে না। সেখানে এখন চোখ-ঝলসানো বৈদ্যুতিক আলো অন্ধকার রাত্রিকে দিন করে দিয়েছে। অর্থ পিশাচের অপরিতৃপ্ত লোভের আগুনে এবং যন্ত্র-দানবের নিশ্বাসের বিষবাষ্পে সেই শান্তিময় সুরম্য স্থানটি যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

দিন রাত লোহালক্কড়ের হুড়-হুড় শব্দ, ভোজপুরী ও উড়িয়া কুলীদের কর্ণভেদী চিৎকার, মালগাড়ি ঠেলার হেঁইয়া হেঁইয়া রব, মালগাড়ি বোঝাই-এর তুমদাম্ শব্দ, চাকার ঘড়ঘড়ানি, ইঞ্জিনের হুস্-হুস্ ফোঁস-ফোঁস আওয়াজ, কয়লাগুঁড়োর বৃষ্টি, ফার্নেসের লেলিহান অগ্নিশিখার হল্কা, দশ বারোটা 'গরম ঘরের' কুণ্ডলী-পাকানো কালো ধুঁয়ো, চিপিং-এর অবিরাম একঘেঁয়ে ঠুন্ ঠুন্ ধ্বনি, সন্ধ্যার পর ঢোলক ও খঞ্জনী বাজিয়ে পশ্চিমী দারোয়ানদের উচ্চগ্রামে "রামা হো রামা হো' সঙ্গীতের কোলাহল ওই অঞ্চলের বাসিন্দাদের জীবন অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সেই সুন্দর স্থানের স্বাস্থ্যকর মুক্ত বায়ু, চোখ জুড়ানো প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, প্রান্ত বাহিনী ভাগীরথী তীরের শান্তি নষ্ট করে দিয়েছে।

কয়েক দিন হল শিবানীর শরীরের অবস্থা ভালো নয়। ডাক্তার বলেছে, ওঁর সাধারণ স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছে। তেমন কিছু রোগ নয়। এই স্থানের দূষিত বায়ু এবং লোহালক্কড়ের শব্দ তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল নয়। রাত্রে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত হচ্ছে। শরীর আরও অসুস্থ হয়ে পড়েছে। তাঁকে বিনয়ের বাসায় নিয়ে যাওয়া হবে স্থির হয়েছে।

সংবাদ পেয়ে দেশ থেকে গানের মাস্টার এসেছে। শিবনাথকে সে বলেছিল, দাদা, বউদিকে নিয়ে দেশে চলুন না। দেখবেন, এই কয় বছরের ভিতর গ্রামের চেহারা পাল্টে গেছে। ফাঁকা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে, নদীর জলে স্নান করে তাঁর শরীর ভালো হয়ে যাবে। চাঁপাগ্রাম এখন আর পূর্বের চাঁপাগ্রাম নেই। বনজঙ্গল পরিষ্কার হয়ে গেছে। ম্যালেরিয়া নেই। কলেরা বসন্ত প্রভৃতি রোগের কথা শোনা যায় না। গ্রামের বাসিন্দারা ছাড়া বহু নতুন লোক এসে গ্রামে বাস করেছে। বহু নতুন মুখের আনাগোনা

চলেছে। তিন-চারটি নলকূপ বসানো হয়েছে। বুনিয়াদি স্কুল আর হাসপাতাল খোলা হয়েছে। একটি হাইস্কুল আরম্ভ করার তোড়জোড় চলেছে। সরকারী অফিসের তো অন্ত নেই। কৃষি অফিস, ব্লক অফিস, নদী নিয়ন্ত্রণ অফিস, জমিদারি অফিস আরও কত কি অফিস বসেছে। কত বাস্তুহারা ও ধড়া-চূড়াধারী অফিসার এসেছে। বন্যার তেজ কমে গেছে। এখন আর বাঁধ ভাঙ্গে না। ঘোড়ায় চড়ে লালমুখো সাহেব আসে না। লোকজনকে আর বেত মেরে তাড়ায় না।

তারপর শিবানীর দিকে তাকিয়ে বলল, এখানকার মতো সেখানে ধুঁয়ো, কয়লার গুঁড়ো, ড্রেনের জলের পচা গন্ধ আর কানফাটানো শব্দ নেই। সেখানকার আকাশ নির্মল। বাতাস পরিষ্কার। জল মিষ্টি।

তাঁর সেই ছেলেবেলার মনোরম স্থানটিতে যাওয়ার জন্যে এবং তার প্রিয় নদীটিকে একবার দেখবার ইচ্ছায় শিবানী আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

শিবনাথ বললেন, তোমার শরীরের এই অবস্থায় তোমাকে সেখানে নিয়ে যাব? সকলে বলবে কি? ছেলেরা শুনলে রাগ করবে। শিবানী বললেন, আমার এমন কি অসুখ? শরীরটা না হয় একটু খারাপ। আমার জন্যে ভয় করো না। আমি এত সহজে মরব না। মরলে কতকাল আগে মরে যেতাম। ওখানে তো আজকাল হাসপাতাল হয়েছে। ভাল ডাক্তারও আছে। তুমি সঙ্গে থাকবে। যদি মরি আমার সেই ছেলেবেলার কংসাবতীর ধারে তোমার কোলে মাথা রেখে শেষ নিশ্বাস ফেলব। মাস্টার কাছে থাকবে। ঠাকুরপো সেখানে আছে। ছোট বউ আছে। ছেলেমেয়েরা যাবে। একসঙ্গে সকলে দিন কয়েক কাটিয়ে আসব। শরীর ভালো হয়ে যাবে।

কুসুমপুরের বাড়িতে ব্যবস্থা করে তাঁরা বেরিয়ে পড়লেন। শিবানীর দেহে যেন নতুন শক্তি সঞ্চার হল। সৌদামিনী বললেন, আমিও বউ-এর সঙ্গে যাব। আট বছর বয়স থেকে আমি ওকে মেয়ের মতো মানুষ করে এসেছি। ওকে ছেড়ে কোনদিন থাকি নি। বুড়ী দেখতে পায় না। হাতে বাঁশের মোটা লাঠিটা নিয়ে ঠক্ ঠক্ শব্দ করতে করতে বেরিয়ে পড়ল। দুর্গার হাত ধরে তিনি চললেন স্টেশনের দিকে।

শিবানীকে নিয়ে শিবনাথ গানের মাস্টারের বাড়িতে উঠেছেন শুনে রামনাথ তাঁদের নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন।

॥ সাতচল্লিশ ॥

একদিন সকালে ঘরের বাইরের দাওয়ায় বসে শিবনাথ আয়েস করে গড়গড়ার নলে টান দিচ্ছেন। শিবানী তাঁর পাশে বসে পানদোক্তা খাচ্ছেন। শিবনাথের কর্মময় জীবনের সাথী এই গড়গড়া। তিনি কবে সিগারেট ধরেছিলেন মনে পড়ে না। তবে বি. এ. পরীক্ষা দেওয়ার পর সিগারেট ভালো লাগছে না দেখে তিনি প্রথম হুঁকা ধরেছিলেন। তারপর শিক্ষা-দীক্ষা এবং হেড মাস্টারি পদের গোপন অহংকারের সঙ্গে কেঠো হুঁকাটি খাপ খায় না দেখে চিৎপুর থেকে একটি গড়গড়া কিনে আনিয়েছিলেন। তাঁর পঞ্চাশ বছর মাস্টারি জীবনে কত বিপর্যয় ঘটেছে, কত ওঠা-নামা, কত পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু তাঁর সেই পুরাতন সাথীটি যৌবনে ও প্রৌঢ় বয়সে সমানভাবে তাঁকে আনন্দ দিয়েছে, চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে, আবার আজ এই কর্মহীন বার্ধক্যে তাঁর অবসর বিনোদনের প্রধান উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। দুজনে নিস্তব্ধ বসে আছেন। এমন সময় একটি লোক এসে প্রণাম করে বলল, অনেকদিন পরে তোমরা দেশে এসেছ শুনে তোমাদের দেখতে এলাম। শিবনাথ বললেন, কে রে, রাম না কি? এতো বয়স হল, এখনও তো বুড়ো হওনি দেখছি! বেশ শক্ত আছ।

রাম হেসে বলল, তোমাদের আশীর্বাদে শরীরটা এখনও ভালো আছে। কি জান? ভাই, শরীরের নাম মহাশয়, যা সওয়াবে তাই সয়। খাটলে শরীর ভালো থাকে।

—গাঁয়ের চেহারা পাল্‌টে গেছে, দেখছি।

—হাঁ, দাদা, এখানকার সব কিছু বদলেছে।

—এককালে তোমার মতো জোয়ান গাঁয়ে কেউ ছিল না। অসুরের মতো খেটে জমিতে সোনা ফলাতে। ছেলেরা চাষে খাটে তো? একসঙ্গে আমরা পাঠশালে পড়তাম মনে আছে তো? তুমি সারা জীবনটা চাষ করে এলে।

—জান তো ভাই, আজকাল ছেলেরা সব বাবু হয়ে গেছে। বাপ চোদ্দ পুরুষ চাষে খেটে গেল, এখন মাঠে খাটতে গেলে তাঁদের অপমান হয়। গা বেদনা করে। দু-আখর লিখতে শিখলে লোকে এখন চাকরি খোঁজে। বলে,

যেমন তেমন চাকরি আর ঘি ভাত। মোদের সেকাল কি আর আছে রে, দাদা? ঘরে ধানচাল ছিল আর মাসে পাঁচটা টাকা উপায় করতে পারলে ভেসে যেত।

—তা ঠিক।

—আজকাল সকলে চাকরি চায়। চাকরি না পেলে সরকারকে গাল দেয়। সরকারকে দোষ দিলেই হল? জনে জনে কি চাকরি মিলে? গায়ে-গতরে খেটে বুদ্ধি খরচ করে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে চেষ্টা কর না বাপু। মুই আর ক-দিন! সংসারে সব দেখেশুনে নে রে বাবা! দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বুঝতে পারছে না।

শিবানী এতক্ষণ চুপ করে ছিলেন। রামের দুঃখের কথা শুনে বললেন, আচ্ছা, ভাস্থর, তাহলে তোমাকেই চাষে খাটতে হয়? শিবানী তাকে গ্রাম-স্থবাদে ভাস্থর বলতেন।

—এখন আর খাটতে পারি না, মা। ছাতা মাথায় দিয়ে জমির ধারে দাঁড়িয়ে থেকে মজুর খাটাই। আজকাল মজুরগুলোও বড় ফাঁকিবাজ হয়ে গেছে। তাই তো ওদের হাড়ে লক্ষ্মী নেই। একটা কথা আছে জান, মা?

—কি কথা, ভাস্থর?

—খাটে খাটায় লাভের গাতি, তার অর্ধেক মাথায় ছাতি;

ঘরে বসে পুছে বাত তার ঘরে হা-ভাত।

শিবনাথ বললেন, মনে আছে, স্বদেশী করেছিলে বলে দারোগা তোমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে সারাদিন থানায় বসিয়ে রেখেছিল? এখন আমরা স্বাধীন হয়েছি। দারোগাদের বিষ দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছে। ওরা এখন আর তেমন নেই।

—ওরা ঠিক তেমনই আছে। বরং বেশী খারাপ হয়ে গেছে। আগে এক বাক্স সিগারেট দিলে চলত। এখন ওদের খাঁই বেড়েছে। বাঘ চিরকালই বাঘ, জানবে।

—এখন গাঁয়ের বনজঙ্গল সাফ হয়ে গেছে। রাস্তাঘাট ভালো হয়েছে। স্কুল, টিউবওয়েল, পোস্ট অফিস বসেছে। কংসাবতীতে আর বন্যা আসে না। ঘরবাড়ি ভাসিয়ে নিয়ে যায় না। চাষ ভালো হচ্ছে। তোমরা সুখেই আছ?

—জীবনে সুখ কাকে বলে জানলাম না কোনদিন। কোন রকমে বাঁচা বই তো নয়!

—কেন, কি হল? এমন ভাবে কথা বলছ কেন?

—শুধু উপরের জলুস বেড়েছে। গাঁয়ের লোকগুলোর স্বভাব যেমন ছিল তেমনিই আছে। ধান চাল কাপড় আর জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে। এই সুখ আর কি!

—তোমাদের আয় বেড়েছে তো? আগে টাকায় চারটে মজুর খাটত। এখন একটা মজুরের দাম দেড় টাকা।

—তবু আমরা পেট পুরে খেতে পাচ্ছি না। আগে নদীর জলে প্রচুর মাছ জন্মাত। জমিতে চাষ হত। বিঘা প্রতি বারো মণ ধান ফলত। এখন নদী বাঁধা হয়ে গেছে। বন্যা আসে না। মাছ জন্মায় না। চাষও হয় না। এখন ঘরে চাল না থাকলেও বাইরের 'চাল' বেড়ে গেছে। শুনেছি, দেশে নাকি অনেক লোহা-লক্কড় তৈরি হচ্ছে। লোহায় কি পেট ভরবে? মোরা মুখ্খু-সুখ্খু মানুষ অতশত বুঝি না। মোরা আগে চাই ভাত কাপড় আর মাথা গুঁজে থাকার কুঁড়ে ঘর। এগুলি না পেলে বাঁচবো কেমন করে?

তোমরা বল, মোরা স্বাধীন হয়েছি। সাঁতরার পো মোদের মেয়ে-মদ্দকে ভোট দেবার জন্যে ধরে নিয়ে গেল। একদিনের মজুরি দিল।

—ভোটের কাগজ কোন বাক্সে দিলে?

—কেন, জোড়া বলদের ছবির বাক্সে। মোদের গাঁয়ের লোক মন্ত্রী—মোদের রাজা। হাজার হোক তিনি মোদের আপনার লোক তো!

—ভাল করেছ।

শিবানী জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা, ভাস্থর, তুমি এখনও গরুর চিকিৎসা কর? ভূত ছাড়াও? সাপে কাটা রোগীকে চিকিৎসা কর?

—কি আর বলব মা! এখন যুবতী মেয়েগুলোর কাছে ভূত ঘেঁসতে পারে না। ভূত ধরবে কি করে যে ছাড়াব? এখন অতি গরীব বাড়ির ছেলেমেয়েরাও ভালো কাপড়-চোপড় পরে, জুতো পরে। এরা সব যেন সাহেব হয়ে গেছে। ভূত এই সকল মেমদের কাছে যেতে ভয় করে। শুনি, এরা নাকি কলকাতার কলেজে পড়ে। মাঝে মাঝে এখানে অফিসার ও আত্মীয়দের বাড়ি বেড়াতে আসে। গাছকোমর বেঁধে নদীর চরে দৌড়াদৌড়ি করে। কেউ সিগারেট টানে। এদের পুরুষালি চাল আর মেয়েলি ঢং। এরা পাড়াগাঁয়ের মানুষকে মানুষ বলে গেরাহ্যি করে না। এখন মেয়েরা এত নির্লজ্জ বেহায়াপনা করলেও ভূত তাদের ধরে না। আজকাল গাঁয়ে ভূত কোথায় যে ধরবে?

ঝোপ জঙ্গল পরিষ্কার হয়ে গেছে। ভূত থাকবে কোথায়? মোদের ছেলেবেলা প্রত্যেক বাঁশঝাড়ে পেত্নী থাকত। অশ্বথ-বট-নিম গাছে ব্রহ্মদৈত্যির আস্তানা ছিল। বেলগাছে হর-পার্বতীর পবিত্র বাসস্থান ছিল। শেওড়াগাছে পঞ্চানন্দ ঠাকুর আর মনসা গাছে মা মনসা থাকতেন। গাঁয়ের মাঝখানে কাজীরবেড়ে রাত্রে পীর সাহেবের ঘোড়া ছুটত। অমাবস্যার নিশুতি রাতে বানদেবার শ্মশানের বেলগাছে মা-কালীর আবির্ভাব হত। আচ্ছা দাদা, মোরা তো মুখখু মানুষ। শাস্তর-টাস্তর পড়িনি। দেবতারা কি সত্যিই গাছপালায় বাস করতেন?

—পাগল আর কি! দেবতারা বাস করার আর জায়গা পেতেন না যে তাঁরা গাছে বাস করতেন? মানুষের জীবনে গাছ কত উপকারে লাগে। গাছ ছায়া দেয়, ফল দেয়, ফুল দেয়। কাঠ কত কাজে লাগে। গাছের শিকড় মাটি কামড়ে থাকে। বাংলাদেশে গাছপালা খুব বেশী। এজন্যে এখানে প্রচুর বৃষ্টি হয়। তাই তো আমাদের দেশ সুজলা সুফলা। গাছে দেবতারা বাস করেন শুনলে লোক গাছ কাটতে ভয় পাবে। দেশের সমৃদ্ধির জন্যে গাছ বনজঙ্গল রক্ষা করতে হয়। যেখানে গাছ-পালা কম, সেখানে গাছ বসানো হচ্ছে। প্রতি বৎসর বনমহোৎসব অনুষ্ঠান হচ্ছে।

—তাই বল! গাছে সত্যি সত্যি দেবতারা বাস করতেন না!

একটু থেমে থাকার পর রাম বলল, আমার জমির ধারে একটা গো-ভাগাড় আছে। আগে সন্ধ্যার পর গোমুয়া মাঠে ছুটাছুটি করত। কারোর রাস্তা চলার উপায় ছিল না। এখন গোমুয়াকে আর দেখা যায় না। ভূত প্রেতের কথা আর শোনা যায় না। এখন তারা গ্রাম থেকে পালিয়ে গেছে। গরুর ডাক্তার এসেছে। হাসপাতাল হয়েছে। আমার মতো গুণিন আর হাতুড়ে বৈদ্যিকে কে ডাকবে? আমি এখন বেকার। তবে তোমাদের মা-বাপের আশীর্বাদে দুবেলা দুমুঠো ভাত খেতে পাচ্ছি।

—গাঁয়ের মেয়েরা লেখাপড়া শিখছে?

—ওদের ওই পাঠশালা পর্যন্ত দৌড়। বেশী পড়ে কি হবে!

—এখানকার ছেলেরা লেখাপড়া শেখে?

—ছোট ছেলেগুলো ওই নতুন স্কুলে পড়ে। আজকাল পড়াশুনার ঢং বদলে গেছে। মোদের সে পাঠশালা আর নেই। বড় ছেলেদের ভিতর কেউ কেউ একটা পাস করে ছোটো ইস্কুলে মাস্টারি করে। অনেকে বেকার

বসে আছে। সাদা পাতলুন ও জামা পরে ছোঁড়াগুলো চায়ের দোকানে আড্ডা দেয়। আমার দুটো ছেলে হাওড়ার মিলে কুলীগিরি করে। আর একটা ছেলে একটা পাস করে বসে আছে। গাঁয়ের অনেক লোক বেকার।

শিবনাথ বললেন, হাতে-কলমে কাজ শেখার জন্যে বিস্তর স্কুল হয়েছে। ছেলেকে সে সব স্কুলে পাঠাও না কেন?

—পাঠাব কি করে, দাদা? ওসব বড় লোকের ছেলেদের জন্যে। সুপারিশ না থাকলে ওখানে ছেলে ভর্তি করা যায় না। মোদের মতো ছা-পোষা চাষীভূসী মাসে মাসে মুঠো মুঠো টাকা খরচ করবে কি করে? গাঁয়ে ম্যালেরিয়া না থাকলে কি হবে? আমরা পেট পুরে ভাত ডাল মাছ দুধ খেতে পাচ্ছি না। অন্য রোগ কম হলে কি হয়? এখানে টি. বি. রুগীর সংখ্যা বেশী। ম্যালেরিয়া বরং ভালো ছিল। কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসত, কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়তাম। জ্বর ছেড়ে গেলে পান্তা ভাত আর মুড়ি খেতাম। কুইনাইনের পিল বা মিক্‌চার ঘরে জাগানো থাকত। আজকাল যক্ষারোগ বেড়েছে। আমাদের মতো গরীবরা ধনে-প্রাণে মারা যাচ্ছে। সে সব দিন আর নেই। অনেক বয়স হয়ে গেল। এখন মরতে পারলে বাঁচি। দাদা, আজ আসি। পরে দেখা করব।

রামের চলে যাওয়ার পর শিবনাথ বললেন, সে আজ ষাট বছর আগের কথা। তখন চাঁপাগ্রামের অন্য রকম রূপ ছিল। রাম আজ আমার বাল্যের স্মৃতি জাগিয়ে দিলে। এখন গ্রামের রূপ ও প্রকৃতি বদলে গেছে। ঘেঁটু ফুল আর ধুতরো ফুলেভরা উঁচু পড়ো ভিটে নেই। পানাভর্তি পচা ডোবা ভরাট করা হয়েছে। বেতের বন, বনতুলসীর ঝোপ, কণ্টকাকীর্ণ সেঁয়াফুলের অন্তহীন জঙ্গল, কাঁটা বাঁশঝাড়ের দুর্ভেদ্য প্রাচীর, কুরচি আর কাঠমল্লিকার বাগান নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু তাদের স্মৃতি, অনুভূতি, স্বপ্ন আমার মনটাকে ভরিয়ে দিয়েছে। যারা তখন খেলার সাথী ছিল তাদের ভিতর রাম ছাড়া আর কেউ নেই। কেউ অন্যত্র চলে গেছে। অনেকে জগৎ ছেড়ে চিরকালের মতো বিদায় নিয়েছে। একমাত্র কংসাবতী ছাড়া সকলেই চলে গেছে। হয়তো সেও একদিন শুকিয়ে যাবে। আগে যারা ছিল তারা এখন নেই। এখন যারা এসেছে তারাও চলে যাবে। পঞ্চাশ বছর আগে কে ভেবেছিল যে প্রবল প্রতাপী ইংরেজ একেবারে চলে যাবে, কে ভেবেছিল,

ভারত দ্বিধা বিভক্ত হবে? কে ভেবেছিল সুদূর পূর্ববঙ্গ থেকে বাস্তহারার দল এসে অজ পাড়াগাঁ চাঁপাগ্রামে বাস করবে? কে ভেবেছিল, এত শীঘ্র ভারত স্বাধীন হবে? দেশকে এমন নতুনভাবে গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা চলবে? কে ভেবেছিল, অর্ধ-উলঙ্গ ফকিরের প্রধান চেলা 'জেলের পাখি' আজ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উচ্চ সম্মানের অধিকারী হবেন? ইংরেজদের শক্তি প্রভাব প্রাধান্য ও অত্যাচার এখন প্রাচীন ইতিহাসের অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। ইংরেজ যোদ্ধা ও বীর পুরুষদের দম্ভপূর্ণ পাষাণ মূর্তি এখন যাদুঘরে স্থান পেয়েছে। তাদের স্থানে গান্ধীজী, সুভাষ, রবীন্দ্রনাথের ব্রোঞ্জ মূর্তি স্থাপিত হয়েছে! একমাত্র ভবিষ্যৎ জানেন একশ, দুশ, পাঁচশ, হাজার বৎসর পরে ভারতের স্থান কোথায় নির্দিষ্ট হবে। বিশ্বের ইতিহাসে কত জাতি উঠেছে, কত সভ্যতার অভ্যুদয় হয়েছে। কোথায় গেল সেই পিরামিডের মতো গগনস্পর্শী মিশরের সভ্যতা? কোথায় গেল ব্যাবিলোন আর আসিরিয়া? কোথায় গেল ব্রিটিশের সেই জগৎ-জোড়া সাম্রাজ্য—যে সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না? কোথায় গেল অর্ধ-জগৎ জুড়ে রোমান সাম্রাজ্য? তারা কাল-স্রোতে বুদ্বুদের মতো ভেসে উঠেছিল। আবার মিশে গেছে। আমাদের পরাধীনতার গ্লানি অপগত হয়েছে। নতুন সভ্যতা, নতুন দেশ গড়ে উঠছে। একি চিরকাল থাকবে? হয়তো এখানে এক সম্পূর্ণ নতুন ধরণের, নতুন প্রকৃতির সভ্যতার জন্ম হবে। যে বাংলা ভাষায় ধ্রুপদী ছন্দে মধুসূদন মহাকাব্য রচনা করেছেন, যে ভাষায় রবীন্দ্রনাথ প্রাণ মাতানো সুরে হৃদয়ের বিচিত্র ভাব প্রকাশ করেছেন, আমাদের সেই মধুস্রাবী মাতৃভাষা কি চিরকাল স্থায়ী হবে? সে ভাষাও হয়তো একদিন সংস্কৃতের মতো মৃত ভাষার পর্যায়ে পড়বে। এখানে আসার পর আমি জীবনটাকে নতুন চোখে দেখতে পেলাম।

শিবানী অপলক নেত্রে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। অসীম আগ্রহে তাঁর কথা শোনেন। শৈশবের স্মৃতিমাখা এই স্থানটিতে বসে যেন শিবনাথের মনের দরজা খুলে গেল। তিনি বললেন, পৃথিবীতে কোন কিছু চিরকাল একভাবে থাকে না। এই গ্রামখানা আগে কি ছিল, এখন কেমন হয়েছে। এখানকার মানুষ গাছপালা নদী সবই একভাবে বসে নেই। দীপঙ্কর বলেছিল, পৃথিবী তার গতিপথে ঠিক ভাবে চলেছে। তার চলার ছন্দে ছন্দে আমাদের জীবনে পরিবর্তনের সুর বেজে ওঠে। পরিবর্তনকে অবশ্যম্ভাবী ভেবে নিজেকে তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারলে বিরোধ সৃষ্টি হয় না।

আমাদের দেশের সাধারণ লোক শিক্ষায় অনগ্রসর। তাদের দৃষ্টিভঙ্গী সঙ্কীর্ণ। তারা প্রাচীনের উপাসক। স্বাধীনতা উত্তর যুগে দেশময় একটা যে বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে তার সঙ্গে তারা সমতালে পা ফেলে চলতে পারছে না। এজন্যে তারা সেই পরিবর্তনকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারছে না। এই বৃদ্ধ বয়সে দেশব্যাপী গঠন মূলক কার্যে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে না পারলেও তাদের মন থেকে এই নৈরাশ্য দূর করার জন্যে কয়েকটা বৎসর চেষ্টা করব। রামচন্দ্রের সেতু বন্ধনে কাঠবিড়ালীর মতো যদি একটি কুটিও যোগাতে পারি তাহলে জীবন ধন্য হবে। পূজার জন্যে যারা ফুল তোলে, হোমের কাঠ যোগায়, কাঁসর ঘণ্টা বাজায় তাদেরও পুণ্য হয়।

দু-জনের ভিতর যখন এই ধরণের কথাবার্তা চলছিল তখন গানের মাস্টার কোথা থেকে ছুটে এসে বলল, দাদা দেখবেন চলুন, আমাদের মরা গাঙ্গে কেমন বান ডেকেছে।

গাঙ্গ আর বানের কথা শুনে শিবানী জিজ্ঞাসা করলেন, মাস্টার, তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? এখানে আবার গাঙ্গ কোথায় যে বান ডাকবে? এখানে কংসাবতীর মতো একটা নদী আছে। এ নদীও খুব ছোট। তাতে জোয়ার-ভাঁটা খেলে না।

মাস্টার বলল, আমি কংসাবতীর কথাই বলছি। দু-বছর আগে নদীর তীব্র স্রোত নিয়ন্ত্রণ করে হাজার হাজার একর জমিতে চাষের সুবিধার জন্যে এখান থেকে প্রায় একশ মাইল দূরে সরকার বাঁধ নির্মাণ করেছিলেন। বহু কোটি টাকা ব্যয় হয়েছিল। ওই অঞ্চলের সাঁওতালরা আপত্তি করেছিল। তারা বলেছিল, কংসাবতী আমাদের মেয়ে। একে বাঁধবার অধিকার কারোর নেই। এই সেদিন প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তীর ধনু বর্শা কোদাল কুড়ুল প্রভৃতি নানা রকমের যন্ত্র নিয়ে দুপুর রাত্রে বাঁধ কেটে দিয়েছে। পর্বত প্রমাণ উঁচু আবদ্ধ জল প্রবল বেগে গোঁ গোঁ শব্দে নদীপথে বয়ে চলেছে। হয়তো বা আগের মতো আমাদের ঘরবাড়ি ভেসে যায়।

শিবনাথ বললেন, ও বিদ্রোহ কিছুই নয়। এক দিনেই সব ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। তীর ধনু শাবল বর্শা লাঠি কি গুলি-গোলার সামনে দাঁড়াতে পারবে হে? এমনি ভাবে মুখখু লোকগুলো দেশের ভালো কাজে বাধা দেয়। হয়তো কেউ ওদের নাচিয়ে দিয়েছে।

—আচ্ছা, ওরা কংসাবতীকে ওদের মেয়ে বলে কেন?

—সে একটি সুন্দর রোমান্স।

—জঙ্গলীদের আবার রোমান্স!

—জঙ্গলী হোক, আর তোমাদের মতো সভ্য মানুষ হোক, মানুষ মাত্রেরই হৃদয় আছে। মানবিক প্রেম ভালবাসা দয়া করুণা সুন্দরের ধারণা আছে। কোন মানুষ ছোট নয়। কেন সাঁওতালরা কংসাবতীকে মেয়ে বলে, শোন। ওদের উপকথায় আছে, বহুকাল আগে ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ শেষ করে শ্রীকৃষ্ণ উপস্থিত হলেন ছোট নাগপুরের পার্বত্য অঞ্চলে। প্রকৃতির বিচিত্র রূপ-সম্ভারে সজ্জিত সেই স্থান। অপূর্ব ভাবে ভরে উঠল তাঁর হৃদয়। দেখলেন, তাঁর সামনে বয়ে চলেছে একটি ক্ষুদ্র পাহাড়ী নদীর স্বচ্ছ স্রোতধারা। দেখলেন, জলস্রোতে একটি সুন্দরী রমণী। হাতে নীলপদ্মের গুচ্ছ। লজ্জাশীলা কন্যা ভক্তিভরে উপহার দিল পদ্মগুচ্ছ শ্রীকৃষ্ণের হাতে। সে বলল, আমার নাম কংসাবতী। আমি চলেছি আমার পতি সাগরের কাছে।

তাঁর অপূর্ব রূপে মুগ্ধ হয়ে মাধব স্পষ্ট ভাষায় তার প্রেম প্রার্থনা করলেন। কন্যা লজ্জায় হাত দিয়ে মুখ ঢাকল। প্রেমে অন্ধ শ্রীকৃষ্ণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে সে এঁকে বেঁকে ছুটে চলল বেগে সাগরের দিকে। তার হৃদয় জয় করার জন্যে তিনি ধরলেন দামোদরের ভয়াল মূর্তি। কংসাবতী ছুটে চলে সামনে আরও বেগে। তারপর ধরলেন রূপনারায়ণের শান্ত সুন্দর রূপ। উন্মাদিনী নারী সামনে ছুটে চলে বেগে আত্মরক্ষার বিপুল প্রয়াসে। তারপর নিজের নাম ও রূপ পালটে হলদী নাম নিয়ে সে এগিয়ে চলল সাগরের দিকে। তখনও শ্রীকৃষ্ণ তার পিছনে ছুটেছেন। তাঁর ভয়ে সাগর কংসাবতীকে প্রত্যাখ্যান করলেন। উপায় না দেখে সে আশ্রয় নিল ভাগীরথীর শান্তিময় কোলে।

ছোটনাগপুর সাঁওতাল মুণ্ডা কোল ভীলদের দেশ। সেখানকার পাহাড়ে জন্ম পশ্চিমবাংলার তিনটি নদী—কংসাবতী, দামোদর এবং রূপনারায়ণ। আমরা যাদের বর্বর বলে ঘৃণা করি, তারা এই তিনটি নদীকে নিয়ে কেমন একটি সুন্দর প্রেমাভিসারের গল্প রচনা করেছে। তারা মেয়ে হিসেবে সুন্দর নদী কংসাবতীকে ভালবাসে। তাদের মেয়ের গায়ের উপর সরকারের হস্তক্ষেপ তারা সহ্য করতে পারেনি। এজন্যে তারা বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। চলতি কথায় কংসাবতীর নাম কাঁসাই। পুরাকালে এর নাম ছিল কপিশা। বোধহয় এর জলের কপিশ রঙ থেকে এর কপিশা নাম হয়েছিল।

গানের মাস্টার বলল, আমরা কপিশা নাম কোনদিন শুনি নি। দাদার

কাছে আজ নতুন জ্ঞানলাভ করলাম। মৃদু হেসে শিবানী বললেন, তোমার দাদা ছেলেবেলা থেকে বুড়ো বয়স পর্যন্ত ইস্কুল যাচ্ছেন। তিনি জ্ঞান দেবেন না তো কে দেবে? যেমন দাদা, তেমনি তাঁর ভাই। সারা জীবনটা দুজনই ছেলেমেয়েদের তালিম দিচ্ছেন। ফলং সমানং—মেয়েগুলো সা-রে-গা-মা-র বেশী কিছু শিখল না, আর ছেলেগুলো মাস্টার ঠেঙ্গানো বিদ্যের বেশী আর কিছু জানল না।

—তা হোক, এখন উঠুন। সভা ভঙ্গ করুন। কথায় কথায় বেলা হয়ে গেছে। খাবেন কখন?

সকলে উঠে গেলেন।

॥ আটচল্লিশ ॥

এবার দেশে ফিরে এসে গ্রামের ও কংসাবতীর পূর্বের রূপ বদলে গেছে দেখে শিবনাথ কষ্ট অনুভব করেছিলেন। সাঁওতালরা নদীর বাঁধ কাটিয়ে দিয়েছে এবং আবার কংসাবতী জলে থৈথৈ করছে শুনে শিবনাথ পরদিন প্রত্যূষে তার সেই অর্ধবিস্মৃত রূপ দেখার জন্যে নদী তীরে উপস্থিত হলেন। ঝুঁকে-পড়া প্রাচীন বটগাছের তলায় বসলেন। সত্তর বছর আগে প্রতিদিন ভোরে তাঁর বাবা আসতেন। জেলেদের কাছ থেকে বড় চিংড়ি, পোনা, ভেট্‌কি, পাবদা, বাঁশ পাতাড়ি প্রভৃতি টাটকা মাছ গামছা ভর্তি করে নিয়ে যেতেন। সে যুগে জীবন-ধারা সুখে-দুঃখে বয়ে চলত মৃদুমন্দ বেগে। দোয়েল কোয়েল শ্যামার কলকাকলি যাদের ঘুম ভাঙ্গাত, বনফুলের সুবাস আর ভোরের শীতল হাওয়া যাদের শীর্ণদেহে কিছু বল সঞ্চার করত তারা এখন কোথায়? যে স্থানের সঙ্গে এককালে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—সে যেন আজ স্বপ্ন, মায়া। তাঁর সেই শৈশবের চাঁপাগ্রাম, তাঁর বাবা মা বড়দিদি, সেখানকার পড়ো ভিটা, বনজঙ্গল, বাঁশবন এঁদো পুকুর-ডোবা, ইট বের-করা বাঁড়ুয্যেদের ভগ্ন পূজার দালান—সব, সব যেন তাঁর মন থেকে মুছে গেছে। এখানকার আকাশ আর যেন তেমন নিঃসীম নীল নয়। এখানকার বাতাস থেকে আর যেন তেমন মধু ঝরে না। এখানকার বাঁশবনের ছায়া আর যেন তেমন শীতল নয়। এখানকার আম গাছের পত্র-পল্লব আর যেন তেমন সবুজ নয়। এখানকার মানুষ আর যেন তেমন সহজ নয়। কোথায় গেল সেই নানা রঙের প্রজাপতির ঝাঁক, যারা

কুরচি-আকন্দ-কাঠ-মল্লিকা প্রভৃতি বনফুলের উপর উড়ে উড়ে বসত? কোথায় গেল সেই ফিঙ্গে মাছরাঙ্গা শালিক, যারা ঝোপে-জঙ্গলে লতাবিতানে গা ঢাকা দিয়ে বসে থাকত? কোথায় গেল পাপিয়ার তান, চাতকের তৃষ্ণাজল ভিক্ষা, ঘুঘুর ডাক, রাত্রে কালপেঁচার কর্কশ রব, উইচিংড়ে আর ঝিঁ ঝিঁ পোকার একটানা শব্দ, তেঁতুল গাছের ডালে ঝোলা অসংখ্য বাদুড়? কাঠবিড়ালীর দল এখন ইচ্ছামতো এক গাছ থেকে আর এক গাছে তিড়িং তিড়িং করে লাফিয়ে বেড়ায় না। বাদাম গাছে কাঠঠোকরা পাখির খট্ খট্ শব্দ আর শোনা যায় না। পাখিরা স্বাধীন। মানুষের মতো স্বার্থের শিকলে তারা মাটির সঙ্গে বাঁধা নেই। গ্রামোন্নয়নের হিড়িকে গাছপালা ঝোপ-জঙ্গল পরিষ্কার হওয়ায় পাখিরা আশ্রয়হীন হয়ে যেখানে খুশী উড়ে গিয়ে নতুন আশ্রয় স্থলে খড়কুটো দিয়ে নীড় রচনা করেছে। এরা স্বচ্ছন্দচারী। মানুষের মতো এরা উদ্বাস্তু হতে ভয় করে না। গৃহ ছেড়ে অন্যত্র যেতে এদের কোন চিন্তা নেই। গৃহের প্রতি মায়া নেই। এরা যেখানে যায় সেখানে গৃহ নির্মাণ করে। যা সহজে সংগ্রহ করে তাই খায়। প্রকৃতির রাজ্যে এরাই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন। মানুষ চিরকাল অভাবের দাস। তার অভাবের শেষ নেই। দাসত্বেরও অন্ত নেই।

একদিক দিয়ে পাখিরা মানুষের চেয়ে বেশী বুদ্ধিমান। ওরা কি জানে একদিন ওদের মরতে হবে? কি জানি? তবে ওরা আমাদের চেয়ে বেশী জীবন ভোগ করে। ওরা ডানা মিলে ওড়ে। আনন্দে নাচে, স্ফূর্তিতে গান করে। ওদের কাছে জীবনটা যেন একটানা উৎসব। আমাদের যত বয়স বাড়ে মৃত্যুর ভয়ে আমরা তত সন্ত্রস্ত হই। মানুষ জানে মৃত্যুর হাত থেকে তার অব্যাহতি নেই। হয়তো পাখির মৃত্যুভয় আছে। তারা কি মৃত্যুর অনিবার্যতার কথা জানে? তারা লাভ-ক্ষতির হিসেব করে না। তাদের বিষয়-সম্পত্তি নেই। তাদের আইন-আদালত নেই। মামলা-মকদ্দমা নেই। উকিল-মোক্তার নেই। তারা চুরি-জাল-জুয়াচুরি করে না। তাদের শাস্তির ভয় নেই।

শিবনাথ ভাবেন, সেই সত্তর বছর আগের চাঁপাগ্রামের সঙ্গে এখনকার চাঁপাগ্রামের আত্মিক যোগ নেই।

পূর্বে বাংলার পল্লী শত দোষ সত্বেও সত্যই একটা অপূর্ব বস্তু ছিল। বৃষ্টিধৌত ঘন-সবুজ গাছপালা, সোনালী রোদ, রূপালী জ্যোৎস্না, এলোমেলো উদাস

হাওয়া, বাঁশবন ও ঝাউ-এর শন্ শন্ শব্দ, কিশলয়ের মর্মরধ্বনি—বনতুলসী কাঁটা গাছ হলুদ গাছ বনকচু—এই সবুজ সমুদ্রের অফুরন্ত ঢেউ-এর উপর লতার হিল্লোল—এ যেন সৌন্দর্যের মায়াপুরী। যে দেশের শ্যামলতার রহস্যময় সৌন্দর্য প্রাণে বিপুলতা, হৃদয়ে উদারতা আনতে পারে, সে দেশের লোক এতো স্বার্থপর কেন, এতো কঠোর কেন, এতো অন্ধ কেন? এ কি প্রকৃতির পরিহাস না অদৃষ্টের খেলা? পর মুহূর্তে তাঁর বিষাদ কেটে যায়। ভাবেন, বাঙ্গালী জাতটা এখনও মরেনি। তাই কিছু আশা আছে। সত্যিকার মরা মনে, দেহে নয়। এতো বিপর্যয় সত্ত্বেও বাঙ্গালী এখনো সৌন্দর্যবোধ হারায় নি। বীর্য ও ত্যাগের কথা ভুলে যায় নি। বাঙ্গালীর ভিতর এখনও রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বকবির জন্ম হয়। চিত্তরঞ্জনের মতো সর্বত্যাগী মহাপুরুষের, বিবেকানন্দের মতো বীর্যবান সন্ন্যাসীর, সুভাষচন্দ্রের মতো দেশপ্রেমিক বীরের আর বিধানচন্দ্রের মতো নিরলস স্বাধীনচেতা কর্মযোগীর আবির্ভাব ঘটে।

এই সকল চিন্তার সঙ্গে শিবনাথ নিজের কথাটা ভেবে দেখলেন। তাঁর শৈশবের চাঁপাগ্রাম, তাঁর খেলার সাথী কপিশা বা কংসাবতী, তাঁর প্রিয়জনের ও গ্রামের লোকগুলির স্মৃতি তাঁর মনের সুপ্ত আনন্দকে আরও যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। সেই আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়ে সমগ্র বিশ্বকে অপূর্ব সৌন্দর্যে রঙ্গীন করে তুলেছে। সোনালী রোদ গাছের পাতার ভিতর দিয়ে তাঁর গায়ের উপর পড়ল। তাঁর চমক ভেঙ্গে গেল। দেখলেন, তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে শিবানী ও গানের মাস্টার। শিবানী বললেন, ঘুম থেকে উঠে তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমরা ভাবলাম তুমি কংসাবতীর জল দেখতে এসেছ। আমাদের অনুমান ঠিক হয়েছে।

শিবনাথ মাস্টারকে বললেন, আমি ভাবছি কি জান, মাস্টার? আজ থেকে তোমার বউদিকে কপিশা নামে ডাকব।

গানের মাস্টার বলল, দাদার বয়সের সঙ্গে—পত্নীপ্রেম বেড়ে চলেছে। এতকাল যিনি শিবানী ছিলেন, তিনি আজ হঠাৎ কপিশা হয়ে গেলেন!

শিবানী বললেন, বুড়ো বয়সে অত শখ কেন? ছেলেমেয়েরা শুনলে কি ভাববে?

মাস্টার বলল, কী আর ভাববে? ভাববে, বুড়োর ভীমরতি হয়েছে।

শিবনাথ বললেন, কংসাবতীর একটি শাখানদীর তীরে তোমার জন্ম। কংসাবতীর তীরে তোমার শৈশব কেটেছে। কংসাবতীর মতো তুমিও তো

চল্লিশ বছর আমার পিছনে ছুটছ। তোমায় কংসাবতী নাম দিতাম। তবে কপিশা নামটি ছোট আর তোমার গায়ের রঙের সঙ্গে সে রঙের কতকটা মিল আছে বলে তোমায় কপিশা নাম দিলাম।

শিবানী লজ্জিত ও বিরক্ত হয়ে বললেন, চল—চল বাড়ি চল। বুড়ীর আবার নতুন নামকরণ? মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? উঠতি আর পড়তি বয়সে লোক কাব্যি করে আর সুস্থ মানুষের হাসির খোরাক যোগায়।

মাস্টার কি যেন বলতে যাচ্ছিল। শিবানী তাকে বাধা দিয়ে বললেন, থাম তো বাপু! মাস্টারি করলে মানুষ একটু বেশী বকে। তোমার দাদা একে মাস্টার, তার উপর আবার বুড়ো। কথা বলতে সুরু করলে থামতে জানেন না। ওঁকে আর ঘাঁটিও না।

॥ উনপঞ্চাশ ॥

চাঁপাগ্রামে আসার পর দেড় মাস কেটে গেছে। শিবানীর পুরানো অসুখটা বেড়েছে শুনে ছেলেরা কলকাতা থেকে একজন ভালো ডাক্তারকে সঙ্গে নিয়ে দেশের বাড়িতে উপস্থিত হল।

তিনি শিবানীকে পরীক্ষা করে বললেন, এ অবস্থায় এঁকে কলকাতায় নিয়ে যাওয়া উচিত নয়। আমি ওষুধের ব্যবস্থা করে যাচ্ছি।

শিবানী নিজের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে চিরকাল উদাসীন। কোন নিয়ম মেনে চলতেন না। বললেন, মেয়েমানুষ সহজে মরে না। মরলে দুঃখ কি? কপালে মরণ থাকলে অনেক দিন আগে মরে যেতাম।

রোগের যন্ত্রণা সত্ত্বেও সর্বদা হাসি মুখ। নাতি-নাতনীদের আর বুড়ী ঠাকুরঝিকে নিয়ে কত ফষ্টিনষ্টি করেন। তাদের হাসান, নিজে হাসেন। ডাক্তারকে বলেন, ওষুধে কি রোগ সারে? মরা-বাঁচা ভগবানের হাতে। ডাক্তার সকলকে বলতেন, অনেক দিন ডাক্তারি করলাম। এমন রুগী আমার চোখে পড়েনি। ইনি হাসি-খুশী দিয়ে রোগের যন্ত্রণাকে জয় করেছেন। এঁর কাছে মৃত্যু—মৃত্যু নয়, যেন পরজীবনে যাওয়ার পথ।

এক মাস কারোর চোখে ঘুম নেই। চিকিৎসা সমানে চলেছে। শিবানী দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এমন কি পাশ ফিরতে পারেন না। দু-একটা কথা বললে হাঁপিয়ে উঠেন। ডাক্তারকে বলেন, ডাক্তারবাবু, সর্বাঙ্গে ছুঁচ

ফুটিয়েছেন। আমি যেন শরশয্যায় শুয়ে আছি। ঠেকা দিয়ে এই নড়বড়ে দেহটাকে আর কতদিন রক্ষা করা চলে? শিবনাথকে ধীরে ধীরে বললেন, তুমি আমাকে বাঁচাবার জন্যে কি না করছ? মেয়ে আর বউরা কত সেবা করছে! ছেলেরা কত চেষ্টা করছে! সবই বৃথা!

শিবনাথ বললেন, বৃথা হবে কেন? তুমি ভালো হবে।

শিবানী বললেন, আর ভালো হয়েছি! মরতে কোন কষ্ট নেই। শুধু তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে ভাবলে কষ্ট হয়। যতক্ষণ নিশ্বাস আছে ততক্ষণ তুমি আমার কাছে থাক। তোমরা সকলে আমাকে ঘিরে বস। তোমাদের সকলকে দেখতে দেখতে আমি আনন্দে চলে যাব।

ছেলে-মেয়ে-বউরা, গানের মাস্টার, রামনাথ, চঞ্চলা, কালিন্দী তাঁর বিছানা ঘিরে বসল। গানের মাস্টার শিবনাথকে ডেকে নিয়ে উঠে গেল। বলল, দাদা, আমিই বোধ হয় বউদির মৃত্যুর উপলক্ষ্য হলাম। আমি না জেদ করলে বউদি এখানে আসতেন না। হয়তো এত শীগগীর তাঁর মরণ হত না। সে কাঁদতে লাগল।

শিবনাথ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, তুমি কি পাগল হয়েছ, মাস্টার? ভগবান যা করেন তা মঙ্গলের জন্যে। শিবানীকে এ যাত্রা ফিরানো যাবে না সত্য। কিন্তু তাঁর এই চির আকাঙ্ক্ষিত প্রিয় স্থানে দেহ রক্ষা করলে তিনি সুখে স্বর্গে যাবেন।

চোখ মুছতে মুছতে মাস্টার শিবনাথের পিছনে পিছনে এল। শিবনাথ বিছানার উপর বসলেন। শিবানীর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে। শিবনাথের ডান হাতখানি বুকের উপর টেনে নিয়ে ইঙ্গিতে জানালেন, এদের সকলকে তোমার হাতে তুলে দিয়ে গেলাম। তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে গিয়েছে। শীর্ণ-পাণ্ডুর গালের উপর দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল।

শিবানীর অন্তিমকাল উপস্থিত। আর কিছু করবার ছিল না। তারপর শেষ দুটি নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথাটি বালিশ থেকে গড়িয়ে পড়ল। সব শেষ! জীবনের যে ক্ষুদ্র শিখাটি বিচিত্র ঘটনার ঝড়-ঝাপটার ভিতর দিয়ে একটানা পঞ্চাশ বছরের উপর একটি গৃহস্থ পরিবারের সুখে-দুঃখে সমভাবে অনাবিল হাসি ও আনন্দের আলো জেলে রেখেছিল তা আজ নিভে গেল।

বুড়ী কানে শুনতে পায় না। চোখে দেখতে পায় না। সে আন্দাজে

বুঝেছে শিবানী আর নেই। টলতে টলতে এগিয়ে এসে বলল, তুই বড় ভাগ্যবতী, শাঁখা-সিঁদুর নিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেলি!

তখন সন্ধ্যা নেমে এসেছে। গ্রামের গৃহস্থ বধূরা তুলসী তলায় সন্ধ্যা প্রদীপ জেলে শঙ্খধ্বনি করে রাত্রিকে মাঙ্গলিক আহ্বান জানাচ্ছে। দূরে দেব-মন্দিরের সন্ধ্যারতির কাঁসর-ঘণ্টা বেজে উঠেছে। ছেলেরা শিবানীর শবদেহ নিয়ে গ্রামের প্রধান রাস্তা দিয়ে নদীর শ্মশান ঘাটে চলে গেছে। সকলের নিষেধ সত্ত্বেও শিবনাথ বিভ্রান্তের মতো সেই রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলেন। এই সেই রাস্তা যার উপর দিয়ে তাঁর পিতামহ আড়াই বছর বয়সের বালিকা পিতামহীকে নিয়ে এসেছিলেন। এই পথেই তাঁর মা বধূবেশে গৃহে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন। এই পথেই নব-পরিণীতা আট বছরের বালিকা বধূ শিবানী পালকি চড়ে প্রথম শ্বশুরঘর করতে এসেছিলেন। আর এই পথ দিয়ে আজ তিনি চিরকালের মতো কোথায় চলে গেলেন!

ধীর পদক্ষেপে শিবনাথ এলেন নদীতীরে। তিনি দাঁড়ালেন সজ্জিত চিতার পাশে। বিহ্বল চিত্তে তাকিয়ে রইলেন শিবানীর মুখের দিকে। চিতায় আগুন দেওয়া হল। সে দৃশ্য তিনি সহ্য করতে পারলেন না। তাঁর দেহ ক্লান্ত। পা দু-খানি শিথিল।

শিবনাথ ধীরে ধীরে উঠে এসে বসলেন সাদা পুষ্পে-ভরা কাশ বনের পাশে বালুচরের উপর। চিতার বাত্যাতাড়িত কুণ্ডলী-পাকানো ধূসর-ধুঁয়ো তাঁর দেহ স্পর্শ করে বাতাসের উপর ভাসতে লাগল। তারপর হঠাৎ সেই ধুঁয়োর ভিতর তিনি দেখলেন একটি রমণীর কপিশ রঙের ছায়ামূর্তি। যেন সে আতঙ্কে ছুটে গিয়ে অদৃশ্য হল ধীর প্রবাহিনী কপিশার দ-এর কালো জলে। ওপারে বাঁশ আর আমের বনে সাঁওতালদের মাদলের মাতাল সুরে উৎসব সঙ্গীতের ধ্বনি, আর এপারে ধ্বংসাবশেষ নীলকুঠীর প্রাচীন ঝাউ বৃক্ষশ্রেণীর শুষ্ক পত্রের মর্মর ভেসে এল মধ্য রাত্রির শীতল বায়ু-হিল্লোলে ॥

॥ সমাপ্ত ॥